নানা নিবন্ধ

শ্রীসুশীলকুমার দে

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী*

ঋগ্বেদের দু'একটি সূক্তের রচয়িতা বা মন্ত্রদ্রষ্টার নামোল্লেখ থাকিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের নাম ও নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের যে সকল আনুষঙ্গিক ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শৌনক-রচিত বৃহদ্দেবতা এবং ঋগ্বেদের বিবিধ অনুক্রমণীতে সূক্ত, দেব-দেবী ও মন্ত্র-রচয়িতাদের নাম, বিবরণ ও কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ঋগ্বেদাদির সমসাময়িক না হইলেও খ্রীষ্টীয় শতাব্দের পূর্ব্বে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের সকল গল্প ও ঐতিহ্য বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের সাক্ষ্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

এই সকল গ্রন্থে ঋগ্বেদের সূক্তের রচয়িত্রী হিসাবে সাতাশ জন ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ আছে (বৃহদ্দেবতা ২।৮২-৮৬)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক দিকে অদিতি, জুহু, ব্রহ্মজায়া, ইন্দ্রাণী, অপ্সরস্, সরমা, উর্ব্বশী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী-দের বৈদিক দেবীদের পর্য্যায়ে ধরিতে পারা যায়; অন্যদিকে শ্রী, মেধা, দক্ষিণা, শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে কোন ভাব বা কর্ম্মের রূপক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইহাদের ছাড়িয়া দিলে, প্রকৃত নারী-ঋষি বা মহিলা-কবি হিসাবে কেবলমাত্র আটটি বা নয়টি ব্রহ্মবাদিনীর নাম পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ে ব্রহ্মবাদিনী আখ্যার অন্যবিধ অর্থ করা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্ম-শব্দের এখানে কোন নিগূঢ় বা দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ ইহাদের রচনাগুলি পড়িলে বুঝা যাইবে যে, ঋগ্‌বেদের ব্রহ্মবাদিনীরা কোথাও ব্রহ্মজ্ঞানের দাবী করেন নাই, বরং নিজেদের জীবনের সুখ-দুঃখ অবলম্বন করিয়া দেবদেবীগণের স্তুতি বা উপাসনা করিয়াছেন। সুতরাং এখানে ব্রহ্ম অর্থে বৈদিক দেবগণের স্তুতি বা আরাধনা বুঝিতে হইবে; সেকালে বেদবাক্যের নামই ছিল ব্রহ্ম। এবং 'সূক্ত'-শব্দের 'যাহা উত্তমরূপে ব্যক্ত' (সু+উক্ত), 'সদুক্তি', 'সুভাষিত', এই অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। অনেকে বলেন, ঋগ্‌বেদের যে সমস্ত সূক্ত বা ঋক্ এই ব্রহ্মবাদিনীদের নামে ধরা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের রচনা নয়; অন্য কেহ তাঁহাদের উপাখ্যান অবলম্বন

* মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৫৫।

করিয়া রচনা করিয়াছিলেন ; পরবর্ত্তী সময়ে সেগুলি তাঁহাদের নামেই চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা অনুমান বা অভিমত মাত্র, ইহার মূলে কোন যুক্তি বা তথ্য নাই।

যে আটটি ব্রহ্মবাদিনীর কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, গোধা, অগস্ত্য-ভগিনী, শশ্বতী, লোপামুদ্রা ও রোমশা। ইহা ছাড়া বাক্ এই নামে আর একটি ব্রহ্মবাদিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহা যে সত্যই কোনও মহিলা-ঋষির নাম, সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই বাক্ নাম্নী ব্রহ্মবিদুষীর রচিত ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্ত বর্ত্তমান কালে দেবীসূক্ত বলিয়া পরিচিত। আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে শরৎ কালের দেবীপূজায় এই সূক্তটি গৃহে-গৃহে পঠিত হয় ; কারণ, দেবীভক্ত শাক্ত-সাধকেরা এই বৈদিক রচনাটিকে তাঁহাদের শক্তিবাদের আদিসূক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে আমাদের দেবীপূজা বা শক্তিপূজা এই সূক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে এই রচনার যে বিবরণ রহিয়াছে, তাহা বিভিন্ন। সেখানে এই সূক্তটি অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা বাক্ নাম্নী ব্রহ্মবাদিনীর রচিত এইরূপ কথিত হইয়াছে ; সায়ণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বক্তা বিশ্বের সহিত নিজের একাত্মভাব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্ব-নির্ম্মাতা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন, বাক্ নামটি রূপকচ্ছলে কল্পিত ; এই নামে কোন প্রকৃত নারী-ঋষি সম্ভবতঃ ছিলেন না। সুতরাং পরবর্ত্তী যুগে, বাক্ অর্থে বাগ্‌দেবী সরস্বতী, অথবা শব্দব্রহ্মের কল্পনা এই সূক্তের নানাবিধ তত্ত্বদর্শী ব্যাখ্যার সূত্রপাত করিয়াছে। রচনার অন্তর্গত mystic mood বা লোকোত্তীর্ণ ভাবনার পরিচয় এবং রচয়িত্রীর ভাবমূলক নাম হইতেই এইরূপ কল্পনা সম্ভব হইয়াছে ; কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের স্পষ্ট নির্দ্দেশ হইতে বোঝা যায় যে, প্রাচীন কালে এইরূপ কোনও ধারণা ছিল না, এবং সূক্তটিকে বাক্-নাম্নী স্ত্রীকবির উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করা হইত। তাহা যদি সত্য হয়, তবে ইহা কম গৌরবের কথা নয় যে, একজন মহিলার রচনা আমাদের সাহিত্য ও চিন্তার ইতিহাসে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, এই সূক্তটির অপূর্ব্ব কবি-কল্পনা এবং লোকাতীত

ভাবের উৎকর্ষ। ইহার মহিলা-কবি আপনার আত্মগত অথচ আত্মবিলোপী ভাববৃত্ত এইরূপ বিবৃত করিতেছেন—

আমি রুদ্রের সঙ্গে ভ্রমণ করি
আদিত্য-বসু-বিশ্বদেবের গণে ;
মিত্র বরুণ উভয়েরে আমি ধরি
ইন্দ্র-অগ্নি যুগল-অশ্বী সনে।

ধরি সোমে, যারে সবনের শিলা হানে ;
ত্বষ্টারে ধরি পূষণ ও ভগদেবে ;
তুষি ধনদানে দেবতোষী যজমানে,
হবি আর সোমে যে জন আমারে সেবে।

রাষ্ট্রধারিণী দ্রবিণদাত্রী আমি,
প্রথমা বিদুষী যজ্ঞিয়দের জ্ঞানে ;
ব্যাপিনী আমারে দেবতারা দিনযামী
নিবেশিত করি' রাখিল সকল স্থানে।

চোখে দেখে যারা, কানে শোনে, প্রাণে বাঁচে,
বলে সবে—আমি তাদের অন্ন আনি ;
না জানিয়া তারা নিবসে আমার কাছে ;
হে সুধী, আমার শোন শ্রদ্ধার বাণী।

এ সকল শুধু আমিই আপনি বলি,
দেব ও মানবে বাঞ্ছিত মানে যারে ;
যাহারে ইচ্ছা তারে করি আমি বলী,
ব্রহ্মবিদ্ বা মেধাবান্ ঋষি তারে।

আমি রুদ্রের ধনুটি বিথারি' ধরি
ব্রহ্মদ্বেষী বৈরি-বিনাশ তরে ;
জনগণমাঝে বিরোধ সৃষ্টি করি ;
দ্যাবাপৃথিবীর প্রবেশিনু অন্তরে।

পিতার প্রসূতি আমি সকলের শিরে,
আমার জন্ম সমুদ্রজল 'পরে ;
সকল সৃষ্ট জীবে আছি আমি ঘিরে ;
মম উন্নতি দ্যুলোক পরশ করে।

বায়ুর প্রবাহে বহি আমি অনিবার,
সকল জীবের সৃষ্টি আরম্ভিয়া ;
দ্যুলোকের আর ভূলোকের পরপার
বিরাজিনু আমি আমার মহিমা দিয়া।

আপনার মধ্যে বিশ্বের একাত্মতা অনুভবের যে হর্ষাবেগ এই সূক্তের কল্পনায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ঋগ্‌বেদের বহুদেবতাবাদের যুগে অপূর্ব্ব হইলেও অচিন্তনীয় নয়। কারণ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধান মানবচিন্তার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। বৈদিক যুগেও যে তাহার অভাব ছিল না, তাহা একটি দিক্ দিয়া বর্ত্তমান সূক্ত প্রতিপন্ন করিতেছে। সৃষ্টিশক্তির রূপক-নাম হিসাবে অথবা উৎপত্তির উপাদান হিসাবে নামচিহ্নের অতীত হিরণ্যগর্ভ, সর্ব্বব্যাপী সহস্রশীর্ষ পুরুষ, অথবা সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতির কল্পনা, অন্য দিক্ দিয়া বৈদিকচিন্তায় এই অনুসন্ধানের নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান সূক্তে যুক্তি বা দার্শনিক চিন্তার শৃঙ্খলতা নাই ; সহজ জ্ঞান বা অনুভূতির উৎকর্ষ হইতেছে ইহার আত্মগত অথচ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য। তথাপি, এই সকল কারণে ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তার ইতিহাসে বর্ত্তমান সূক্ত একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। বাক্-উচ্চারিত এই সূক্তকে কোন বিদেশী লেখক 'The Word speaketh' এইরূপ অনুবাদ করিয়া, ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মসম্মত ঐশী শক্তির আবেশের উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, এই সূক্তের একটি সার্ব্বজনীন অর্থ করাও কঠিন নয়। সুতরাং পরবর্ত্তী যুগে যে ইহা শক্তিবাদের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিচিত্র নয়।

উল্লিখিত অন্য আটজন ব্রহ্মবাদিনীদের রচনায় এই ধরণের ভাবাবেশ বা উচ্চ তত্ত্বের আভাস নাই। তাঁহারা নিজেদের নারী-জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতির কথাই বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে, ঘোষা ঋগ্‌বেদের দশম

মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্তের রচয়িত্রী; উভয় সূক্তই অশ্বীদ্বয়ের উদ্দেশে রচিত এবং প্রত্যেক সূক্তে ১৪টি করিয়া ঋক্ বা স্তবক আছে। যে কয়টি নারী-ঋষির ঋক্ ঋগ্বেদে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ঘোষার মত এতগুলি ঋক্ আর কেহই রচনা করেন নাই। সূক্ত-রচয়িতা প্রাচীন ঋষিবংশে ঘোষার জন্ম; তাঁহার পিতামহের নাম দীর্ঘতমস্, পিতার নাম কক্ষীবৎ। ইঁহারা ছিলেন অশ্বীদ্বয়ের উপাসক এবং ইঁহাদের উভয়েরই অনেকগুলি সূক্ত ঋগ্বেদে রক্ষিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিলেও, কথিত আছে (বৃহদ্দেবতা ৭।৪২-৪৮) যে, ঘোষার সর্ব্বশরীর শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল বলিয়া বয়স্থা হইয়াও তিনি পিতৃগৃহে অবিবাহিত অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। পরে পিতৃ-পিতামহ আরাধিত অশ্বীদ্বয়ের অর্চ্চনা করিয়া, রোগমুক্ত হইয়া বিবাহিত ও সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। দশম মণ্ডলের ৪১ সংখ্যক পরবর্ত্তী সূক্ত ঘোষার পুত্র সুহস্তের রচিত বলিয়া কথিত আছে। এই গল্পের আভাস ঘোষা-রচিত সূক্তদ্বয়ের মধ্যেও রহিয়াছে; দীর্ঘতমস্ ও উশিজের পুত্র, তাঁহার পিতা কক্ষীবৎ স্বরচিত একটি সূক্তে (১।১২২।৫) অশ্বীদ্বয়ের উদ্দেশে বলিতেছেন—

ধবল ব্যাধির নিরাময় তরে ঘোষা ডেকেছিল যথা,
উশিজপুত্র আমি আগ্রহে তোমাদের ডাকি তথা।

৩৯ সংখ্যক সূক্তেও ঘোষা নিজের পিতৃগৃহে অনূঢ়াবস্থা ও পরে সুখ-সৌভাগ্যলাভের উল্লেখ করিয়া অশ্বীদ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন—

ভবনে নিষণ্ণা জীর্ণা হয়েছে যে নারী,
তোমরা আনিয়া দিলে সুখভোগ তারি।

ঋগ্বেদের ১।১১৭।৭ সংখ্যক্ ঋকে কক্ষীবৎ এ-কথারও প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

উল্লিখিত দুইটি রচনায় ঘোষা তাঁহার প্রতি অশ্বীদ্বয়ের বিশেষ অনুকম্পার জন্য তাঁহাদের বন্দনা করিতেছেন। প্রথমটিতে অশ্বীদ্বয় কিরূপ বিবিধ ব্যক্তিকে বিপদ হইতে রক্ষা ও রোগ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন, তাহার বিবৃতি আছে; ইহাতে ঘোষার নিজের কথা অল্প। দ্বিতীয়টি অধিকতর ব্যক্তিগত; ইহাতে ঘোষা সরল ভাবে মনের নিগূঢ়তম আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অশ্বীদ্বয়ের নিকট ব্যক্ত করিয়া অভিলাষপূরণের জন্য তাঁহাদের স্তুতি করিতেছেন। ইহার একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, ঘোষা যে স্বামী লাভ করিয়াছিলেন,

পাণিগ্রহণের সময় তিনি বিপত্নীক হইয়া পূর্ব্বপত্নীর জন্য রোদন করিতেন; এবং ঘোষা তাঁহার সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদের জন্য অশ্বীদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ঘোষা বিবাহের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন—

হে নর-যুগল, বিভূষিত করে কেবা কবে কোন্‌খানে
তোমাদের রথ স্তুতির স্তবকে সুখসমৃদ্ধি লাগি';
বৃহৎ সে রথ দিবসে-দিবসে তোমাদের বহি' আনে
সদা চলন্ত জনে-জনে দ্যুতি বিকাশি' প্রভাতে জাগি'।

নিশীথে কোথা, হে অশ্বী-যুগল, কোথা রহ দিনমানে,
বসতি করেছ কোথায় তোমরা, অভিসার কার সনে?
নারী যথা নরে, বিধবা দেবরে যথা শয্যায় টানে,
তোমাদের বল টানে কোন জন আপনার নিকেতনে?

সমৃদ্ধ দু'টি রাজার মতন, নিদ্রাভঙ্গ তরে
গীত হয় প্রাতে দিবসে-দিবসে কত তোমাদের স্তুতি;
ওগো আরাধ্য, ধ্বংসি' অশুভ যাও কোথা কার ঘরে,
রাজপুত্রের মত লও কার সোমের সবনাহুতি?

ব্যাধ ডাকে যথা বৃহৎ মৃগেরে, তেমনি ত বারে-বারে
তোমাদের ডাকি দিবস-রজনী আমিও হবিষ্মতী;
যথাঋতু সবে তোমাদের পূজে যজ্ঞের সম্ভারে,
সকলের লাগি অন্ন বহন কর, হে শুভস্পতি।

রাজার কন্যা ঘোষা আমি, ওগো অশ্বী যুগল-সাথী,
তোমাদের কথা কহি, জিজ্ঞাসি সবারে চতুর্দ্দিকে;
তোমরা রহিও কাছে কাছে মোর সকল দিবস-রাতি;
নাশিও আমার অশ্বারোহী ও রথী সে শত্রুটিকে।

বিশ্‌পতি যেন রথে চড়ি' কোথা চল কুৎসের মত?
হে যুগল-কবি, ডাকে তোমাদের কেবা কোন স্তুতিগানে;
অভিসারে যায় রমণী যেমন, মধুমক্ষিকা যত
চলে, তোমাদের ভূরি মধুধারা মুখে বহি' তারা আনে।

তারি সখা তুমি যে দেয় হব্য ; বশ কৃশ উশনারে
শয়ু ভুজ্যুরে অভয় দিয়েছ বিপদে রক্ষা করি' ;
সাতমুখী মেঘ বিদারি' ধরারে ডুবাও বৃষ্টিধারে ;
লভি' তোমাদের সখ্য, আমিও সুখের আশাটি ধরি

ঘোষা বয়স্থা, আজ তার বর এসেছে কন্যাকামী ;
তোমার বৃষ্টি তাহার লাগিয়া ওষধি-শস্য আনে ;
দুর্জ্জয় সে যে, পতি-অধিকার আছে তার, জানি আমি ;
নিম্নাভিমুখী নদীর প্রবাহ বহুক্ তাহারি পানে।

যে জন জায়ার জীবনের লাগি' দেবতার কাছে কাঁদে,
যজ্ঞের ভাগ দেয় পত্নীরে, পিতৃগণের তরে
সন্তানে দিয়া জনম প্রিয়ারে দীর্ঘ বাঁধনে বাঁধে,—
পতি সেই জন, পত্নী তাহারে সুখে বাহুযুগে ধরে।

তার সেই সুখ নাহি আমি জানি ; দাও মোরে বুঝাইয়া
কেমনে তরুণ তরুণীসঙ্গ লভে তার মন্দিরে ;
কামনা মোর, হে অশ্বী-যুগল, তেমনি আমিও গিয়া
গৃহে তার রহি, লয়ে বলিষ্ঠ অনুরাগী স্বামিটিরে।

হে ধনী ধনের দাতা, আমা' পরে তোমাদের শুভমতি
থাক্ চিরদিন, পূরাও আমার হৃদয়ের অভিলাষ ;
তোমরা দু'জনে রক্ষক মোর হও, হে রথস্পতি ;
আর্য্যের গৃহে প্রিয়া হয়ে তার করি যেন আমি বাস।

তোমাদের আমি স্তোত্রী, আমার পুরুষের গৃহমাঝে,
কল্যাণদাতা! বীরপুত্রের সনে দিও ধনরাশি ;
যাত্রার পথে প্রপাণযুক্ত সুতীর্থ যেন রাজে,
পথের বিঘ্ন দূর করে দিও, দুর্ম্মতি জনে নাশি'।

বিবাহিত জীবনের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঘোষা যেমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অত্রিগোত্রজাতা বিশ্ববারাও তাঁহার বর্ত্তমান দাম্পত্য-জীবনের

সুখ ও শান্তির জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিদেবের নিকট যজ্ঞপাত্র হস্তে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং আহুতি দান করিয়া বলিতেছেন—

সমিদ্ধ হয়ে অগ্নি আকাশে উষাপানে মহাদীপ্তি ধরে ;
নমিছে বিশ্ববারা দেবগণে প্রাচীমুখে হবিপাত্র করে।

হে অগ্নি, তুমি অমৃতের রাজা, সঙ্গী তাহার যে দেয় হবি ;
কর তার শুভ, দাও ধন তারে, আতিথ্য তার ভবনে লভি'।

উজ্জল যতই দীপ্তি তোমার, মোদের ভাগ্য উজ্জল তত ;
দমন করিয়া শত্রুরে, কর দম্পতী-প্রীতি সুসংযত।

হে বৃষভ, তুমি সমিধ্যমান উজলিয়া রহ যজ্ঞভূমি ;
বন্দি তোমার মহাতেজস্বী কান্তি, ধনের দাতা যে তুমি !

ওগো সুযজ্ঞ অগ্নি, আমার যজ্ঞে আহূত, দীপ্যমান,
মোর লাগি' কর যজ্ঞ, পুরোধা, দেবগণে কর হব্যদান।

অধ্বরে মোর জেগেছে অগ্নি, সকলে আদরে আহুতি ধর,
পরিচরণের যতনে এখন হব্যবাহনে বরণ কর।

এই সূক্ত (ঋঃ ৫।২৮) হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, বিশ্ববারা যে কেবল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নয়, তিনি স্বয়ং ঋত্বিকও ছিলেন এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের যুগে নারীগণ এইরূপ যজ্ঞ-সম্পাদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অত্রিবংশীয়া অপালা বিবাহিতা হইলেও বিশ্ববারার মত স্বামি-সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। ত্বক্‌রোগের আক্রমণে তিনি স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইন্দ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের অপালা-রচিত ৯১ সূক্তের ৭টি ঋকের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। সোমরস ইন্দ্রের প্রিয় ও রুচিকর জানিয়া অপালা জল আনিবার পথে একটি সোমলতা পাইয়া তাহা দন্তে চর্ব্বণ করিয়া ইন্দ্রের অভিষব করেন। দন্তঘর্ষণের শব্দকে সোমপেষণের প্রস্তরের ধ্বনি মনে করিয়া ইন্দ্র উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে মুখ দিয়া সোমরস পান করেন, ও তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে তিনটি বর দান

করেন। পিতার কেশবিরল মস্তক, তাঁহার শস্যবিহীন ক্ষেত্র, ও অপালার ত্বকরোগ-জনিত রোমশূন্য অঙ্গ—এই তিনটিকেই ইন্দ্র উৎপাদনশীল করেন। এবং এই উপলক্ষ্যে অপালার দেহ শকট ও যুগের মধ্যবর্ত্তী রথ-রন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া তিন বার আকর্ষণ করিয়া অপালাকে রোগমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সূক্তের মধ্যে ইন্দ্রের সহিত অপালার যে ঘনিষ্ঠতার আভাস রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া বৃহদ্দেবতাকার (৬।৯৯-১০৬) প্রাচীন কালের দেব-মানবীর প্রেমকাহিনীর অনুযায়ী অনুমান করিয়াছেন যে, ইন্দ্র অপালাকে ভালবাসিয়া তাহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন। সূক্তটি এইরূপ—

জল-অভিমুখে চলিতে কন্যা লভে
সোমলতাগাছি, তাহারে দন্তে ধরি'
কহে গৃহপথে—ইন্দ্রের অভিষবে
শক্রের লাগি' তোমারে পিষ্ট করি।

হে বীর ইন্দ্র, যেথা রহে যজমান,
দীপ্তি বিকাশি' যাও তার নিকেতনে,
দন্তাভিষুত মোর সোম কর পান
যব-করম্ভ-অপূপ-উক্থ সনে।

তোমারে, ইন্দ্র, জানিতে ইচ্ছা করি ;
লভিনি তোমারে কখনো নিকটে এসে ;
মন্দ মন্দ, হে সোমবিন্দু, ক্ষরি'
প্রবাহিত হও ইন্দ্রের উদ্দেশে।

ইন্দ্র দিবে কি ধন যার নাহি শেষ ?
দিবে কি মোদের সামর্থ্য মনোরম ?
কত বার আমি পেয়েছি পতির দ্বেষ,
এসেছি লভিতে ইন্দ্রের সমাগম।

ইন্দ্র, পিতার হের কেশহারা শির,
উষর ক্ষেত্র, দেহ মোর রোমহীন ;

হে শতক্রতু, ডাকি আমি, এস বীর,—
উর্ব্বর কর তুমি আজ এই তিন।

শকটের আর যুগের বিবরে তারে,
হে ইন্দ্র, তব রথের রন্ধ্রে ধরি'
কর, তিন বার আবর্ত্তি অপালারে,
সূর্য্য সমান ত্বক্ তার, দোষ হরি'।

অবশিষ্ট কয় জন ব্রহ্মবাদিনীর যে সকল রচনা ঋগ্‌বেদে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অল্প; প্রত্যেকের একটি বা দুইটি ঋক্ মাত্র, কাহারও কোন সম্পূর্ণ সূক্ত পাওয়া যায় না। গোধার দেড়খানি মাত্র ঋক্; অগস্ত্য-ভগিনী, শশ্বতী ও রোমশার প্রত্যেকের একটি ঋক্, লোপামুদ্রার দুইটি।

দশম মণ্ডলের ১৩৪ সূক্তের প্রথম সাড়ে ছয়টি ঋক্ ইন্দ্রের উদ্দেশে মান্ধাতা ঋষি কর্ত্তৃক রচিত; পরের ষষ্ঠ ঋকের অর্দ্ধাংশ ও সপ্তম ঋক্ গোধার রচিত। ইহাতে ব্যক্তিগত কিছুই নাই, কেবল ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণের স্তুতি আছে—

দীর্ঘ তোমার অঙ্কুশ আর শক্তি-অস্ত্র রয়েছে করে,
সমুখচরণে ছাগ যথা শাখা, তথা শত্রুরে আঁকড়ি ধরে।
(হে ইন্দ্র, দেবী কল্যাণময়ী জননী তোমারে প্রসব করে)*

যেমন মন্ত্র শিখেছি তেমনি আরাধনা করি, করিনি ত্রুটি;
দেবগণ, ধরি তোমাদের যেন প্রসারি' বাহু ও পক্ষ দু'টি।

দশম মণ্ডলের ৬০ সূক্তের ১২টি ঋকের মধ্যে ষষ্ঠ ঋক্‌টি অগস্ত্য-ভগিনীর রচিত; বাকিগুলি তাঁহার পুত্র গোপায়নের। রচয়িত্রীর নাম পাওয়া যায় না। কথিত আছে (বৃহদ্দেবতা, ৭।৮৫-৯০) ইহার চারি পুত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অসমাতির গৃহ-পুরোহিত ছিলেন। কোন কারণে অসমাতি সেই পুত্রদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তাঁহাদের স্থলে অন্য দুইটি পুরোহিত নিযুক্ত করেন। নব-নিযুক্ত পুরোহিতগণ সুবন্ধু নামক অগস্ত্য-ভগিনীর এক পুত্রকে নিহত করিলে, অন্য

---

* এই পাদটি ধ্রুব বা refrain, পূর্ব্বের পাঁচটি ঋকেও রহিয়াছে। পরবর্ত্তী ঋকে ইহা নাই।

তিন পুত্র শত্রুদমন করিবার জন্য রাজা অসমাতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। ষষ্ঠ ঋকে দেখা যায়, পুত্রশোকাতুরা অগস্ত্য-ভগিনী রাজা অসমাতির উদ্দেশে বলিতেছেন—

লোহিত অশ্ব রথে জুড়ি' চল অগস্ত্য-নপ্তাদিগের* তরে।
নাশ' তাহাদের কৃপণ যাহারা দেবগণে নাহি হব্য ধরে।

পরবর্ত্তী ঋক্‌গুলিতে সুবন্ধুর পুনর্জীবনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অবশিষ্ট তিন জন ব্রহ্মবাদিনী—শশ্বতী, লোপামুদ্রা ও রোমশা—তাঁহাদের নারী-জীবনের নিগূঢ়তম কথা অকপট ভাবে বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ঋক্‌গুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং আধুনিক রুচিসম্মত না হইলেও স্বাভাবিক স্পষ্টবাদিতার জন্য উল্লেখযোগ্য। শশ্বতী ছিলেন অঙ্গিরস ঋষির তনয়া ও যাদব আসঙ্গের পত্নী। অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের শেষ ঋক্‌টি তাঁহার রচনা বলিয়া কথিত আছে। নারীধর্ম্মের উৎকর্ষের জন্য এই ঋকে শশ্বতীকে বিশিষ্ট ভাবে নারী বলা হইয়াছে। তাঁহার পতি রাজপুত্র আসঙ্গ কোন সময়ে পুরুষত্ববর্জ্জিত হন, পরে মেধাতিথির প্রভাবে পুনরায় ভোগক্ষম হইলে—

স্থূল মাংসল লম্বিত হেরি' সমুখে অঙ্গ তারি,
"এনেছ, আর্য্য, সুভদ্র ভোগ" কহে শশ্বতী নারী।

অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রার গল্প প্রায় অনুরূপ। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের প্রথম দুইটি ঋক্ তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত আছে (বৃহদ্দেবতা ৪।৫৭-৫৮)। সংযমী ও ভোগস্পৃহাশূন্য অগস্ত্য দিবা-রাত্রি যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া পত্নীর নিকট হইতে সর্ব্বদা নিজেকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তপস্বী স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করিয়া লোপামুদ্রা বলিতেছেন—

দিবস-রজনী শ্রান্ত আমারে দীর্ঘ বরষ জীর্ণ করে,
প্রতি-উষা হরে কায়ার কান্তি,—আসুক্ পুরুষ নারীর তরে!

দেব-সম্ভাষী সত্যপালক পূর্ব্ব ঋষিরা, তাদের ঘরে
ছিল জায়া, তবু ছিল তপস্যা,—যাক্ নারী আজ পুরুষ তরে।

এই সূক্তেরই অগস্ত্য-রচিত তৃতীয় ও চতুর্থ ঋক্ হইতে জানা যায় যে, লোপামুদ্রার অনুযোগ ব্যর্থ হয় নাই।

---

* 'নপ্তা' শব্দ মূলে আছে; এখানে ভাগিনের অর্থ বুঝিতে হইবে।

ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম ঋক্ বৃহস্পতি-তনয়া রোমশার উক্তি বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার স্বামী প্রতাপশালী রাজা ভাব্য স্বনয় তাঁহাকে অল্পবয়স্কা ও নিজের তুলনায় নিতান্ত অনুপযোগী মনে করিয়া অবহেলা করিতেন। রোমশা নিজ অঙ্গে প্রথম যৌবনের আগমন অনুভব করিয়া, নবযৌবন-সুলভ স্পর্দ্ধা ও আনন্দে স্বামীর উদ্দেশে বলিতেছেন*—

হের কাছে এসে পরশি' অঙ্গ—বাল্য আমার হয়েছে গত;
আমি যে এখন হয়েছি রোমশা গন্ধারীদের মেষীর মত।

উক্ত সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্ ভাব্য স্বনয়ের রচিত; তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি রোমশার উক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন।

বৈদিক সাহিত্যের বা ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হিসাবে উল্লিখিত রচনাগুলির অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া মনে হইবে না; কিন্তু এগুলি যদি যথানির্দ্দিষ্ট মহিলা-ঋষিদের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সে-যুগের সমাজ-জীবনের, বিশেষতঃ নারী-জীবনের, দিক দিয়া ইহাদের মূল্য অস্বীকার করা যাইবে না। তখনও নারীগণ স্বয়ং যজ্ঞ-সম্পাদন প্রভৃতি কতকগুলি অধিকার হইতে বঞ্চিত হন নাই। স্ত্রীলোকেরাও মন্ত্র রচনা করিতেন, এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় যাহাই হউক না কেন, সেই মন্ত্র বেদমন্ত্র বলিয়া সমাদৃত ও সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যে সমাজ Tribe বা জন-সমষ্টির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে কুলপতি বা গৃহস্বামীর ক্ষমতা সর্ব্বপ্রধান ও অনিয়ন্ত্রিত ছিল; সমাজে ও গৃহে গৃহস্বামিনীর উচ্চ মর্য্যাদা থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ছিল না। তথাপি পরবর্ত্তী যুগে তাহার অবস্থার যে অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ ঋগ্‌বেদের সময়ে দেখা যায় না। নারী-জীবনের নিষ্কপট ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি হিসাবেও এই সকল ঋক্-রচয়িত্রীদের রচনাগুলির যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে; তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের যে ঈষদ্-দৃষ্টি পাওয়া যায়, তাহা প্রকাশ-ভঙ্গীর সারল্যে ও সততায় বিচিত্র ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

* বৃহদ্দেবতায় (৪।১-৩) গল্পটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দেওয়া আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে নারী-কবির রচনা*

প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সুভাষিত-সংগ্রহে কয়েকজন নারী-কবির নাম ও তাঁহাদের রচনা হইতে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দু-একটি কবিতা বিভিন্ন যুগের অলঙ্কারগ্রন্থেও রচয়িত্রীর নামরহিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহাদের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে ইহা ছাড়া কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় না; নিম্নে এই আনুমানিক কাল সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া হইল।

এই কবিদের বিষয়ে বা তাঁহারা কি কাব্য লিখিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আর কোনও নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কতকগুলি অদ্ভুত নাম (যেমন জঘনচপলা, বিকটনিতম্বা) ও রচনার ভঙ্গি হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, শ্লোকগুলি পুরুষ-কবিদের রচিত, ছদ্মনামে বা বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকবিদের নামে প্রচলিত। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। বরং এই সকল নারী-কবিদের বন্দনা করিয়া পরবর্ত্তীকালে ধনদদেব লিখিয়াছেন—

শীলা-বিজ্জা-মারুলা-মোরিকাদ্যাঃ
কাব্যং কর্ত্তুং সন্তি বিজ্ঞাঃ স্ত্রিয়োঽপি।
বিদ্যাং বেত্তুং বাদিনো নির্বিজেতুং
বিশ্বং বক্তুং যঃ প্রবীণঃ স বন্দ্যঃ॥

যাঁহাদের বিক্ষিপ্ত রচনা একত্র করিয়া এই প্রবন্ধে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল, তাঁহাদের মধ্যে দু' একজন সম্বন্ধে কিংবদন্তী হিসাবে দু' একটি কথা পাওয়া যায়। বিজ্জা (বিদ্যা) বা বিজ্জকার নামাঙ্কিত একটি শ্লোক সুভাষিত-সংগ্রহে প্রসিদ্ধ আছে; দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শের প্রারম্ভে "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী"র বন্দনা করিয়াছেন, বিজ্জা নাকি তাহা লক্ষ্য করিয়া সাহঙ্কারে বলিয়াছিলেন—

---

* শনিবারের চিঠি, ১৩৩৬ এবং ১৩৪৬। ইহার কতকগুলি কবিতা আমার 'লীলায়িতা' কাব্যগ্রন্থে (১৩৪১) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবিমল ও শ্রীমতী রমা চৌধুরী তাঁহাদের Sanskrit Poetesses পুস্তকে (কলিকাতা ১৯৩৯) ৩৩টি নারী-কবির ১৪০ শ্লোকের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্যামা বিজ্জকা, না জানিয়া মোর নীল-উৎপল-ছবি,
বাণীরে সর্ব্বশুক্লা বলিয়া বন্দে দণ্ডী কবি।

ইহা যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে বিজ্জকা দণ্ডীর সমকালবর্ত্তী না হইলেও কিছু পরবর্ত্তী এইরূপ অনুমান করা যায়; অর্থাৎ বিজ্জকাকে অষ্টম শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরা যায় না। এই অনুমানের সমর্থনে বলা যায়, মুকুল ভট্ট (৯ম শতক) তাঁহার অভিধা-বৃত্তি-মাতৃকায় একটি শ্লোক (রচয়িতার নাম বিনা) উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা পরবর্ত্তী সুভাষিত-সংগ্রহে বিজ্জকার নামে ধরা হইয়াছে। বৈদর্ভীরীতিনিষ্ঠা 'কর্ণাটরাজপ্রিয়া' বিজয়াঙ্কা নামক (১০ম শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী) একজন নারী-কবিকে কালিদাসের প্রতিস্পর্দ্ধিনী বলিয়া রাজশেখর উল্লেখ করিয়াছেন; ইনি বোধ হয় বিভিন্ন ব্যক্তি। আবার দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র চন্দ্রাদিত্যের মহিষীর নামও বিজয়া বা বিজয়-ভট্টারিকা ছিল (৬৬০ খ্রীঃ অঃ); কিন্তু তিনি কবি ছিলেন বলিয়া কোনও প্রসিদ্ধি নাই। বিকটনিতম্বা সম্বন্ধে এইটুকু খবর পাওয়া যায়, ভোজরাজ (১১শ শতকের প্রথমার্দ্ধে) তাঁহার শৃঙ্গারপ্রকাশ গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইনি পুনর্ভূ ছিলেন অর্থাৎ বিধবা হইবার পর বিবাহিতা হইয়াছিলেন। ৯ম শতকের মধ্যভাগে আনন্দবর্দ্ধন একটি বেনামী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা পরবর্ত্তী সংগ্রহাদিতে বিকটনিতম্বার রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে উদ্ধৃত শীলাভট্টারিকা ১০ম শতকের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রাজশেখর বলিয়াছেন যে, পাঞ্চালী রচনা-রীতি তাঁহার প্রিয় ছিল এবং এই রীতির অনুশীলনে তিনি বাণভট্টের সমকক্ষ ছিলেন। নাম হইতে মনে হয় তিনি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফল্গুহস্তিনীর একটি কবিতা বিনা নামে বামনের কাব্যালঙ্কারে (৮ম শতকে) উদ্ধৃত হইয়াছে।

উদ্ধৃত কবিদের মধ্যে প্রাকৃত ভাষায় রচনা করিয়াছেন—শশিপ্রভা, রেবা রোহা, প্রহতা, অনুলক্ষ্মী, মাধবী ও অবন্তিসুন্দরী। অবন্তিসুন্দরী ছিলেন কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতির রচয়িতা রাজশেখরের পত্নী, যাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য উক্ত নাটিকাটি প্রাকৃতভাষায় রচিত হইয়াছিল।

অন্যান্য কবিদের রচনা যে সমস্ত সুভাষিত-সংগ্রহাদিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ আনুমানিক সময় নির্দেশ করা যায়—

ভাবকদেবী—১০ম শতকের পূর্ব্বে।
জঘনচপলা—১০ম শতকের পূর্ব্বে।
মোরিকা ও মারুলা—১৩শ শতকের পূর্ব্বে।
লক্ষ্মী ও মদালসা—১৪শ শতকের পূর্ব্বে।
ইন্দুলেখা ও সুভদ্রা—১৫শ শতকের পূর্ব্বে।

অন্যান্য রচনাগুলি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন।

এই অখ্যাত ও অজ্ঞাত কবিদের অধিকাংশ রচনা ভাবপ্রবণ ও আদি-রসাশ্রিত। আধুনিক রুচিবিগর্হিত বলিয়া সব কবিতাগুলির অনুবাদ করা যায় না। আবার যেগুলি আদিরসবর্জ্জিত সেগুলি সব সময়ে কবিতা বা বৈদগ্ধ্য হিসাবে উত্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু রুচি-অরুচির কথা ছাড়িয়া দিলে, ইহাদের স্পষ্টবাদিতা ও রসিকতা যে উপভোগ্য তাহা অস্বীকার করা যায় না।* স্বামীদের সম্পর্কে স্বামিনীরা এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা এখনও অনুধাবনযোগ্য!

বিজ্জা বা বিজ্জকা

(১)

গেছে সদ্ভাব, সে প্রেমবন্ধ, প্রণয়ের বহুমান,—
সে জন সমুখে চ'লে যায়, তার অচেনার মত ভান;
ভাবিয়া ভাবিয়া এই কথা আর গত দিবসের সুখ,
বুঝিতে পারি না আজো কেন সখি, শতধা ভাঙে না বুক!

(২)

ধন্য তোমরা সখি, তোমাদের এত কথা থাকে মনে—
পটু চাটুশত, নর্ম্মবিলাস হয়েছে যা' প্রিয়সনে;
কটিবসনের বন্ধন যবে টুটাল সে প্রিয়-কর,—
শপথ আমার সখি, যদি কিছু মনে থাকে তারপর!

* দ্রষ্টব্য History of Kāvya Literature, Calcutta University, 1947, পৃঃ ৪১৬-১৮ দ্রষ্টব্য।

(৩)

চম্পক, তোমা' কে রোপিল হীন গ্রামের পামর জনের ঘরে ?
ভগ্ন বাটের ভূষণ হয়েছ, শাকের মতন শাখায় ভরে !

(৪)

বাল্যে বালক, যৌবনে যুবা, বৃদ্ধ বয়সে নিতি
বৃদ্ধ লইয়া ঘর করি মোরা,—এই আমাদের রীতি।
পুত্রী রে, তোর এক পতি লয়ে জন্ম কাটাতে সাধ—
আমাদের কুলে হয়নি কখনো হেন সতী-অপবাদ !

(৫)

মুখটি তুলিয়া যখন রভসে চুমে প্রিয়তম, তখন ক্ষীণ
নিষেধাক্ষর হুঙ্কারটুকু ধন্য মানিনী-কণ্ঠলীন !

(৬)

হে প্রতিবেশিনি, ক্ষণেক মোদের হের এই গৃহতল,—
এ শিশুর পিতা দেয় না ত মুখে বিরস কূপের জল ;
কি করি ? একাকী যাই যেথা নদী তমালের বনে হারা,—
যত কর্কশ বেতসগ্রন্থি ছিঁড়ুক এ দেহ সারা !

(৭)

নিত্যবক্র, গুণহীন, দূর, বহুরাগ, অস্থির,*
প্রাবৃটকালের ইন্দ্রধনুটি মন যেন যুবতীর।

(৮)

জিনিল প্রথমে তোরে সেই দেব চন্দ্র যে শিরে ধরে,
উদ্ধতমতি বুদ্ধ, আর সে প্রবাসী কান্ত পরে !
অতিকৃশা আমি অনাথা বালিকা, ওরে কাপুরুষ সর,—
ধিক্ তোরে, ধিক্ পৌরুষ তোর, ধিক্ কার্মুক-শর !

---

* শ্লেষ স্পষ্ট।

(৯)

হে প্রাণবন্ধু, ফিরিতে তোমার কতদিন আরো রয়েছে বাকি ?
চাঁদেরো কিরণ দহন করিছে—এই পোড়া দেশে কেমনে থাকি ?*

(১০)

চন্দ্রসূর্য্য বংশ উজলি' আছে বহু রাজা, জানি ;
তোমারেই তবু ভুবন-শাসক বীর বলি' আমি মানি ;
মর্দ্দি' অঙ্গ†, উৎক্ষেপি' চোল, আকর্ষি' কুন্তল,
জিনিয়া মধ্যদেশ তব কর কাঞ্চীতে চঞ্চল।

(১১)

আগুনের কালো ধোঁয়ার মতন মেঘ দিকে-দিকে চলে,
শ্যামা হল ভূমি নবকন্দলে অবিরল তৃণদলে ;
বিলাস-সুভগ কাল এবে এল প্রণয়ীজনের তরে,
এখন কেবল বিরহীরা, হায়, মরণ শরণ করে !

(১২)

মত্ত গজের ক্রীড়ায় বিমল জল যার ছোটে আকাশ-ভালে,
আজ যে তড়াগে চরে শুধু বক, ঘোলা হয় সে ত তাহারি চালে !

(১৩)

হেরিয়া তোমার ঘন ছায়া আর মাথাটি নম্র ফলের ভরে,
এসেছি আমরা চারু তরুবর, শান্তি মাগিয়া ক্ষণেক তরে ;
কোটরে লুকায়ে রহে যদি শুধু সাপের স্ফুরিত বিষোদ্গার,
মুখে তার শুধু অনলের জ্বালা,—দূর হতে করি নমস্কার !

* ইহার উত্তরে 'প্রাণবন্ধু' (অজ্ঞাত) লিখিতেছেন—

দহন করিছে চাঁদের কিরণ,—এ কথা প্রেয়সি, ঠিক ত নহে ;
হৃদয় আমার বিরহ-তপ্ত, সেথা আছ, তাই সে তাপ দহে।

† এই শব্দগুলি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক।

(১৪)

কবির রহে যে-অভিপ্রায়টি শব্দের অগোচরে,
কেবল আর্দ্রপদের ভঙ্গি যাহারে স্ফুরিত করে,
স্ফুট-রোমাঞ্চ অঙ্গ-বিকারে তাহারে প্রকাশ করি'
নিরুদ্ধবাক্ জনের কেবল এই অঞ্জলি ধরি !

বিজয়াঙ্কা

যাঁদের জন্ম নলিনে*, পুলিনে†, আর বল্মীক'পরি‡,
ত্রিলোকের গুরু সেই তিন কবি, তাঁদের প্রণাম করি ;
আর যারা করে গদ্য-পদ্য-রচনা, তাদের শিরে
কর্ণাটরাজ-বল্লভা আমি রাখি বাম পদটিরে !

ফল্গুহস্তিনী

(১)

পুরুষরত্ন, ধরার ভূষণ, গুণে সে বিশ্বজিৎ,—
হায় ভঙ্গুর করি' তারে গড়ে বিধাতা অপণ্ডিত !

(২)

রুদ্রের জটাবল্লীর ফুল, রজনীর হাসিরেখা,
সন্ধ্যানারীর নিতম্বে যেন অম্লান নখলেখা,
তমিস্রাভেদী বিষাণ ব্যোমের, কামের সে কার্ম্মুক,
প্রতিপদ-শশী প্রেমিক জনের মনে আনে কত সুখ !

ভাবকদেবী

(১)

আগে সে মোদের ছিল এক দেহ, ছিল না ত ছাড়াছাড়ি,-
তার পর তুমি নহ আর প্রিয়, আমি হত-আশা নারী !
এখন আমি যে শুধুই গৃহিণী, তুমি শুধু মোর স্বামী.—
প্রাণ ছিল মোর কুলিশ-কঠিন, তারি ফল লভি আমি !

---

* ব্রহ্মা † ব্যাস ‡ বাল্মীকি

(২)

স্বামীরা স্বাধীন, তবে কেন মিছে লুঠিছ আসিয়া আমার পায় ?
মন বসেছিল অন্য কোথাও, কিছুদিন তরে ?—কি দোষ তায় ?
পতির বিহনে সতী নাহি বাঁচে, এই কথা আজো সকলে কহে,—
আমি বেঁচে আছি তোমার বিরহে,—দোষ ত আমার, তোমার নহে !

বিকটনিতম্বা

(১)

মল্লী কেতকী চম্পক যেথা মধুময় সুরভিত,
ভ্রমে কাক সেথা শুধু নিমগাছে, মুখ ধূলি-ধূসরিত !

(২)

"হে করভ-উরু, এ নিশীথে কোথা চলেছ সাহস ভরে ?"
"যেখানে আমার প্রাণের অধিক প্রিয়জন বাস করে।"
"একাকিনী তুমি চলেছ তবুও ভয় নাহি হয় মনে ?"
"উদ্যত-ধনু মদন সহায়—চলেছে সে মোর সনে !"

(৩)

শয্যায় প্রিয় আসিলে, আপনি কটির গ্রন্থি টুটে,
শ্লথ মেখলায় বাঁধিয়া বসন নিতম্বে আসি' লুঠে,—
এইটুকু শুধু মনে আছে,—পরে নিবিড় পরশে তার
কে আমি, কে প্রিয়, কেমন বিলাস, মনে নাই কিছু আর !

(৪)

বন্ধুর কথা না শুনি সরলে, প্রণয়ের পরিণাম
না ভাবিয়া, শুধু মান করি' আজ অদৃষ্ট হল বাম ;
টানিয়া প্রলয়-দহন-দীপ্ত অঙ্গার নিজ হাতে
অরণ্যে এ যে শুষ্ক রোদন !—জানি না কি ফল তা'তে !

(৫)

'তন্বী বালিকা অতি-মৃদুতনু'—কে কবে এ ভয় করে ?
দেখেছ কখনো ভ্রমরের ভরে মঞ্জরী ভেঙে পড়ে ?
হে সখা, ইহারে অতিনির্দ্দয় আশ্লেষে কর বশ,—
অল্প পীড়নে ইক্ষুযষ্টি দেয় না ত সব রস !

(৬)

ত্রিকোণ পৃথিবী, তার অর্দ্ধেক রহে জুড়ে নগ-নদী,
অর্দ্ধেক তার নারী আর শিশু, যোগী আর রোগী যদি,—
থাকে কয় জন, তা' হতে মান্য ছাড়ি' গুরুজন সব ?
মিছে অপবাদ—'অসতী অসতী' মুখর এ মুখ-রব !

জঘনচপলা

দুর্দ্দিন-নিশি, বহে খর বায়ু, শূন্য নগর-বীথি,
দূরদেশে পতি,—জঘনচপলা রমণীর মনে প্রীতি ।*

শীলা ভট্টারিকা

(১)

কৌমার মোর হরেছিল যেই, সেই বর, সেই চৈত্ররাতি ;
তেমনি ফুল্ল মালতী-গন্ধ, কদম্ব-বায়ু বহিছে মাতি' ;
আমিও ত সেই !—তবু সেদিনের সে-সুরতলীলা কিসের তরে
রেবাতটে সেই বেতসীর মূলে আজিও চিত্ত আকুল করে !

(২)

প্রিয়ার বিরহে চিন্তা আসিয়া হৃদয় দখল করে ;
কৃতঘ্ন ভাবি' নিদ্রা তখন কাছে আর নাহি সরে !

মোরিকা

(১)

বিরহের শ্বাসে কত না তাহার কাঁচুলী নিত্য ছিঁড়িয়া পড়ে,—
একবার তুমি এসো ওগো,—আর সেলাইয়ের সূতা নাই যে ঘরে !

* কবির নাম যেমন চতুরতার সহিত শ্লোকটিতে গ্রথিত হইয়াছে, তেমনি ছন্দঃশাস্ত্র-অনুসারে মূল কবিতার ছন্দটিরও নাম জঘনচপলা।

(২)

হৃদয় বাঁধিয়া অর্থের লোভে প্রবাসে যখন চলি,—
প্রাণসম প্রিয়া, নিষ্ঠুর হয়ে কেমনে তারে তা' বলি ?
তবুও বলিয়া, অশ্রুর ধারা হেরি যবে চোখে তার,
আমাদের মত লোকের রহে না ধনলাভ-আশা আর !

মারুলা

(১)

"কেন ক্ষীণ তনু ?" "ক্ষীণ কোথা, আমি চিরকাল দেহ এমনি ধরি !"
"কালিমা তবে ও মুখে কেন ?" "বুঝি রান্নার কালি গিয়েছে ভরি !"
শুধানু যখন—"মনে নাই মোরে ?" "নাই নাই" শুধু বলিয়া মুখে
তখন বালিকা সজল নয়নে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া পড়িল বুকে !

(২)

দুঃখটি গুরুজনের সমুখে যতনে গোপন করি'
রুধিছ মুগ্ধে, আঁখির বাষ্প, উথলে যা' আঁখি ভরি' ;
প্রতি রজনীতে নয়নের জলে শয্যাটি যায় ভিজে,
রৌদ্রে শুকায় কত আর,—নাহি জানি দশা হল কি যে !

লক্ষ্মী

বনান্তে ভ্রমে ভ্রমর, চুমে না চম্পক-কলিটিরে ;
নহে রসহীনা, সেও ত রসিক,—তবুও চাহে না ফিরে !

মদালসা

জিত হল ধরা স্মরের উজল বিকৃত ঘন মুখর শরে,—
এ কথা গর্জ্জি দিকে-দিকে মেঘ বিথারিয়া আজ ঘোষণা করে !

ইন্দুলেখা

কেহ বলে—'সে ত বহ্নিতে মেশে' ; কেহ বলে—'ডোবে সাগর-জলে' ;
'অন্য ভুবনে যায়'—কেহ বলে ; কত কথা কত লোকে যে বলে !
আমি দেখি চোখে প্রতি সন্ধ্যায় প্রচণ্ড রবি বিরাম তরে
যত বিরহিণী নারীর হৃদয়ে অলক্ষ্যে আসি' শয়ন করে !

সুভদ্রা

প্রথমে দোহন ; পরে হল কত আগুনেতে জ্বাল দেওয়া ;
সবলে মথিত করি' হল সব মাধুর্য্য কেড়ে নেওয়া ;
নবনীত হল ঘৃতে পরিণত পাকে করি' তারে বশ ;—
সব অনর্থ-পরম্পরার মূল হল স্নেহরস !

গৌরী

(১)

অর্দ্ধাঙ্গনা করি' যারে গড়ে বিশ্বেশ্বর, ত্রিলোক-মাঝে
নারী-চারুতার উপমায় সেই দ্বৈতবিহীন গৌরী রাজে !*

(২)

হেরিয়া চকোর-খঞ্জন-মীন-মৃগ-গঞ্জনে চতুর আঁখি,
তুষ্ট বিধাতা দিল তারি'পরে দুটি মরকত ছত্র আঁকি !

(৩)

রতি-জিত্বর অঙ্গ ; রয়েছে সরাগ সরোজ নয়ন সেবি' ;
জল হতে ওঠে ;—সবে দেখে যেন দেবেশ-বন্দ্যা জলের দেবী !

(৪)

অমৃতের আর প্রবালের সার দিয়ে বিধি তার অধর গড়ে,—
দংশন করে যারে অনঙ্গ-ভুজঙ্গ, তারি জীবন তরে !

পদ্মাবতী

(১)

কোশে নিষক্ত, বদ্ধমুষ্টি, মূর্ত্তিটি আনে খেদ†,—
কৃপাণে এবং কৃপণে কেবল আকারমাত্র ভেদ !

(২)

খলে আর হলে স্বভাবসিদ্ধ বক্রতাটুকু রহে ;
মুখের পরুষ ক্ষেপণ কেবল সর্ব্বসহা সে সহে !†

* রচয়িত্রীর নামাঙ্কিত। † শ্লেষ সুস্পষ্ট।

(৩)

ভ্রুযুগলের মধ্যে তিলক কস্তূরী-আঁকা রাজে ;
শোভে যেন কালো বাণের ফলাটি কামকোদণ্ড মাঝে।

মদিরেক্ষণা

দীঘির কিনারে একান্ত মনে গুঞ্জন করি' ঘুরিছে অলি,
জলের আড়ালে লুকাইয়া আছে বুঝি বা কোথায় পদ্মকলি !

মধুরবাণী

আকারে চন্দ্র, কূজনে কোকিল, পারাবত চুম্বনে,
গতির ভঙ্গে হংস, হস্তী বিলাস-বিমর্দ্দনে ;
যুবতিকাম্য সব গুণ আছে—কি আর বলিব আমি—
না থাকিত যদি দোষটুকু,—সে যে মোর বিবাহিত স্বামী !

শশিপ্রভা

যেমনি বাজায় নাচায়, তেমনি নাচি আমি বারে-বারে ;
বৃক্ষটি কভু নড়ে না আপনি, লতা নাচে বেড়ি' তারে !

রোহা

অপরাধী, তাই কর অনুনয়,—কেমনে বাঁচিবে আর ?
চারিদি:ক যবে নগরের দাহ আগুনের স্তুতি সার !

প্রহতা

প্রহারে খিন্ন মোর ডান হাতে দিয়া মুখ-ফুৎকার,
বাম হাতে কত আদরে হাসিয়া ধরিনু কণ্ঠ তার !

মাধবী

প্রভুতা ঢাকিয়া দাসের মতন কোপেও প্রসাদকামী,—
সেই হয় প্রিয় রমণীজনের,—আর সব পোড়া স্বামী !

কি কোনও দিন আমরা আন্তরিকভাবে অনুভব করি, এবং তদনুরূপ অনুরাগের সহিত আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকি ?

এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, গত যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, নূতন শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষার গতি ও প্রকৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে হয়। ইংরেজ-অধিকারের প্রথম যুগে সংস্কৃতশিক্ষা যে বিদেশী শাসকদের সুনজরে পড়িয়াছিল, তাহার কারণ, তাঁহারা তখন এ দেশে নূতন কার্য্যকরী বিদ্যার প্রচলন করিয়া দেশবাসীর চক্ষুরুন্মীলন করিতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন; এবং দেশ-শাসনের আবশ্যকতায়, হিন্দু ও মুসলমান আইন-জ্ঞানের জন্য, তাঁহাদের পণ্ডিত ও মৌলবীর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। ইহার ফলে, কোম্পানি বাহাদুরের যাহা কিছু অর্থব্যয় হইত, তাহা ব্যবস্থা-জ্ঞানী পণ্ডিত ও মৌলবীর ভরণপোষণের জন্য নিয়োজিত হইত। বৃহৎকায় সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক ইহাদের দ্বারা অনূদিত হইয়া কোম্পানির গ্রন্থাগারের শোভা বর্দ্ধন করিত, কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ইহার জন্য কিরূপ অর্থের অপব্যয় হইত, গতযুগের ইংরেজী-শিক্ষার ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ন তাহার একটি বিচিত্র উদাহরণ দিয়াছেন। একবার একটি আরবী পুস্তকের অনুবাদের জন্য ৩২,০০০ টাকা খরচ করিয়া দেখা গেল, অনূদিত গ্রন্থ এরূপ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে যে, তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য পুনরায় উচ্চ বেতনে আর একটি বিশেষজ্ঞ মৌলবীকে নিযুক্ত করিতে হইল ! কিন্তু ইহার যে কোনও সুফল হয় নাই, তাহা নহে; এই রাষ্ট্রনীতির প্রেরণায় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা ও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে, সার্ উইলিয়ম জোন্স কর্ত্তৃক ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধন। মেকলের সুপ্রসিদ্ধ ফতোয়া জারি পর্য্যন্ত, এই হইতেছে কোম্পানি বাহাদুরের শিক্ষানীতির ব্যবস্থা।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে যখন শিক্ষাসমিতির (Committee of Public Instruction) সভাপতি নিযুক্ত হইলেন, তখন এ দেশে কোম্পানির শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, এই প্রশ্ন প্রথম নিয়মিতভাবে আলোচিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে এই সমিতির মতামত ইহার সভ্যদের মধ্যে দুইটি দলে সমানভাবে বিভক্ত ছিল। ইহার ইতিহাস সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী রক্ষণশীল দল সংস্কৃতশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রগতিশীল

বিপক্ষদল, নূতন বিদ্যার কার্য্যকারিতা অনুভব করিয়া, ইংরেজী-শিক্ষা প্রচলনের জন্য উদ্যোগী ছিলেন। ইংরেজী-শিক্ষার দাবি যে তখন এ দেশের একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও প্রকৃত দাবি ছিল, তাহা ইহার বহুপূর্ব্বেই, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, জনসাধারণের উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে, হিন্দু কলেজের স্থাপন ও সাফল্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল। সুতরাং, মেকলে যে ইংরেজী-শিক্ষার তরফে সহজসাধ্য ওকালতি করিয়া, সেই দিকেই আমাদের দেশের শিক্ষার মোড় ফিরাইয়া দিতে পারিলেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণ অথবা ইহার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি করিবার সময় বা সহিষ্ণুতা মেকলের ছিল না। অন্য দিকে, পাশ্চাত্য ভাষা ও বিজ্ঞানের হিতকারিতা তখনকার দিনে এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, মেকলের মত বিদেশীর কেন, রামমোহন রায়ের মত অনেক দেশবাসীরও এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার দ্বিধার অবসর ছিল না। কিন্তু নব বিদ্যার ব্যবহারিক উপকারিতার নির্ব্বন্ধে এ কথা কেহই যুক্তিসহকারে দেখাইতে চেষ্টা করে নাই যে, ভারতবাসীর পক্ষে ভারতের প্রাচীন বিদ্যা ও সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট দাবি ও উপযোগিতা আছে, যাহা উপেক্ষা করিলে জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ হয় না। যাঁহারা ইহার পক্ষাবলম্বী তাঁহারাও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল যুক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন, যাহা কেবল সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্যের উৎকর্ষের উপর জোর দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল। ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনে উৎকর্ষের অভাব ছিল না; সুতরাং এই ধরণের যুক্তি বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। তখনকার দিনে বৈদিক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আলোচনা সম্পূর্ণভাবে হয় নাই; প্রাচীন বিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট অহঙ্কার থাকিলেও, অনুরূপ জ্ঞানের অভাব ছিল। সুতরাং পুরাতত্ত্বে, ধর্ম্ম সমাজ নীতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে, ভাষাবিজ্ঞানে ইহার আলোচনার যে একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে, তাহা বলিবার সময় আসে নাই। ইহা ছাড়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও চিন্তা-কর্ম্মের মূলকথা বুঝিতে হইলে সংস্কৃতের চাবি-কাটিই যে একমাত্র অবলম্বন, তাহা সে-যুগে কেন, এ-যুগেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় নাই। সেই জন্য, আমাদের বিদ্যাশিক্ষার প্রণালীতে যে ন্যায্য স্থান সংস্কৃতের অধিকার করা উচিত ছিল, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; এবং এখনও পর্য্যন্ত আমরা সেই অকৃতকার্য্যের জের টানিয়া আসিতেছি। নূতন বিদ্যার উদ্দীপনায় প্রাচীন বিদ্যার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই, এবং ইহার

ফলে, আমাদের সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজাতীয় হইয়া উঠিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিল।

মেকলে শুধু বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ নহেন, সাহিত্যিকও ছিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে যে দেশের ভবিষ্যৎ জীবন ও চিন্তাধারার তিনি ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিলেন, সে দেশ ও তাহার সাহিত্যের সহিত যথার্থ সংযোগ-স্থাপনের সময়, সুবিধা বা ধৈর্য্য তাঁহার ছিল না। ইংরেজী-শিক্ষার জন্য তৎকালীন দাবির গুরুত্ব ও অপরিহার্য্যতা তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী ডিক্রি নিষ্পত্তি করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; কিন্তু প্রাচ্য দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবৃত্তি বা সম্ভাব্যতার কথা ভাবিবার অবসর বা যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ফলে এরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু দুইটি বিরুদ্ধ প্রবাহের আকস্মিক সংঘর্ষে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিবে, তাহা তিনি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সেই ধাক্কা সামলাইতে আমাদের এক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। কারণ, ইহা কেবল রাষ্ট্রীয় সমস্যা ছিল না, ইহার দ্বারা সমাজের গভীরতম চেতনা ও ব্যক্তির অন্তরতম অনুভূতি উৎক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সকল আলোড়ন-বিলোড়ন শান্ত হইবার পরও, আজ পর্য্যন্ত, আমাদের শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ যে আমরা নিশ্চিন্তরূপে স্থির করিয়া দৃঢ় ভিত্তির আশ্বাস পাইয়াছি, তাহাও বলা যায় না।

সেই জন্য, আমাদের গত যুগের শিক্ষাপ্রণালী জাতির জীবনের সহিত সম্পর্ক-বিচ্যুত হইয়াছিল, এবং সেই সম্পর্ক-বিচ্ছেদের ক্ষতি আজ পর্য্যন্ত সংশোধিত হয় নাই। সেই যুগে বিজাতীয় বিদ্যার উপর সীমাহীন নির্ভরতা ছিল, কিন্তু ইহা যে আমাদের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতিকে জাতীয় জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, এ কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত হইতে বসিয়াছিলাম; কারণ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহা জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সহিত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সংস্কৃতশিক্ষা যে একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষার সমুচিত সামঞ্জস্যবিধান তৎকালীন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদের মনোবৃত্তি বৈদেশিক শিক্ষায় আমূল পরিবর্ত্তিত করিবার যে আপাত-মনোহর কৌশল মেকলে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার পরিপোষক ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ। ইহার পাঠ্যতালিকায় প্রথমে

সংস্কৃত বা প্রাদেশিক ভাষার নামগন্ধও ছিল না। সংস্কৃত কলেজ বা মাদ্রাসা উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই সত্য, কিন্তু এই সকল বিদ্যায়তন কোনও মতে রক্ষিত হইয়াছিল, শুধু পুরাতত্ত্বের গবেষণার জন্য অথবা একশ্রেণীর 'সেকেলে' ব্যক্তিদের জন্য, যাহাদের রুচি ও মনোভাব নাকি অদ্ভুত ও অসম্ভব। কিন্তু সে-যুগে কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই, এ-যুগেও আমাদের তাহা ভাবিবার অবসর নাই যে, যতই অবজ্ঞাত হউক না কেন, জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মগ্নভিত্তিমূল জাতির জীবন ও চিন্তার বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাকে বাদ দিয়া বা অবহেলা করিয়া কোনও জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রচিত হইতে পারে না। হিন্দু কলেজ, নামে হিন্দু হইলেও, ভাবে ও গৌরবে অ-হিন্দু মনোবৃত্তির প্রশ্রয়ের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। এক দিকে নূতন বিদ্যার প্রবল আকর্ষণ, অন্য দিকে পুরাতন বিদ্যার প্রতি বদ্ধমূল অন্ধ বিদ্বেষ, এই দুই অন্তরায়ের মধ্যে পড়িয়া তখনকার দিনে দুইটি বিপরীতগামী সংস্কৃতির সমন্বয় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং অতীতের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ এবং বর্ত্তমানের উপর অগাধ নির্ভরতা সে-যুগের নব্যবঙ্গের চিন্তাধারা ও কর্ম্মজীবনকে, নোঙরছেঁড়া নৌকার মত, বিপথচারী ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল।

ইহার কারণ ছিল হিন্দু কলেজের একতরফা শিক্ষাপদ্ধতি। জাতীয় শিক্ষাকে জাতীয় জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রাচীন বিদ্যা ও সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী, অথবা নূতন বিদ্যা ও সংস্কৃতিকে জাতীয় জীবনের অনুকূল করিয়া, সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করা সে-যুগে সম্ভব হয় নাই; এ-যুগেও যে আমরা তাহা নিশ্চিতভাবে করিতে পারিয়াছি, তাহা বলা যায় না। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার অন্তরালে কোনও সুস্পষ্ট কল্পনা বা আদর্শ ছিল না। সাময়িক ঘটনাপরম্পরায় যে শিক্ষাপ্রণালী এই কলেজে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার মূলে কোনও চিন্তা অথবা আদর্শের সমন্বয় বা সামঞ্জস্যের চেষ্টা ছিল না। জাতীয় সংস্কৃতি বা আত্মধর্ম্মের অনুপ্রেরণা তাহার কারণ নহে; তাহার উদ্দেশ্য ছিল—বিদেশীর অস্ত্রে বিদেশীকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা। যে বৈদেশিক রাজনীতির সাধনাকে আমরা পরবর্ত্তী যুগে স্বদেশী আন্দোলন নাম দিয়াছিলাম, তাহা এই মনোভাবের অনুবৃত্তি মাত্র। গত যুগের এই সম্পূর্ণ বিজাতীয় শিক্ষার পদ্ধতি আমরা আজ পর্য্যন্ত এক শতাব্দী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি; কখনও চিন্তা করিয়া দেখি নাই যে ইহাতে জাতির আত্মচৈতন্যের সাড়া আছে কি না।

পশ্চিমের সঙ্গে হঠাৎ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে যে নূতন ভাষা ও সাহিত্য এ দেশে আসিল, তাহার প্রচণ্ড প্রভাবে বিস্মিত ও সচকিত বাঙ্গালী যুবক নূতনত্বের মোহে আকৃষ্ট ও অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, পুরাতনের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার সময় বা আগ্রহ তাহার ছিল না। আমাদের সনাতন আদর্শ তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের গুরুত্ব অজ্ঞাত ও অগোচর; সুতরাং আত্মধর্ম্মের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে, পরধর্ম্মের প্রত্যক্ষ সত্য যে আমাদের প্রাণমূলে নব চিন্তার আগ্রহ ও নব শক্তির উৎসাহ সঞ্চার করিবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। সে যুগে ইহার প্রয়োজনও ছিল; হয়ত বাহির হইতে এইরূপ একটি প্রেরণা না আসিলে আমরা আমাদের আত্মশক্তির পরিচয়ও পাইতাম না। কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন না করিয়া পরপ্রকৃতিকে কখনও আত্মপ্রকৃতি করা যায় না। পরতত্ত্বকে কল্পনায় বরণ করিয়া, উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, কিন্তু তাহাকে কোনও দিন জীবনযাত্রায় ধারণ করি নাই। যুগসঙ্কটে আত্ম-রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া, জাতিগত ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্ত মনে, শুধু রাষ্ট্রীয় জীবনে নয়, শিক্ষায় ও চিন্তায়, সমাজে ও পরিবারে, শক্তিমান বিজাতির ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবার অভিমান করিয়াছি। ইহাতে নিরাপদ জীবন-যাপনের সুখ ও সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা স্বাধীন সত্যসাধনার শক্তি লাভ করিতে পারি নাই।

কারণ, বিজাতীয় আদর্শের এই সাধনা কখনও সত্য সাধনা হইতে পারে না। সেই জন্য আমাদের শিক্ষায়, কর্ম্মে ও সাহিত্যে জীবন-সত্য বা জাতির মানস-প্রকৃতির প্রেরণা নাই; ইহা সম্পূর্ণ অনুকরণাত্মক ও কৃত্রিম। এই পরমুখাপেক্ষার দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের মূল এত শিথিল করিয়া দিয়াছে যে, এ বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তিও আমরা হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনে ইউরোপের সহিত সম্পর্ক অনিবার্য্য; আমাদের শিক্ষায় ও চিন্তায়, ভাবে ও কর্ম্মে পাশ্চাত্য প্রভাব এড়াইয়া চলা সম্ভব নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। কিন্তু জীবন-যাত্রার সঙ্কটে জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য হইতে মোড় ফিরাইয়া, ক্রমশঃ যে আমরা এতদূরে সরিয়া আসিতেছিলাম, তাহা এতকাল জানিবারও অবসর ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে জাতির আত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে; তখন হইতে এই আত্মধর্ম্মের অবমাননার ফল আমরা বুঝিতে পারিতেছি—শিক্ষার নামে

প্রচারিত বৈদেশিকতার অন্ধ অনুকরণে, সাহিত্যের নামে প্রচারিত আধুনিক আত্মভ্রষ্টতার প্রকট লক্ষণে।

এ কথা বলিতেছি না যে, এখন আমাদের সকলের উচিত পুনরায় প্রাচীন পন্থা ও কন্থা অবলম্বন করিয়া নৈমিষারণ্যে ফিরিয়া যাওয়া, অথবা সহস্র বৎসরের পুরাতন ভাব ও চিন্তায় মগ্ন হইয়া আধুনিক জগৎকে অগ্রাহ্য করা। এরূপ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার চরম চেষ্টা বর্ত্তমান সময়ে হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু এই পদ্ধতির সাফল্য প্রমাণিত হয় নাই। তথাপি এতদূর অগ্রসর না হইয়াও, যে বৈদেশিক প্রণালী আমরা এতদিন নিশ্চিন্তভাবে অনুসরণ করিয়াছি, তাহাকে পুনরায় সংশোধন করিয়া, জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির অনুযায়ী কোনও পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করাই উচিত ও সম্ভব বলিয়া মনে হয়। সমাজে, সাহিত্যে ও চিন্তায় যে বর্দ্ধনশীল উচ্ছৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর প্রকট হইয়া উঠিতেছে, তাহার জন্য আমাদের বর্ত্তমান একদেশদর্শী শিক্ষাপদ্ধতি বহুল পরিমাণে দায়ী। গত শতাব্দীতে বিনা চিন্তায় যে শিক্ষাপ্রণালী আমরা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা আপনার নহে, পরের। আজ পর্য্যন্ত তাহাকে আপনার করিয়া গড়িয়া না তুলিয়া, গতানুগতিকভাবে পরসত্ত্বের উচ্ছিষ্ট কদন্নে আমাদের ভাব-জীবন পরিপুষ্ট করিয়া আসিতেছি। এখন চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে যে, এই শিক্ষাপ্রণালীতে জাতীয় ভাব ও ভাষা কি প্রকারে রক্ষিত হওয়া সম্ভব, প্রাচ্য বিদ্যা সাহিত্য ও চিন্তার কি স্থান হওয়া উচিত। আজকাল বাংলা ভাষার জন্য চারিদিকে একটা উদ্দীপনা দেখা যায়। কিন্তু এই উদ্দীপনার অন্তরালে কি কোনও সুচিন্তিত ধারণা বা আদর্শের আভাস পাওয়া যায়? ইহা যেন, স্বদেশী আন্দোলনের মত, বিদেশী আদর্শানুকরণের ছদ্মবেশ মাত্র না হইয়া উঠে! সকলের চেয়ে মজার কথা এই যে, বাংলা ভাষাকে আমরা অপার উদারতার সহিত উচ্চস্থানে বসাইতে প্রস্তুত, কিন্তু সংস্কৃতের যে প্রাচীন নির্ঝর বাঙ্গালা ভাষাকে কালে-কালে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। ইহা সত্য, বাংলাকে সংস্কৃতের আঁচলে চিরদিন বাঁধিয়া রাখা চলিবে না, কিন্তু এই দুইয়ের চিরাগত সম্পর্কের মূলে রহিয়াছে জাতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। সকল জাতিরই রীতি ও নীতি, আচার ও ব্যবহার, চিন্তা ও কর্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজের স্বভাবগত স্বাতন্ত্র্য আছে; আমাদের সেই স্বাতন্ত্র্য পিতৃপিতামহের বহুযুগার্জ্জিত প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। অথচ, সংস্কৃতশিক্ষা

গত শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত উপেক্ষিত অথবা কোনও মতে অনুমোদিত হইয়া আসিতেছে; বর্ত্তমান বিদ্যাশিক্ষায় ইহার স্থান এখনও সুচিন্তিতভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

ইহার ফলে, সংস্কৃতশিক্ষার যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা সংস্কৃতানুরাগী ভাবুকমাত্রেই অবগত আছেন। এখনও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত-চর্চ্চা চলিতেছে, কিন্তু অনাদর ও অবহেলার মধ্যে যে ইহা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যাহা চলিতেছে তাহা নামমাত্র চলিতেছে; সত্যসত্যই সংস্কৃত-চর্চ্চা আজ নামমাত্রাবশেষ। সাধারণ শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও, গবেষণার ক্ষেত্রে এক শতাব্দীর সংস্কৃত আলোচনা, অন্য দেশের তুলনায় এ দেশে, নিষ্ফল না হইলেও উচ্চ প্রশংসার অধিকারী হয় নাই। ইহা ছাড়া, বিদ্যালয়ে ও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষার যে দুইটি ধারা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা একই অভিপ্রায় সাধন করিলেও, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও আপাতবিরোধী হইয়া সংস্কৃত-চর্চ্চার বহু বিঘ্ন ঘটাইতেছে। এই বিরোধও ভেদসন্ধানী ইংরেজী রাজনীতির অন্যতম ফল। চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে যে প্রাচীন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা এখনও ব্যবহারাতিক্রান্ত নহে। প্রাচীন গ্রন্থের পঠন-পাঠনে প্রাচীন রীতির সাহায্য অপরিহার্য্য। তথাপি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে এখন যে নূতন রীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাও পরিহার্য্য নহে। যদি সংস্কৃতশিক্ষাকে যুগোপযোগী করিতে হয়, তবে তাহাকে যুগধর্ম্মের সহিত অগ্রসর হইবে। ঐতিহাসিক সরণির অনুসরণ করিয়া, নূতন ভাষাবিজ্ঞানের অবলম্বনে, তুলনামূলক সমালোচনার সাহায্যে, আর্য্যবিদ্যানুরাগী আধুনিক মনীষীরা যে নূতন রীতির প্রবর্ত্তন করিয়া নূতন তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাও নিতান্ত তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। আজকাল যে সমস্ত বৈদিক, লৌকিক, প্রাকৃত ও দেশ-ভাষার আলোচনা এবং হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধাদি গ্রন্থের প্রকাশ ইঁহাদের অধ্যবসায়ে সকলের অধিগম্য হইয়াছে, তাহার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা প্রাচীনপন্থী শাস্ত্রপীঠাদিতে নাই বলিলেও চলে। অকারণ বিরাগ, অবিচারপূর্ব্বক বক্রীভাব, অথবা পরিচয়ের অভাবে যে অনিষ্টশঙ্কী অসহিষ্ণুতা, তাহাতে নিজেরই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, জ্ঞানের প্রসার বর্দ্ধিত হয় না। আমাদের দেশে এইরূপ মূলোচ্ছেদী পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষের অভাব নাই। বর্ত্তমান বিদ্যাশিক্ষায় সংস্কৃতের যে অবহেলা, ইহাও তাহার একটি প্রধান কারণ।

প্রচলিত দুইটি ধারার মধ্যে আপাতবিরোধ থাকিলেও, প্রকৃত বিরোধ নাই। এই কৃত্রিম বিরোধ দুই পক্ষেরই পরস্পরকে ভুল বুঝিবার ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উভয়ের মধ্যে বিনিময়াত্মক সহযোগিতা অথবা সাম্য-সংযোগ সাধন না করিলে, উভয়েরই অকল্যাণ; অথচ এই দুইটি ধারাকে সম্মিলিত করিলে সংস্কৃত শিক্ষার শক্তি ও প্রভাব দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে যে বহুসংখ্যক টোল রহিয়াছে, তাহা এখনও সংস্কৃত-চর্চ্চাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে টোলের শিক্ষা যেরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে, উল্লিখিত কারণ ছাড়া অন্য কারণেও, তাহাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আগেকার সেই বিদ্যোৎসাহী সমাজ নাই, গুণী ও মানী পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা কে বুঝিবে? তাহা ছাড়া, কিছুকাল ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট উপাধি-পরীক্ষারূপ একটি অপূর্ব্ব কল নির্ম্মাণ করিয়া সংস্কৃতবিদ্যার মূলে যে কুঠারাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীনকালের পাণ্ডিত্য দেশ হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। তখনকার দিনে গুরুগৃহে বহু বৎসর বাস করিয়া যে একাগ্রতার সহিত শাস্ত্রাদি আয়ত্ত করিতে হইত, এখন তাহার প্রয়োজন নাই, উৎসাহ নাই, ধৈর্য্যও নাই। কারণ, আজকালকার সহজসাধ্য 'তীর্থ'-পরীক্ষা পাশ করিলেও যখন ফল একই—সেই স্কুলে সামান্য বেতনে পণ্ডিতী—তখন লোকে কেন এত আয়াস স্বীকার করিবে? শিক্ষকও করে না, ছাত্রও নয়। ইহা সংস্কৃতমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই ক্ষোভের বিষয়। অভাবগ্রস্ত ও অপরিপুষ্ট প্রাইভেট স্কুলের মত, 'তীর্থ'-উত্তরণ-প্রয়াসীদের জন্য টোলের সংখ্যাও প্রতিদিন বাড়িয়া চলিতেছে; তাহাতে শিক্ষার উন্নতি নহে, অবনতি হইতেছে। যে শক্তি আছে, তাহাকে সঞ্চিত ও সংহত করিতে পারিলেই তাহার বৃদ্ধি হয়, বহুবিস্তারের অপচয়ে লাভ নাই।

বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সমস্ত সমস্যার বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই; কিন্তু এই সকল কথা ভাবিবার এখন সময় আসিয়াছে। জীবন-যুদ্ধে হতবল ও নিরুপায় হইয়া, আমরা জাতি, দেশ ও সমাজের স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, এতদিন কেবল বর্ত্তমানের উপাসনা করিয়াছি, অতীতের বা ভবিষ্যতের দিকে চাহিবার সময় হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য আদর্শের যে সনাতন সত্য আমাদের স্বধর্ম্মকেও একদিন প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকেও বিস্মৃত হইয়াছি। এখন পাশ্চাত্ত্য ভাবকে কেবল পাশ্চাত্ত্য বলিয়া, মোহগ্রস্ত হইয়া, সেই আদর্শের

বিকৃতিকে আধুনিক সত্য মনে করিয়া পরিণামের চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। প্রাচীন আদর্শ ও সংস্কৃতিকে বুঝিবার চেষ্টাও করি নাই; তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করিলেও যথাযোগ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। আমাদের মত আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে ইহা সম্ভব; কিন্তু এই পথ মুক্তির নহে, বিনাশের পথ; বুদ্ধির নহে, অপবুদ্ধির লক্ষণ। কেবল আর্থিক লাভের মানদণ্ডে শিক্ষার পরিমাণ হয় না, এ কথা আমরা বার বার ভুলিয়া যাই; যাহা জাতির নিজস্ব, তাহা সাংসারিক দিক হইতে লাভজনক না হইলেও তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। আপন সত্ত্ব ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পরোপজীবী হইয়া কোনও জাতি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না।

সংস্কৃত ও বাংলা

আজকালকার দিনে একটা কথা উঠিয়াছে, সংস্কৃতকে বর্জন করিলেই নাকি বাংলা ভাষার মুক্তি। এ কথা শুধু অতি-আধুনিক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, শিক্ষাকেন্দ্রেও প্রচারিত হইতেছে। বাংলা শিখিবার ও লিখিবার জন্য নাকি সংস্কৃতের প্রয়োজন নাই। ইহাদের মতে, সংস্কৃতের আঁচলে বাঁধা থাকিলে বাংলা ভাষা নাকি আপনার পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এ পর্য্যন্ত যে সংস্কৃতবহুল সাধুভাষা প্রচারিত হইয়াছে তাহা নাকি নিতান্ত অসাধু, তাহা নাকি পুঁথির ভাষা, পণ্ডিতী ভাষা। যে সংস্কারবর্জ্জিত স্বেচ্ছাচার সংস্কৃতকে বর্জ্জন করিয়া স্বাতন্ত্র্যের আত্মপ্রসাদে প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অবশ্য পুঁথির ধার ধারে না, পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যে বুলিকে বাংলা ভাষা বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, তাহা পুঁথির ভাষা নয় সত্য, সাধু ত নয়ই, তাহা বাঙালীর বাংলা ভাষা কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেবল ব্যাকরণ বা অভিধানের কথা দূরে থাক্, বাংলা ভাষার যাহা সহজ বাক্যরীতি বা idiom, শব্দ ও অর্থের যাহা সার্থক প্রয়োগ, শিষ্ট ও প্রাদেশিক ভাষার যাহা পার্থক্য, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান বা রসবোধ নাই বলিয়াই এরূপ ভাষার ও এরূপ মতবাদের প্রচার সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ভাষার অপব্যবহার সহজ, ভাষার ব্যবহার বহুসাধনাসাপেক্ষ। ভাষার কোন মানদণ্ড নাই, যে যাহা খুশি লিখিতে পারে—এরূপ মতবাদের আশ্রয়ে স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় সুলভ ও বাধাহীন। আর এক শ্রেণীর 'কালচার'-অভিমানী কিন্তু নিতান্ত কালচারহীন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা বাংলা ভাষার নিজস্ব বাণীভঙ্গির অস্তিত্বটুকুও স্বীকার করেন না। সেইজন্য বাংলা ভাষার বা সাহিত্যের বহু সাধনালব্ধ চিরন্তন ধারা সম্বন্ধে কোন খবর রাখিবার বা তাহাকে আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহারা মনে করেন না। শুধু অজ্ঞতা বা আলস্য নয়, এই দায়িত্বহীন মনোভাবের মূলে রহিয়াছে অশ্রদ্ধা ও অহঙ্কার। জাতির যুগান্তর-সঞ্চিত সংস্কৃতির যাহা বৈশিষ্ট্য এবং যে বৈশিষ্ট্য ইহাকে অমর করিয়া রাখে, তাহারই দৃঢ়ভিত্তিমূলের উপর জাতির ভাষা প্রতিষ্ঠিত।

ভাষার সেই সনাতন রূপটি বুঝিবার বা আয়ত্ত করিবার জন্য শুধু সাধনার একাগ্রতা নয়, শ্রদ্ধার শালীনতারও প্রয়োজন। এ কথা সত্য, লেখকবিশেষের ভাষার রীতি ব্যক্তিগত বলিয়া তাহা তাহার বিশিষ্ট পরিকল্পনা বা অন্তর্গত ভাবপ্রবাহের দ্বারা প্রেরিত হয়। কিন্তু ভাষার সাধারণ ভাবপ্রকাশের যে পদ্ধতি, তাহার গুপ্তমূল কেবল ব্যক্তির মনোভূমিতে নয়, দেশের রসচেতনার মধ্যেও বিস্তৃত। কারণ, প্রত্যেক ভাষারই একটি সনাতন বা সার্ব্বজনীন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহাকে ইংরেজি ভাষায় ইহার genius বা ভাবপ্রকৃতি বলে। ভাষার এই প্রকৃতির নিখুঁত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা কঠিন, কারণ ইহা যুগে-যুগে বহু মনীষীর সাধনালব্ধ বৈচিত্র্যের দ্বারা পরিপুষ্ট; কিন্তু ইহার মগ্নভিত্তিমূল জাতির আত্মচৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত,—তাহার স্বকীয় চিন্তার ধারা, রীতি-নীতি, রাগ-বিরাগ, ভাব-কল্পনার উপর।

এখানে আমরা ব্যাকরণ অভিধান বা অলঙ্কার সম্মত শব্দবিন্যাসের কথা বলিতেছি না; প্রত্যেক ভাষার এমন একটি নিজস্ব স্বভাব আছে, যাহা তাহার ভাবাভিব্যক্তির স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি। বাংলা ভাষারও এরূপ একটি বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম্ম আছে, যাহাতে শুধু ব্যক্তিগত ভাবনা নয়, সমষ্টিগত প্রাণের চেতনাও নিজস্ব রূপ ধারণ করে। সেইজন্য ভাষার বিকৃতি জাতির আত্ম-ভ্রষ্টতার লক্ষণ। আদর্শ যে যুগে যেমন হউক, রচনা শ্লীল বা অশ্লীল হউক, ভাব ও চিন্তা যতই অভিনব হউক, তাহা যদি জাতির আত্মস্থ হইয়া থাকে, তবে ভাষাই তাহার প্রমাণ। সুতরাং ভাষার বৈশিষ্ট্য যদি সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তবে তাহার উৎকর্ষের দাবি কোথায়?

সংস্কৃতের সহিত বাংলার স্বভাবধর্ম্মের এই যে বিশিষ্ট ও নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে তাহা ইহার ইতিহাসগত। উপেক্ষা করিলে কেবল ইহার অঙ্গহানি নয়, ইহার প্রকৃতির অমর্য্যাদা করা হয়। এখানে 'সাধু' বা 'কথ্য' ভাষার প্রশ্ন অবান্তর। যাহা বাংলার প্রকৃত ভাষা, তাহা সাধুও নয়, কথ্যও নয়, তাহাই ইহার একমাত্র সুস্থ সহজ ও প্রাণবান ভাষা,—ইহার স্বভাবধর্ম্মের ও ঐতিহাসিক পরিণতির স্বাভাবিক বিকাশ। সাধুভাষাকে অসাধু অপবাদ দিবার প্রধান কারণ এই যে, ইহা সংস্কৃতবহুল,—সংস্কৃতের নাম উচ্চারণও নাকি পাপ! এখন যে ভাষা সপ্তভূমিষ্ট হইয়াছে, তাহা নাকি সংস্কৃতবর্জ্জিত বলিয়াই উৎকৃষ্ট। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না, সংস্কৃত ও প্রাকৃত, বাংলা ভাষার এই দ্বিবিধ রূপ, যাহা দুই হইয়াও এক, তাহা আকস্মিক নয়, ব্যক্তি

বিশেষের যদৃচ্ছারোপিত নয়, তাহা ইহার স্বাভাবিক বিকাশধর্ম্মের বিবর্ত্তন। বাংলা ভাষার জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত যে প্রকৃতি মজ্জাগত হইয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহাতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই আপাতবিরোধী ভঙ্গির সর্ব্বতোমুখী সমন্বয় ঘটিয়াছে; এবং বাংলা ভাষা একাধারে গাম্ভীর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, সংযম ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপন প্রাণধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ভাষার যে ক্রমবিকাশ, তাহা এই অপূর্ব্ব সমন্বয়েরই ইতিহাস। পণ্ডিতী ও আলালী, এই দুই প্রতিকূল ভঙ্গির বিক্ষোভে বাংলা ভাষা অবশেষে যে পরিপূর্ণ প্রবাহরূপ ধারণ করিল, তাহাতে সে আত্মস্থ হইয়া আপন শক্তির পরিচয় পাইল। তাহা শুধু সংস্কৃতের শাসনে হয় নাই, প্রাকৃতের শাসনেও নয়। বাংলা ভাষার অন্তর্গত উভয় প্রকৃতি গতিমান ও প্রাণবান হইয়া বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি প্রতিভাশালী লেখকের প্রেরণায় একটি পরিণত ভাষার পূর্ণশ্রী লাভ করিল। সে ভাষা সাধু হউক বা অসাধু হউক, তাহাই আমাদের ভাবের ভাষা, সৌন্দর্য্যের ভাষা, যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা,—সর্ব্ববিষয়ের ও সর্ব্বসাধারণের সাহিত্যিক ভাষা।

সুতরাং যাঁহারা বাংলা ভাষার দ্বৈতভাবের কল্পনা করিয়া 'সাধু' ও 'কথ্য' এই দুই পৃথক ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডির আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহারা বাংলা ভাষার এই অদ্বৈত স্বরূপের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলিবেন, বাংলা ভাষার উদ্ভব প্রাকৃত হইতে; সুতরাং প্রাকৃত ভঙ্গি হইতেছে ইহার জন্মগত বৈশিষ্ট্য। ইহা সত্য; কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্ ইহাও স্বীকার করিবেন, সংস্কৃতের আদি-নির্ঝর ইহাকে যুগে যুগে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধনশীল করিয়া আসিতেছে। ইহার প্রাকৃত-প্রকৃতি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া সংস্কৃতের সমৃদ্ধতর ভঙ্গি ও বিশালতর বৈভব ইহাকে যে সৌন্দর্য্য ও শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহাই ইহার যুগ্মমিলনের ক্রমবিকাশলব্ধ অযুগ্ম মূর্ত্তি। ইহা সম্ভব হইয়াছে কারণ, প্রাকৃতধর্ম্মী হইলেও বাংলা সংস্কৃতের সহিত সম্পর্ক বিহীন নয়, বরং ইহার স্বজাতি ও সগোত্র। যে রস-চেতনার উপর বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংস্কৃতের মধ্য দিয়াই যুগযুগান্তর প্রবাহিত হইয়াছে। মোহিতলাল মজুমদার ঠিকই বলিয়াছেন—প্রাকৃতের গুপীযন্ত্রে বাংলার বাউল-মন নৃত্য করিতে পারে এবং প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখে সহজের মায়া সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সংস্কৃতের সপ্তস্বরার কাজ চলিতে পারে না।

এই সপ্তস্বরার ধ্বনি-বৈচিত্র্য, গতি-গৌরব ও ব্যঞ্জনা-মাধুর্য্য আছে বলিয়াই আজ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সরস্বতী 'মেঘদূত' 'উর্ব্বশী' 'সাজাহান' প্রভৃতির ভাষায় ও ছন্দে যে বিপুল বিচিত্র স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে পারে তাহা কেবল প্রাকৃতধর্মী ভাষা-ভারতীর অগোচর।

ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা ভাষার যাঁহারা আদিস্রষ্টা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে সংস্কৃতকে বাদ দিয়া বাংলা গঠিত হইতে পারে না। সেইজন্য সংস্কৃতের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে তাঁহারা সম্পদ-গ্রহণে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রথম যুগের অতিরিক্ত উৎসাহে কখনও কখনও সংস্কৃতের আতিশয্য হইয়াছে এবং অস্বাভাবিক শব্দাড়ম্বরের পীড়নে ভাষা তাহার সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব হারাইয়াছে। কিন্তু তখনও ভাষার গতি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; সকলেই বিভিন্ন উপায়ে আপন আপন গন্তব্য পথ খুঁজিতে ছিলেন। অনিশ্চয়ের যুগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অনাচার নহে, তাহা প্রথম চেষ্টার ব্যর্থতা বা অসম্পূর্ণতা। পণ্ডিতী ভাষা এই অপবাদের মূলে পণ্ডিতদের অত্যাচারের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার কারণ ছিল অক্ষমতা বা অজ্ঞতা, সাহিত্যজ্ঞানের অভাব বা পণ্ডিত-মূর্খতা। সংস্কৃতের নিগড়, শৃঙ্খল বা বেড়াজালের কথা আজকালকার আন্দোলনে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সংস্কৃত তখনই নিগড়, শৃঙ্খল বা বেড়াজাল হয়, যখন সংস্কৃত কেবল সংস্কৃত হিসাবে প্রযুক্ত হয়, সাহিত্য হিসাবে নয়। ইহা সংস্কৃতের ব্যবহার নয়, অপব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের

> যাও তুমি তমসার তীরে
> বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত-ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে
> বারেক শুধায়ে এসো।

অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের

> এই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা চীনাম্বরা তরলিতরত্নহারা পীবরযৌবনভারাবতদেহা…এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?

প্রভৃতি বাক্যের গঠনে সংস্কৃতের আতিশয্য রহিয়াছে, কিন্তু অপব্যবহার নাই। যেখানে প্রয়োগ শিল্পসঙ্গত নয়, অথবা রসজ্ঞানের মাত্রা ছাড়াইয়া

যায়, সেখানে সংস্কৃত কেন, প্রাকৃত ভঙ্গিও পীড়াদায়ক। যেমন দেখতে পাই অতি-আধুনিক কবিতার নমুনায়:

আর এই পৃথিবী ঠুকরে খাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড,
বাড়িয়ে দিচ্ছে স্যাৎসেতে সাঁড়াশির মত তার অসংখ্য শুঁড়,
আমাকে ধরতে আমাকে জাপটে ধরতে;
ছিঁড়ে টেনে আনতে চাইছে আমার মাংস—
আমার মাংস মোমের মত গলে যাচ্ছে
কষ্টে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সামঞ্জস্যমূলক পদ্ধতি যে বিরোধী বা অসঙ্গত নয়, গতযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভাষা যদি বাঙ্গালী খুঁজিয়া না পাইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের বাংলা সাহিত্যে যে সৌষ্ঠব, প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য দেখিতে পাই, তাহা সম্ভব হইত না; বাংলা ভাষা আদিম প্রাকৃত গ্রাম্যতাতেই পর্য্যবসিত হইত। প্রাকৃতের কাঠামো বজায় রাখিয়া, সংস্কৃতের শ্রী, শক্তি ও সম্পদ আহরণ করিয়া, এই নূতন ভাষার সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল ও সর্ব্বতোমুখী করিয়াছে—যাহা প্রাকৃত ভঙ্গির নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সম্ভব হইতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে বাংলা ভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায় তাহার সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য্য আসিয়াছে সংস্কৃত হইতে—ইহার প্রায় বারো আনাই সংস্কৃত। সংস্কৃতের আশ্রয় বাংলার পক্ষে শুধু অপরিহার্য্য নয়, ইহা সহজ, উপযোগী ও কল্যাণপ্রদ। বাংলা ছন্দের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য ও প্রাকৃত বাংলায় তাহার কার্পণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ধ্বনিগত পার্থক্য ছাড়া, প্রাকৃত বাংলার মজ্জাগত শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতা, ইহার লঘু শব্দবিন্যাস, কেবল ওজস্বিতার নয়, রচনার সুষমা ও সামর্থ্যের অন্তরায়। প্রাকৃত বাংলার প্রয়োজন ছিল আভিজাত্যের সংযম ও সংহতি, যাহার দ্বারা ঈপ্সিত রসের গাঢ়তায় সৌন্দর্য্যের যতিভঙ্গ না হয়। শুধু শব্দাড়ম্বর, বৈদগ্ধ্য বা অলঙ্কৃতির জন্য নয়, ইহার দীপ্ত পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তির জন্য, ভাষার মেরুদণ্ডের জন্য, শব্দ-সম্পদের নিটোল পরিপূর্ণতা ও রস-সংবাদী ধ্বনিসৌষ্ঠবের প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ভাষায় সেই চেষ্টা রহিয়াছে বলিয়া তাহা সার্থক হইয়াছে:

কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট ; কোথা রহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপাদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা।

এখানে কালিদাসের মূল শব্দগুলি অতিনিপুণতার সহিত ছত্রে ছত্রে গ্রথিত হইয়া এই কবিতার চিত্রগুলিতে অতি বিচিত্র করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ, যেমন—

মহাম্বুধি যেই মত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দ্দিকে অন্তহীন নৃত্য-গীতে ঘিরে,
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে,
গাবে যুগযুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে
দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্য্যাদা করি' দান।

ইহা কোথাও অসঙ্গত বা মাত্রাধিক হয় নাই। এই পংক্তিগুলির মধ্যে অনর্থক শব্দের ঘটা নাই ; অথচ ইহার যে সংযত গতি, ভাবসংহত শব্দযোজনার পরিচ্ছন্নতা, ধ্বনি-বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য্য, তাহা নিছক প্রাকৃত বাংলায় পরিস্ফুট হইত না। শব্দ-অর্থের এই যে পরস্পরসাপেক্ষ গাঢ়তা, সামঞ্জস্য ও শুচিতাবোধ, তাহা নিছক দেহ-সৌন্দর্য্যের বর্ণনার মধ্যেও কিরূপ সংযত সুষমা লাভ করিতে পারে রবীন্দ্রনাথ হইতে তাহার একটি উদাহরণ এই সূত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী ;
মুক্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি' গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে ; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন-রৌদ্র—ললাটে অধরে

উরু'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি' তার চারি পাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তার,—সেবকের মত
সিক্ত তনু মুছে নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে,—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া,—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া।

ইহার সহিত অতি-আধুনিক তথাকথিত সাহিত্যের লালসাময় প্রেমের কবিতার তুলনা করিতে সঙ্কোচবোধ হয়, কিন্তু ভাষার শৈথিল্যে তাহা কত কদর্য্য হইতে পারে তাহা না দেখাইলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। একটি অতি-আধুনিক চুম্বন-রাক্ষস কবি, রসিকতা করিয়া নয়, আবেগের সহিত বলিতেছেন—

এবার আমাকে চুমু খেতে দাও,
অনেকক্ষণ ধরে খেতে দাও, অনেক করে খেতে দাও!
তোমার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে গালের ওপর
ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁটের ওপর
আমার অধরের শাণিত আঘাত
তোমার গালের ওপর চিহ্নিত হোক্ লাল হয়ে,
পাপড়ির মত ঠোঁট ঝরে পড়ুক ওই আঘাতে,
অফুরন্ত চুম্বনে প্রাণ ফুরিয়ে আসে
আমি চুপসে যাই ফাটা ফানুসের মত!

এই যে ভাষা ও ভঙ্গি ইহাই নাকি অতি-আধুনিক সময়ের নিছক বাংলা। কিন্তু সংস্কৃতানুযায়ী ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য্য ও শব্দ-সম্পদ বর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া ইহা যে অহঙ্কার করে, তাহা ইহার নূতন রীতিকে গ্রাম্যতার স্তরে টানিয়া আনিয়া কুৎসিত ও হাস্যাস্পদ করিয়াছে।

সুতরাং সংস্কৃতের রস-চেতনা যে মনন-ধারায় স্পন্দিত, বাংলাকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে, তাহাকে তাহার পরম্পরাগত ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। শব্দ ত কেবল অভিধানগত নির্দ্দিষ্ট অর্থের প্রতীক নয়; প্রাচীন সাহিত্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে শব্দগুলি যে রসমণ্ডলী লাভ করিয়াছে, তাহাই তাহার ভাবব্যঞ্জনা ও রসোদ্বোধনশক্তির নিগূঢ় উৎস। সংস্কৃতের এই শব্দসম্পদ আজ বাংলার চিরন্তন সম্পদ হইয়া তাহাকে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গীণ সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগী করিয়াছে। শুধু সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ বা অনুকরণ নয়, সংস্কৃতের শুচি সংযত ও ধ্বনি-বিচিত্র ভঙ্গিকে বাংলার প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া, তাহাকে আত্মসাৎ করিতে না পারিলে বাংলা ভাষার বর্ত্তমান পরিণতি সম্ভব হইত না।

যদিও রবীন্দ্রনাথ এই ভাষাতেই তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তথাপি প্রাকৃত বাংলার তরফ হইতেও তিনি যথেষ্ট ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ওকালতি ও তাঁহার কাব্য-রীতির মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার নূতন খেয়ালের নিষ্ফলতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ইহা সত্য, তিনি তাঁহার 'ক্ষণিকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে প্রাকৃত বাংলাকেই অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে ভাষা ও ভঙ্গিকে শিল্পসঙ্গত রূপ দিয়াছেন। এরূপ প্রাকৃত বাংলা যে বিশেষ ধরণের ভাবপ্রকাশের উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই; এ কথা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মন এরূপ ভাষা ও ভঙ্গিকে সকল প্রকার ভাবপ্রকাশের জন্য পর্য্যাপ্ত মনে করে নাই। তবুও যিনি একদিন রুদ্র বৈশাখের 'ধূলায় ধূসর রুক্ষ পিঙ্গল জটাজাল'-এর বর্ণনা করিয়াছেন, তিনিও যখন বৈশাখের অতি-আধুনিক চিত্র আঁকেন—

সমস্ত আকাশটা ঢেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ,
তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে—

এবং তাঁহার অন্ধ ভক্তেরা যখন ইহারও তারিফ করেন, তখন মনে হয়, বাংলা ভাষা-সরস্বতীর 'উবুড়' হইয়া পড়িবার আর বেশি দেরী নাই!

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

জয়দেবের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই কিংবদন্তীমূলক। সমস্ত কিংবদন্তীর যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে তাহা মনে হয় না; কিন্তু এই গল্পগুলির একটি উপকারিতা আছে। ইহাদের আড়ালে জয়দেবের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তথ্যমাত্রদর্শী ঐতিহাসিকের গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে পরবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাকে ও তাঁহার কাব্যকে কিরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এ সকল কাহিনী ছাড়িয়া দিলে, কবির কাব্যই তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কাব্য হইতে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের কথা বেশি কিছু জানা যায় না। যে শেষ শ্লোকে কবি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা আবার সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না। রাণা কুম্ভের রসিকপ্রিয়া টীকাতে ইহার ব্যাখ্যা নাই; কিন্তু প্রাচীন কাশ্মীরী ও নেপালী পুঁথিতে এই শ্লোকটি রহিয়াছে। এই শ্লোক হইতে জানা যায়, কবির পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী (পাঠান্তরে রামাদেবী বা রাধাদেবী), এবং পরাশর প্রভৃতি প্রিয়বন্ধুর প্রীত্যর্থে গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল। প্রথম সর্গের 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী' এবং দশম সর্গের 'জয়তি পদ্মাবতীরমণ-জয়দেব-কবি-ভারতী-ভণিতমতিশাতম্'—এই দুই পদ হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, জয়দেবের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী। শঙ্কর তাঁহার টীকায় উভয়ত্র এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। প্রাচীন টীকাকার ধৃতিদাস লিখিয়াছেন—'পদ্মাবতী নাম জয়দেবস্য ভার্যা'। যদিও পূজারী গোস্বামীর টীকায় প্রথম-উদ্ধৃত পদের এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় নাই, তথাপি দ্বিতীয় পদটির ব্যাখ্যায় তিনি 'তথানাম্নী জয়দেবপত্নী' এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু মুম্বই নির্ণয়সাগর যন্ত্রের সংস্করণে উপরোক্ত দ্বিতীয় পদটির ভিন্ন পাঠ ধরা হইয়াছে, তাহাতে পদ্মাবতীর নামোল্লেখমাত্র নাই; যথা—'জয়তি জয়দেব-কবি-ভারতী-ভূষিতম্' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, রাণা কুম্ভের রসিকপ্রিয়া টীকায় 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী' পদটির উল্লিখিত ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, পদ্মাবতী শব্দের দ্বারা এখানে কেবল পদ্মহস্তা দেবী লক্ষ্মীর নির্দ্দেশ বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে

এইরূপ মতভেদ থাকিলেও, যে ঐতিহ্য লইয়া পদ্মাবতী জয়দেব-পত্নীর নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা এত সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে ইহা নিতান্ত অমূলক নয় বলিয়াই মনে হয়।' কেন্দুবিল্ব যে কবির জন্মস্থান তাহা তৃতীয় সর্গের একটি পদ হইতে অনুমিত হয়। এই কেন্দুবিল্ব বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয় নদীর তীরবর্ত্তী কেঁদুলি গ্রাম এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে; এবং এখনও এই গ্রামে জয়দেবের উদ্দেশে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে উৎসব হইয়া থাকে।' যে পদটিতে কেন্দুবিল্বের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে জয়দেবকে বলা হইয়াছে 'কেন্দুবিল্ব-সমুদ্রোদ্ভব-রোহিণীরমণ' অর্থাৎ 'কেন্দুবিল্বরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত চন্দ্র'। কিন্তু সাধারণভাবে চন্দ্র-অর্থে প্রযুক্ত রোহিণীরমণ এই শব্দের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকার দেখিয়াছেন—জয়দেবের রোহিণী নাম্নী সহজ-সাধিকার ইঙ্গিত!

• গীতগোবিন্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের নামকীর্ত্তন নাই, কিন্তু জয়দেব তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।• তৎকালীন কবিদের উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

উমাপতি-ধর ধরে বাক্যের প্রপঞ্চ পল্লবি';
দুরূহ পদের দ্রুত রচনায় শ্লাঘ্য শরণ কবি;
ধোয়ী কবিরাজ শ্রুতিধর; কে আচার্য্য গোবর্দ্ধনে
স্পর্দ্ধিতে পারে পরিমিত সাধু শৃঙ্গার-বর্ণনে!

একমাত্র স্বয়ং জয়দেব জানেন সন্দর্ভশুদ্ধ বাক্য-রচনা!' এই সকল কবিদের ও জয়দেবের রচনা হইতে লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক শ্রীধর দাস তাঁহার সদুক্তি-কর্ণামৃত নামক সুভাষিতসংগ্রহে (খ্রীঃ অঃ ১২০৬) বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয়, জয়দেবেরও আবির্ভাব-কাল হইতেছে লক্ষ্মণ সেনের সমকাল —খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের উত্তরার্দ্ধে। ইহা উল্লেখযোগ্য, গুজরাতের শার্ঙ্গদেব বাঘেলার সময়ে (সংবৎ ১৩৪৮—খ্রীঃ অঃ ১২৯২) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জয়দেবের দশাবতার-স্তুতি শ্লোক (বেদানুদ্ধরতে ১।১৬) মঙ্গলশ্লোকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কয়েকটি তথ্য ভিন্ন জয়দেবের আর কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় না। •

বাংলা দেশ বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ব্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। গুপ্ত সম্রাটদের আমল হইতে চতুর্ভুজ চক্রধারী বিষ্ণুর উপাসনার প্রমাণ আছে সত্য, কিন্তু কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণ উপাসনার নিদর্শন নাই।

পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা হইতেও রাধাকৃষ্ণের উপাসনা কতদিন হইতে বা কত বিস্তৃতভাবে এ দেশে প্রচলিত ছিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ভোজদেবের বেলাবলিপিতে 'মহাভারত-সূত্রধার' ও 'গোপীশত-কেলিকার' কৃষ্ণের কথা আছে; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বেলাবলিপি খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ 'অংশকৃতাবতার',—ভাগবতোক্ত বা চৈতন্যসম্প্রদায়-নির্দ্দিষ্ট স্বয়ং ভগবান্ নহেন। প্রায় এই সময়েই জয়দেবের গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা স্পষ্টরূপে কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে, এবং কবি এখানে দশাবতারী শ্রীকৃষ্ণের ('দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়') নমস্কার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত রাধাপ্রসঙ্গ-বর্জ্জিত কৃষ্ণগোপীলীলা জয়দেবের উপজীব্য নয়; বরং গোপীদের কথা থাকিলেও রাধাই এখানে মূলাধার।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শৃঙ্গাররসবহুল রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসই জয়দেবের কবিকল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। গীত-গোবিন্দের

> আকাশ মেদুর মেঘে, তমালের দ্রুমে শ্যাম বনভূমি,
> রাত্রি এখন, ভীরু এরে রাধে, গৃহে লয়ে যাও তুমি,—
> নন্দের এই আদেশে চলিত আঁধারকুঞ্জনীড়ে
> রাধামাধবের নির্জ্জন কেলি জয়তু যমুনাতীরে!

এই প্রথম শ্লোকে বর্ণিত প্রসঙ্গটির নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু ইহার উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রাচীনতর পুরাণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বরং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। জয়দেবের কাব্যে বসন্তকালীন রাসের বর্ণনা রহিয়াছে; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের রাস শরৎকালীন। গোপীলীলার কথা আছে, কিন্তু শ্রীরাধার স্পষ্ট উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মত, জয়দেবের কাব্যে শ্রীরাধাকে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সকল বিলাসলীলার কেন্দ্ররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার কৃষ্ণরাধার নিয়মিত বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়া পরকীয়াবাদের সমর্থন করেন নাই; গীতগোবিন্দ আলোচনা করিলেও "পরকীয়াভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধি হয় না"—এ কথা গীতগোবিন্দের সুযোগ্য সম্পাদক বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায়ও স্বীকার করিয়াছেন। ভগবদুপাসনার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দুইটি দিকই গীতগোবিন্দে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সমানভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই সকল নিদর্শন হইতে মনে হয়, জয়দেবের সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত বৈষ্ণব ভক্তির ধারা বাংলা দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; খুব সম্ভব, ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারের মত, জয়দেব অন্য একটি বিভিন্ন ধারার অনুগামী। কিন্তু রামানুজী বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতবাদের কোন পরিচয় জয়দেবের কাব্যে পাওয়া যায় না; বরং গীতগোবিন্দে যে বৈষ্ণবভাবের উপলব্ধি হয় তাহা কোন সম্প্রদায়-সংশ্লিষ্ট নয় বলিয়াই মনে হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়-চতুষ্টয় শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, জয়দেব তাহা স্পষ্টতঃ করেন নাই। এমন কি, ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, তিনি মধুররস-সমুজ্জ্বল কৃষ্ণলীলা-বর্ণনায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐক্য থাকিলেও পার্থক্য রহিয়াছে। গীতগোবিন্দে শ্রীরাধাকে উজ্জ্বলরসের নায়িকারূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে। কবি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের ও প্রতিসর্গের নামকরণে গোবিন্দের নামই কীর্ত্তিত হইয়াছে, রাধার নয়; প্রথম দুইটি বন্দনাস্তোত্রে রাধার নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েরই সমান প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং এই পুরাণে ও গীতগোবিন্দে বৃন্দাবনবিলাসের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও, এমন কোন প্রমাণ নাই যে জয়দেব ইহা হইতে সাক্ষাৎভাবে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ বৈসাদৃশ্যেরও অভাব নাই। এমন হইতে পারে, উভয় গ্রন্থই এক অধুনালুপ্ত মূল অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন বিষয়ে আপাতসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্কের অনুগামী বৈষ্ণবগণও রাগমূলক উপাসনা-পদ্ধতি স্বীকার করেন; এবং ইহাদের উপাসনা-তত্ত্বে রাধারও স্থান রহিয়াছে। নিম্বার্কের আবির্ভাব-কাল ঠিক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু তিনি জয়দেবের প্রায় সমসাময়িক এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে জয়দেবের পূর্ব্বে বাংলা দেশে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রভাবও স্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক, বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণের রসোপাসনা কি প্রভাবে বা কাহার দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ তদানীন্তন বৈষ্ণব

ধর্ম্মের ইতিহাসের সুস্পষ্ট পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। যতটুকু জানা যায়, তাহা হইতে এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, জয়দেব, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার ও নিম্বার্ক এই তিনজনই আপন-আপন অনুভবের দ্বারা কোন অধুনালুপ্ত বৈষ্ণবভাবের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। এই ধারা বোধ হয় পরবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবর্ত্তিত ধারা হইতে স্বতন্ত্র; এবং ইঁহাদিগকে পরস্পরের নিকট ঋণী বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনও প্রমাণ নাই। ইহা আরও সম্ভব, জয়দেবের কবিকল্পনার উপর কোন প্রকার সহজিয়া মতবাদেরও প্রভাব ছিল, কারণ বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জয়দেবকে আপনাদের আদিগুরু ও নব রসিকের একজন রসিক বলিয়া গণনা করেন। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের মধ্যেও এইরূপ সহজভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব্ব সহজিয়া মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এত অল্প যে এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

তবে ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, বাংলা দেশে চৈতন্য-সম্প্রদায়ই শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত ভক্তিবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ইহাদের প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, এবং নিম্বার্ক বা সহজিয়া মতবাদের প্রভাবও ইহাদের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, জয়দেবের কাব্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ না করিয়াও কিরূপে চৈতন্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাহাদের অন্যতম ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে, জয়দেব মুখ্যতঃ কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার কাব্যগ্রন্থে এরূপ একটি ভাব আছে যাহা সম্প্রদায়-বিশেষেরও গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল। জয়দেব হয়ত ভক্ত ছিলেন; কিন্তু কেবল ভক্তি নয়, কবিকল্পনা তাঁহার প্রেরণার মূলে ছিল বলিয়া কাব্যগ্রন্থ রচনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই কাব্য নির্ব্বিশেষ রসপদবীতে অরোহণ করিয়া সকল বিশিষ্ট মতবাদের উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে; এবং এই অসাম্প্রদায়িক নির্ব্বিশেষ ভাব ছিল বলিয়াই ইহাকে অঙ্গীকার করিতে কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অসুবিধা হয় নাই।* উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কেবল চৈতন্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নয়, বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃকও গীতগোবিন্দ গৃহীত হইয়াছে; এবং তৎসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র বিঠ্ঠলেশ্বর গীতগোবিন্দের সাক্ষাৎ অনুকরণে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক 'শৃঙ্গাররসমণ্ডন' (মুম্বই, সংবৎ ১৯৭৫) নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং, চৈতন্য-সম্প্রদায়

যে গীতগোবিন্দকে "শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য" বলিয়া গ্রহণ করিবেন তাহা বিচিত্র নয়। গীতগোবিন্দের এরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ইতিহাসসম্মত না হইলেও সহজসাধ্য। জয়দেবের ভাবমূলক পদাবলীগুলিকে, ভক্তিশাস্ত্র-বর্ণিত উজ্জ্বল রসের উৎকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে ভক্তিরসশাস্ত্রের কবি করিয়া তোলা কিছুই কঠিন ছিল না। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, জয়দেবের অন্ততঃ তিন শত বৎসর পরে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তৎসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত রসশাস্ত্র বৃন্দাবনগোস্বামীগণ কর্ত্তৃক আরও পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং গোস্বামীমতের প্রচার জয়দেবের এত পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল যে তাঁহাকে গোস্বামীমতের বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কবি হিসাবে বৃন্দাবন-লীলার মাধুর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ ও বিভোর করিয়াছিল; কিন্তু তিনি রূপ গোস্বামীর মত রসশাস্ত্রের উদাহরণস্বরূপ অথবা সেই শাস্ত্রের আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে শুধু ইতিহাসের অপলাপ নয়, তাঁহার কবি-প্রতিভারও অসম্মান করা হয়। ইহা সত্য, জয়দেব হরিগুণগানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বিলাস-কলা-কুতূহলের কথাও বলিয়াছেন। জয়দেব যে রসিক ভক্ত ছিলেন তাহা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট; কিন্তু তিনি তত্ত্বান্বেষী ছিলেন না। তাঁহার কল্পনা-প্রবৃত্তির স্বরূপ ছিল মুখ্যতঃ কবিধর্ম্মী।

সুতরাং গীতগোবিন্দের কবি মধুর রস বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়াই যে সাম্প্রদায়িক রসশাস্ত্রের নিয়মে তাঁহার কাব্যের মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইবে তাহা ঠিক নহে। অনেকে জয়দেবের বহুপরবর্ত্তী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিবৃত তত্ত্ববাদ অবলম্বন করিয়া জয়দেবের বৈষ্ণব ভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু গীতগোবিন্দ চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম সূত্রগ্রন্থরূপে পূজিত হইলেও এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা সাধারণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঐতিহাসিক ধারা বা পারম্পর্য্য উপেক্ষিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার দ্বারা জয়দেবের রচনার প্রকৃত তাৎপর্য্যও যথাযথ গৃহীত হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, জয়দেব ছিলেন কাব্যামোদী রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ও গীতিবিশারদ কবি; সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সৃষ্টির দ্বারা মনোরঞ্জন করাই তাঁহার কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। আদিরস চিরদিনই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার; এবং ভক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের দেশে আদিরসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সুতরাং

বৃন্দাবনলীলার চিরন্তন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অবলম্বন করিয়া, জয়দেবের মত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কবি কাব্যসৃষ্টি করিবেন ইহা স্বাভাবিক। চৈতন্যানুগামী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তিশাস্ত্রেও রাধাকৃষ্ণের প্রেম মধুর রসের আকররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাদৃশ্য এইটুকু; কিন্তু জয়দেব পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্র অনুসরণ করেন নাই, পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্রই তাঁহার কাব্যগ্রন্থকে শাস্ত্রগ্রন্থরূপে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। চৈতন্য-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তিকে রসরূপে আস্বাদন করে, এবং শৃঙ্গারমূলক উপাসনাই তাঁহাদের উপাসনা-তত্ত্বে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। বহুপূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেবের কাব্যগ্রন্থেও এই ভক্তিমূলক শৃঙ্গাররসই অঙ্গী। এইজন্য বোধ হয় জয়দেবের উজ্জ্বল-রসাভিষিক্ত পদাবলী চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রীতিকর ছিল বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ে গীতগোবিন্দকে ধর্ম্মগ্রন্থ ও জয়দেবকে সম্প্রদায়ানুযায়ী ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ পরম বৈষ্ণবরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।* এইরূপ আরও দেখা যায়, চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক বিদ্যাপতিকে এবং বাশুলীদেবীর উপাসক চণ্ডীদাসকে শাস্ত্রসম্মত বৈষ্ণব কবি সাজাইয়া, ইদানীন্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহাদের গানগুলিকে যে-রসে যেটি উপযোগী সেইরূপ বসাইয়া স্বকীয় রসশাস্ত্রের আদর্শে গ্রহণ করিয়াছে। এই মনোভাবের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় রূপগোস্বামীর পদ্যাবলী নামক বৈষ্ণব-কবিতা-সংগ্রহে। ইহার মধ্যে অবৈষ্ণব অমরু ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের শৃঙ্গাররসাত্মক রচনাও বৈষ্ণব ভাবের পরিবেষ্টনীর মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে।

কবিসুলভ গর্ব্বে জয়দেব আপনাকে 'কবিরাজরাজ' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন; এবং তাঁহার এই কবি-অভিমান একেবারেই নিরর্থক নয়। সুতরাং তাঁহার রচনার এই দিকটা কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনায় দ্বাদশ সর্গে জয়দেবের অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। সর্গবদ্ধ কাব্যের আকারে লিখিত হইলেও ইহা ঠিক সংস্কৃত কাব্যের আদর্শে গঠিত নয়, এ কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। আখ্যানভাগ বা বর্ণনার জন্য মধ্যে মধ্যে মামুলী সংস্কৃত ছন্দে রচিত শ্লোকাবলী দ্বারা ইহার অসংবদ্ধ পদাবলীগুলি একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে; কিন্তু এই পদগুলিই ইহার সর্ব্বস্ব। জয়দেবের নিজের ভাষায়, কাব্যখানি 'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী'র সমষ্টিমাত্র। সমস্ত কাব্যটিতে কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর উক্তিগুলি সুর-তালে গেয় এই পদাবলীর আকারেই সজ্জিত। সুতরাং ইহাকে সত্যকার

গীতিকাব্য বলা যাইতে পারে; কিন্তু গীতিকবিতার মধ্যে আখ্যান, বর্ণনা ও সংলাপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। সর্গ-বর্ণিত বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক সর্গের পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সর্গের নাম 'সামোদ-দামোদর'। রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া সরস বসন্তের প্রারম্ভে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপীগণের সহিত কেলি-বিলাসে মগ্ন। কৃষ্ণের পূর্ব্বপ্রীতি স্মরণ করিয়া রাধা ভাবিতেছেন, আমার প্রিয় দামোদর আজ আমাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যত্র সুখসম্ভোগে মাতিয়াছেন; রাধার এই স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া সর্গটির নাম সামোদ-দামোদর। দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশ-কেশব'। রাধা সখীর নিকট পুনর্ব্বার মিলনের উৎকণ্ঠায় মনের দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু কেশব ক্লেশরহিত। তৃতীয় সর্গের নাম 'মুগ্ধ-মধুসূদন'। গোপীদের পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ মুগ্ধ ও অনুতপ্ত চিত্তে রাধার অন্বেষণ করিতেছেন। চতুর্থ সর্গ 'স্নিগ্ধ-মধুসূদন'। রাধার সখী কৃষ্ণের নিকট আসিয়া ভাবনালীনা বিরহদীনা রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। পঞ্চম সর্গ 'সাকাঙ্ক্ষ-পুণ্ডরীকাক্ষ'। সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া রাধা আবার অভিসারে আসিবেন এই আকাঙ্ক্ষায় ধীরসমীরে যমুনাতীরে পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতীক্ষা করিতেছেন। ষষ্ঠ সর্গ 'ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ'। রাধার বাসকসজ্জা বর্ণনা করিয়া সখী যেন বলিতেছেন, হে ধৃষ্ট তুমি কি এখনও কুণ্ঠাশূন্য থাকিবে? সপ্তম সর্গ 'নাগর-নারায়ণ'। বহুবল্লভ নাগরের ছলনায় বিরহখিন্না রাধা এখন বঞ্চিতা ও বিপ্রলব্ধা। অষ্টম সর্গ 'বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি'। খণ্ডিতা নায়িকারূপিণী রাধার দুর্জ্জয় মান দেখিয়া লক্ষ্মীপতি তাঁহার পদসেবিকা লক্ষ্মীর তুলনায় রাধার প্রেমের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। নবম সর্গ 'মুগ্ধ মুকুন্দ'। কলহান্তরিতা রাধার মানভঞ্জনের চিন্তায় মুকুন্দ মুগ্ধ হইয়াছেন। দশম সর্গ 'চতুর-চতুর্ভুজ'। মানিনীর পদযুগল ধারণ করিয়া কৃষ্ণ এখানে স্তুতি ও চেষ্টায় চতুর। একাদশ সর্গ 'সানন্দ-গোবিন্দ'। মানভঞ্জনের পর মিলন-সম্ভাবনায় গোবিন্দ আনন্দিত হইয়াছেন। দ্বাদশ সর্গ 'সুপ্রীত-পীতাম্বর'। রাধাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়া পীতাম্বর এখন সুপ্রীত ও কৃতার্থ।

শুধু ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক হইতে দেখিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দে বিশেষ নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হইবে না। পূর্ব্বরাগ হইতে মিলন পর্য্যন্ত প্রেমের যাহা কিছু ভাব ও লীলা, তাহার সরস চিত্র পূর্ব্বগামী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। জয়দেব তাঁহার কাব্যে এমন কোনও বিচিত্র ভাব বা

অবস্থার বর্ণনা করেন নাই, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের দ্বারা বর্ণিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনও সংস্কৃত কাব্যে নূতন নহে। কিন্তু মূল বিষয়টি অথবা ইহার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি পুরাতন ঐতিহ্য বা প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে নিপুণভাবে আহৃত হইলেও জয়দেবের কাব্যের রসরূপটি তাঁহার নিজস্ব। কেবলমাত্র ভাব বা প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাঁহার উৎকর্ষ নয়; এ সকল চিরাগত ভাব বা সর্ব্বসাধারণ বিষয় যে স্বতন্ত্র আকার ও ভঙ্গিমা ধারণ করিয়াছে তাহাতেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। ইহা সত্য যে, জয়দেবের কাব্যের বহিরঙ্গ রূপটি সর্ব্বাগ্রে প্রতিভাত হয়। ইহার শব্দ, অর্থ, ভঙ্গি, ছন্দ,—এক কথায় ইহার গঠন-শিল্পের চমৎকারিতা মনকে সহসা চকিত ও আনন্দিত করিয়া তোলে, ভাবগ্রহণের অপেক্ষাও রাখে না। কিন্তু ইহার অন্তর্গত ভাব ও বহিরঙ্গ রূপ, এই উভয়েরই সমগ্রতা লইয়া কবির কাব্য-প্রতিভার বিকাশ। ইহাকেই আমরা তাঁহার কাব্যের রসরূপ বলিতেছি।

কিন্তু কেবল শিল্পী হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধারণ যে অনেক সময় তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যকে তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরা কিছু অস্বাভাবিক নয়। ইংরেজ কবি কীট্‌স বলিয়াছেন—Poetry must surprise by its fine excess. গীতগোবিন্দে এ কথা খুব খাটে। কবি-কল্পনার প্রাচুর্য্য ত আছেই, কিন্তু fine এই শব্দটির দ্বারা শিল্পীর যে সংযম ও নৈপুণ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও গীতগোবিন্দের লিপিকুশলতায় বর্ত্তমান। বাগর্থের পরস্পরসাপেক্ষ সার্থকতা, শব্দময় আলেখ্য-লিখনে দক্ষতা, ধ্বনি-বৈচিত্র্য, ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, পদ-লালিত্য ও গীতি-মাধুর্য্য এই কাব্যটিকে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু কাব্যকলার অপরিমিত স্ফূর্ত্তি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও, সামর্থ্যের স্বেচ্ছাচার বা প্রাগল্ভ্য নাই; শিল্প-নৈপুণ্যের সূক্ষ্মতা থাকিলেও, অনর্থক আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা নাই; ইহার কান্ত কোমলতা ও স্বচ্ছন্দ গতি মনকে তন্ময় করিয়া দেয়। নিছক শব্দ-সম্পদে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী; প্রাচীন কবিগণ যে অদ্ভুত শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা কেবল সংস্কৃতের মত ভাষার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দমাত্র-পরম্পরার যে অন্তর্লীন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, তাহার অসামান্য প্রয়োগে সমৃদ্ধ এতাদৃশ সংস্কৃত সাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পী কবি দুর্লভ। সেইজন্য তাঁহার কবিতা ভাষান্তরিত করা দুঃসাধ্য, কারণ তাঁহার সুনির্ব্বাচিত শব্দগুলির প্রতিশব্দ দেওয়া যায় না। জয়দেব শব্দমন্ত্রে যেমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন,

গীতিচ্ছন্দেও তেমনি তাঁহার অপূর্ব্ব অধিকার। তথাপি কেবল নিপুণ শিল্পী বলিয়া অভিহিত করিলেই জয়দেবের কবি-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ বহিরঙ্গ কারিগরিই তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সর্ব্বস্ব নয়। এই স্বভাবসিদ্ধ শিল্প-নৈপুণ্য তাঁহার ভাব ও কল্পনার অঙ্গমাত্র। তাঁহার শব্দ ও ছন্দ বিষয়বস্তুর অনুগামী; বাহির হইতে আরোপিত নয়, কেন্দ্রগত অনুভূতি হইতে আপনি বিকশিত। যে ধ্যান ও গীতি তাঁর আত্মগত অনুভব ও প্রীতির রঙে সুন্দর ও মধুর হইয়া তাঁহার কবি-হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে তাহাকে তিনি সম্পৃক্ত বাগর্থ-পরম্পরায় তাহার অনুরূপ সুন্দর ও মধুর রূপ দিয়াছেন।

কারণ, জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে কেবল ইষ্টদেবতার অপ্রাকৃত লীলা-বর্ণনা অথবা প্রাচীন কবিদের মত প্রাকৃত প্রেমগাথা রচনা করেন নাই; এই প্রেম ও লীলা যে-রূপে তাঁহার কল্পনা-দর্পণে ও অনুভূতির আলোকে প্রতিফলিত হইয়াছিল সেই অপরূপ রূপটি তাঁহার চিত্রে ও গানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার রচনায় অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃত, ভক্তির সহিত প্রীতি, কল্পনার সহিত বাস্তব-অনুভূতি একাকারে মিশিয়া গিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের যে চিরন্তন প্রেমলীলা তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা শুধু কাহিনী-মাত্র নয়, তাঁহার ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট তাহা বাস্তব-জগতের বিচিত্র রূপে ও রসে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সেইজন্য জন্য কবি শুধু ধ্যান-ধারণার নিত্য-বৃন্দাবন সৃষ্টি করেন নাই; তাহাকে কবি-মানসের সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির রসে অভিষিক্ত করিয়া অপূর্ব্ব বাস্তব-সুষমায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। প্রাকৃত প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবিরূপে অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবনলীলা, মানবোচিত ভাব ও ভাষায়, উজ্জ্বল ও গীতিময় শব্দচিত্র-পরম্পরায় সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হইয়াছে। এই বাস্তব ও কল্পনার সংযোগ, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গত ভাবের মিশ্রণ,—ইহাই গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কাব্যবস্তু। আদিরসের মত মানব-হৃদয়ের একটি নিগূঢ়, মধুর, ও শক্তিশালী বৃত্তিকে ধর্ম্ম-সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া, অপরূপ দেবলীলাকে সুপরিচিত মানবলীলার যে নির্দ্দিষ্ট রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য-পিপাসু ভক্তের আদরের সামগ্রী নয়, কাব্যরস-পিপাসু সহৃদয়মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী। এখানে মর্ত্ত্য প্রেমের মধ্য দিয়াই অমর্ত্ত্য প্রেমের সাক্ষাৎকার হইয়াছে; আপনার কামনার মধ্যেই আপনার সাধনাকে কবি সার্থক করিয়াছেন। সেইজন্য শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে নয়, কাব্যগ্রন্থ হিসাবেও গীতগোবিন্দের উৎকর্ষ।

তাই কবির রাধা শুধু কল্পলোকের কল্পনারূপিণী নহেন, তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি ও প্রীতির বাস্তব-লক্ষ্মী। এখানে মানবী হইতে দেবীকে পৃথক করা যায় না। পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আদর্শকে কবি যেন কোন বিশিষ্ট বিগ্রহের মধ্যে অনুভব করিয়া, কল্পনা-লোকের অপরিমেয়তাকে জীবনের পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে, অপার্থিবকে পার্থিব রূপরসের সীমার মধ্যে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। (কারণ, সকল প্রকৃত কবির মত তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর অনুভূতির উপরই অতীন্দ্রিয় জগতের বৃহত্তর ও শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য তাঁহার কাব্যের রসরূপটি সম্পূর্ণ কল্পনা-মূলক নয়। যিনি বাহির-ভুবনে ও কায়া-সৌন্দর্য্যে তাঁহার বাহুপাশে ধরা দিয়াছেন, তিনিই আবার গানের আড়ালে ও ছায়া-সৌন্দর্য্যে কল্পনারূপিণী হইয়া সাড়া দিয়াছেন। ভাব ও বস্তুর, স্বপ্ন ও সত্যের, অন্তর ও বাহিরের এই স্পষ্ট ও অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই গীতগোবিন্দের অন্তর্গত প্রেরণার ও বহিরঙ্গ প্রকাশের মূলে রহিয়াছে।) (যদি গীতি-প্রাণতা ও আত্মগত ভাবনার দ্বারা বহির্গত জগৎকে আত্মসাৎ করা গীতি-কবিতার, অথবা ইংরেজি পরিভাষায় lyric কবিতার, মূল-লক্ষণ হয়, তবে জয়দেবের পদাবলী প্রকৃত গীতি-কবিতার বা lyric-এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এবং ইংরেজিতে যাহাকে pictorial art বা চিত্রাঙ্কণ শক্তি বলে, তাহা তাঁহার শব্দময়-আলেখ্য-লিখনে অসামান্য পরিণতি লাভ করিয়াছে।)

এই হিসাবে বলা যাইতে পারে, জয়দেবের কাব্যে সংস্কৃত গীতি-কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তথাপি ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জয়দেবের রচনাকে প্রাচীন সংস্কৃত গীতি-কবিতার কোন বিশিষ্ট পর্য্যায়ে নিশ্চিতরূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পূর্ব্বতন সংস্কৃতের ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিলেও তিনি তাহাদিগকে নূতন আকারে ও প্রকারে প্রয়োগ করিয়াছেন। সমস্ত কাব্যটি বাহির ও ভিতর হইতে যে নূতন ও বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কাব্যের সম্পূর্ণ অনুযায়ী নয়; বরং সমসাময়িক নবোদিত দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর অনুরূপ। বাহ্যতঃ নাটকের কিঞ্চিৎ আবরণ থাকিলেও, জয়দেবের রচনা গীতিপ্রাণ ও গীতিসর্ব্বস্ব; ইহার গীতগোবিন্দ নামটিই তাহার নিদর্শক। কিন্তু মেঘদূতকে যদি গীতি-কবিতা বলা যায়, তবে এই প্রাচীনতর নিদর্শনের সহিত গীতগোবিন্দের সাদৃশ্য অতি অল্প। আবার সর্গ-বিভাগ হইতে ইহাকে ঠিক সংস্কৃত আলংকারিকের কাব্য বলিয়া

ধরা যায় না। কারণ সর্গবন্ধ কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি ইহাতে নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে আবার গীতগোবিন্দকে ঠিক দেশীয় গীতিনাট্য-শ্রেণীর রচনাও বলা যায় না। ভাবপ্রবণতায় ও গীতিবাহুল্যে দেশীয় গীতাভিনয়ের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও. প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রাদির সহিত ইহার পার্থক্যও রহিয়াছে। ইহার নাট্যবস্তু যৎসামান্য, এবং যাত্রাদির মত ইহা সাময়িক প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। উৎসবাদিতে জনসাধারণের জন্য প্রযুক্ত হইলেও, ইহা নিপুণ শিল্পীর সুঘটিত সৃষ্টি; রাগবহুল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ হইলেও কাব্যকলার সাবধানতায় সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ। প্রাকৃতানুযায়ী মাত্রাচ্ছন্দে ও দেশীয় ভঙ্গিতে রচিত গেয় পদগুলি ইহার সর্ব্বস্ব, কিন্তু তাহার সহিত সংস্কৃত ছন্দে রচিত আখ্যান ও বর্ণনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার উপর —কাব্যস্মৃতিসমুজ্জ্বল যমুনার তটপ্রান্তে, কখনো মেঘমেদুর বর্ষার নবসমারোহে, কখনো সরস বসন্তের সুরভি সুষমায়, বৃন্দাবনের না হউক বাংলা দেশের তমালশ্যামল বনভূমি যে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছায়াও জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর মাধুর্য্যসিক্ত ভাবরাজির সহিত বিচিত্ররূপে মিশিয়া গিয়াছে! তৎকালীন সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের যাহা কিছু মধুর ও সুন্দর উপাদান, তাহা গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করিয়াছে; কিন্তু এই রচনার মধ্যে জয়দেবের কবি-প্রতিভার যে সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও শক্তিময় স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, তাহা ইহাকে সংস্কৃত বা দেশীয় কাব্য-সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

বাস্তবিক, রূপ ও রস এই দুই দিক হইতে আলোচনা করিলে মনে হয়, তৎকালীন কাব্যসাহিত্যে গীতগোবিন্দ একটি নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ দেশীয় বলা যায় না, আবার সম্পূর্ণ সংস্কৃতও নয়। তথাপি কোন কোন সমালোচক মনে করেন, সংস্কৃতের ছাপ থাকিলেও এই কাব্য প্রথমতঃ দেশীয় ভাষায় ও দেশীয় প্রথায় রচিত, পরে সংস্কৃতে অনূদিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ছন্দে লিখিত বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি ছাড়িয়া দিলে, বাকি যে রাগমূলক পদাবলী গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে রচিত; সেই ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গি যতটা দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী ততটা সংস্কৃতের নয়। 'পদ' শব্দটি প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত হইলেও 'পদাবলী' শব্দটি যে অর্থে এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাও সংস্কৃত নয়। গীতগোবিন্দে সংস্কৃতের অলঙ্কার ও শব্দার্থগৌরব সর্ব্বত্র

রক্ষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পদাবলীতে ব্যবহৃত ভাষার রচনাপদ্ধতি সংস্কৃত কাব্যের অনুরূপ নয়; বরং এই স্বচ্ছ ও সহজ গেয় পদগুলি দেশীয় গানেরই প্রকৃতি অনুসরণ করিয়াছে। এমন কি, অতি অল্প চেষ্টায় অনেক পদ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে পরিণত করা যায়। যেমন—

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্

এই সংস্কৃত পদটি

সুমরই মন মম কিঅপরিহাসম্

এইরূপ প্রাকৃতে পরিণত করা কঠিন নয়। প্রাকৃতপিঙ্গলে উদাহৃত পাদাকুলক প্রভৃতি যে সকল মাত্রাছন্দ গীতগোবিন্দে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাও প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কবিতার আত্মীয়, সংস্কৃতের নয়। সংস্কৃত ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস আছে কিন্তু পাদান্ত মিল বা rhyme নাই; গীতগোবিন্দের সমস্ত পদাবলী, অপভ্রংশ কবিতার মত, মিলযুক্ত। পদাবলী-রচনার ধরণও ভিন্ন। সংস্কৃত কবিতা সাধারণতঃ পাদচতুষ্টয়-সমন্বিত এক একটি শ্লোক বা stanza-তে পর্য্যবসিত; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। শ্লোকগুলি কখনো পরস্পরসংবদ্ধ, কখনো অসংবদ্ধ; কিন্তু এক একটি শ্লোক প্রায়ই এক একটি সম্পূর্ণ ভাবের দ্যোতক। পদাবলীর প্রকৃতি এরূপ নয়; এগুলি ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। গানের মত, পৃথকরূপে বিভিন্ন ভাবের জ্ঞাপক হইলেও এগুলিকে সমষ্টিভাবেই ধরিতে হইবে; এবং অন্তে নিবিষ্ট refrain বা ধ্রুবপদই ইহাদের ভাবপরম্পরার যোগসূত্র।

শুধু তাহাই নয়, পদাবলীর ছন্দগুলি পরবর্ত্তী বাংলা ছন্দের মূলস্বরূপ বলিয়া মাত্রাছন্দ হইলেও এগুলির ধ্বনিবৈচিত্র্য যে অতি সহজেই আধুনিক অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত বাংলা ছন্দে রক্ষা করা যায়, তাহা শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় তাঁহার গীতগোবিন্দের অনুবাদের অনেক স্থলেই দেখাইয়াছেন। যথা—

পশ্যতি। দিশি দিশি। রহসি ভ। বন্তং
ত্বদধর। মধুর ম। ধূনি পি। বন্তং।

বাংলায় ইহার অনুকরণে—

তোমারেই। দিশি দিশি। হেরিছে সে। কৃষ্ণ
অধরের। মধুপানে। সতত স-। তৃষ্ণ।

এইরূপ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জয়দেবের প্রযুক্ত ষোড়শমাত্রা-যুক্ত পাদাকুলক ছন্দকে, যেমন—

দলিত কু। সুম দর। বিলুলিত। কেশা

অথবা

বিহরতি। হরিরিহ। সরস ব। সন্তে

এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ইহা হইতে চতুর্দ্দশ-অক্ষরযুক্ত যেমন—

কাশীরাম। দাস কহে। শুনে পুণ্য। বান্

বাংলা পয়ারের উদ্ভব দেখাইয়াছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও

বদসি যদি। কিঞ্চিদপি। দন্তরুচি-। কৌমুদী

জয়দেবের এই ছন্দধ্বনির অনুকরণে—

একদা যবে। অঙ্গ ধরি। ফিরিতে নব। ভুবনে

এইরূপ অপূর্ব্ব বাংলা ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। এই পদাবলী ছাড়া গীতগোবিন্দে যে সকল মামুলী সংস্কৃত ছন্দের শ্লোক দেখা যায়, সেগুলির সন্নিবেশও দেশীয় গীতিসাহিত্যের ধারার মধ্যে পাওয়া যায়; যেমন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি ও পারম্পর্য্য রক্ষার পদ্ধতি রহিয়াছে।

এই সকল কারণে পিশেল্ (Pischel)-প্রমুখ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, গীতগোবিন্দ প্রথমে জনসাধারণের জন্য কোন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হইয়াছিল; পরে সংস্কৃতাভিমানী শ্রোতার জন্য সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আধুনিক সময়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অনুমানের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই মতবাদের কোন সন্তোষজনক ভিত্তি নাই। জয়দেবের কাব্যের এরূপ উৎপত্তি বা পরিণতির কোন প্রবাদ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা সত্য যে গীতগোবিন্দের বর্ণনাত্মক বা বিবৃতিমূলক সংস্কৃত শ্লোকগুলি সমসাময়িক শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে ও কাশ্মীরক বল্লভদেব সংগৃহীত সুভাষিতাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার গেয় পদাবলী হইতে একটিও উদাহরণ দেওয়া হয় নাই। কেবলমাত্র ইহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত হয় না; অন্ততঃ পদাবলীগুলি যে প্রাকৃতে রচিত ছিল এরূপ অনুমানের কারণ নাই। এমন হইতে পারে, পদাবলী উদ্ধৃত হয় নাই তাহার কারণ এগুলিতে সংস্কৃত

শ্লোকের চেয়ে পদাধিক্য রহিয়াছে; এবং এগুলি দেশীয় ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির প্রভাবে রচিত ধ্রুবপদসমন্বিত গান বলিয়া নিছক সংস্কৃত সুভাষিত-সংগ্রহে স্থান পায় নাই।

জয়দেবের কাব্যের আদিম রূপ নির্ণয় করিতে হইলে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, গীতগোবিন্দ যে-সময় রচিত হইয়াছিল সে-সময় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় শেষ অবস্থা বা অবনতির যুগ, এবং অপভ্রংশ বা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ের কাল। সেইজন্য এই পরিবর্ত্তন-যুগে এক শ্রেণীর রচনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যের নিয়ম-নিগড় দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নয়, অথচ নূতন দেশীয় সাহিত্যের পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করে নাই। ইহার কারণ, যেমন দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছিল তেমনি এখন সংস্কৃতের উপর দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সময় হইতেই, গীতগোবিন্দ ভিন্ন অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহার অনিবার্য্য প্রভাবে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইতেছিল। নবোদিত ও জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তৃত দেশীয় ভাব ও ভাষার আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও নূতনরূপে গঠিত করিবার প্রয়াস সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছিল। আমাদের মনে হয়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই নূতন প্রয়াসের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেশী গানের আদর্শে রচিত হইলেও পদাবলীগুলিকে ঠিক দেশীয় গান বলা যায় না। দেশীয় ভাষার পদ্ধতি ও ভঙ্গি, দেশীয় গীতাভিনয়ের সঙ্গীত বাহুল্য ও ভাবপ্রবণতা ক্রমশঃ সংস্কৃতে রচিত কাব্যে-নাটকে আসিয়া পড়িতেছিল; গীতগোবিন্দে তাহাই দেখা যায়। কিন্তু ইহার অলঙ্কারবহুল ও পরিণত রচনাকৌশল সংস্কৃতের অনুগামী, প্রাকৃতের নয়। যে যমক-অনুপ্রাসাদির নিপুণ প্রয়োগ ইহার সংস্কৃত শব্দ ও অর্থবিন্যাসে পাওয়া যায় তাহা ব্যঞ্জনবর্ণবিরল প্রাকৃত বা অপভ্রংশ রচনায় সেই পরিমাণে সম্ভবপর নয়। সুতরাং কাব্যটি যদি প্রথমে প্রাকৃত বা অপভ্রংশে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধরিতে হইবে এই শব্দালঙ্কার-গুলির প্রাচুর্য্য প্রথম রচনায় ছিল না; পরে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইবার সময় ইহাদের সন্নিবেশ হইয়াছে। কিন্তু গীতগোবিন্দ যে এরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রচনা তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার

শব্দবর্ণের বিন্যাস-কৌশল ও অলঙ্কার-সন্নিবেশ বাহির হইতে আরোপিত ব্যাপার নয়, ইহার রচনা-পদ্ধতির স্বাভাবিক অঙ্গ। কাব্য হিসাবে ইহার ভাব ও ভাষার যে অচ্ছেদ্য ঐক্য ও সমগ্রতা রহিয়াছে, তাহা ভাষান্তরিতমাত্র রচনায় সম্ভবপর বলিয়া কোনও কাব্যরসিক স্বীকার করিবেন না। এখানে দেশীয় গানের প্রভাব অঙ্গীকার করিয়া সংস্কৃত রচনা-নৈপুণ্য দেশীয় ধরণের গান বা পদাবলী রচনা করিয়াছে; দেশীয় গানকে কেবল সংস্কৃতে অক্ষরানুযায়ী অনুবাদ করে নাই। যেরূপ পরিবর্ত্তন-যুগের কথা আমরা উপরে বলিয়াছি, সেরূপ যুগেই এই শ্রেণীর অনিয়ত রচনার সম্ভব হইয়াছিল—যে রচনা পূর্ণমাত্রায় সংস্কৃত নয়, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় দেশীয়ও নয়। ভাষান্তরের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় না।

ইহার সমর্থনে বলা যায়, তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে গীতগোবিন্দ এই শ্রেণীর একমাত্র রচনা নয়। গুজরাতের কবি রামকৃষ্ণ রচিত গোপাল-কেলি-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থেও গীতগোবিন্দের অনুরূপ পদাবলী দৃষ্ট হয়। এই রচনাটি নামে নাটক হইলেও, সংস্কৃত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত নয়, বরং নূতন দেশীয় যাত্রার প্রভাবে ইহাতে নাট্যকলা ও প্রকৃত নাট্যবস্তুর অভাব, গানের আধিক্য ও ভাবপ্রবণতার প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায়। বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল কবি উমাপতি শর্ম্মার পারিজাত-হরণ নাটকে মৈথিল ভাষায় রচিত পদাবলীর সমাবেশ রহিয়াছে, এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই মৈথিল গানগুলি সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করা হয় নাই। নেপালে আবিষ্কৃত হরিশ্চন্দ্রনৃত্যও এই ধরণের মিশ্র রচনা। 'পদাবলী' শব্দটির যে নূতন অর্থ তাহাও দেশীয় সাহিত্যের নূতন প্রেরণা হইতে আসিয়াছে। কিন্তু গীতগোবিন্দের পদাবলী যদি প্রথমে দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, তবে পারিজাত-হরণের পদাবলীর মত সেগুলির সেই আদিম আকারেই থাকিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল; সংস্কৃতে রূপান্তরিত হইবার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ পাওয়া যায় না। পদাবলীর দেশীয়-ছন্দ-অনুযায়ী ছন্দোবৈচিত্র্য ও পাদান্ত মিলও উল্লিখিত সাময়িক পরিবেষ্টনের প্রভাবে দেশীয় গান হইতে সংস্কৃত গানে অবলম্বিত হইয়াছিল; ইহা দেশীয় গানের সংস্কৃত অনুবাদের নিদর্শন নয়।

বাংলা দেশের বাহিরেও গীতগোবিন্দের সমাদর ও প্রভাব যে কত বিস্তৃত ও গভীর ছিল, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে ইহার বার-তেরটি অনুকরণ ও

প্রায় চল্লিশটি বিভিন্ন প্রদেশে রচিত টীকাগ্রন্থ; সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, বাংলা দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ মিথিলা ও উড়িষ্যা জয়দেবকে তাহাদের দেশজাত কবি বলিয়া দাবী করিবে। এই দুই প্রদেশে জয়দেবের প্রভাব যে যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গীতগোবিন্দের একজন সুপরিচিত টীকাকার হইতেছেন মৈথিল শঙ্কর মিশ্র। মিথিলার কবি ভানুদত্ত রাধাকৃষ্ণের নয়, হরগৌরীর বিলাসবর্ণনাত্মক গীতগৌরীশ কাব্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দের কিরূপ সাক্ষাৎ অনুকরণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। যথা জয়দেব পদাবলীতে রহিয়াছে—

নিভৃত-নিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিত-বিলোকিত-সকল-দিশা রতি-রভস-রসেন হসন্তম্।
সখি হে কেশিমথনমুদারং
রময়া ময়া সহ মদন-মনোরথ-ভাবিতয়া সবিকারম্॥

ইহার অনুকরণে ভানুদত্ত লিখিতেছেন—

অভিনব-যৌবন-ভূষিতয়া দর-তরলিত-লোচন-তারম্।
কিঞ্চিদুদঞ্চিত-বিহসিতয়া চলদবিরল-পুলক-বিকারম্।
সখি হে শঙ্করমুদিতবিলাসং
সহ সঙ্গময় ময়া নতয়া রতি-কৌতুক-দর্শিত-হাসম্॥

পুনশ্চ, জয়দেব—

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদম্।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত-মীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

ভানুদত্ত—

ভ্রমসি জগতি সকলে প্রতিলবমবিশেষম্।
শময়িতুমিব জনখেদমশেষম্।
পুরহর কৃত-মারুতবেষ, জয় ভুবনাধিপতে॥

এইরূপ ভানুদত্তের সমগ্র কাব্য হইতে দেখান যায়। উড়িষ্যার গজপতি প্রতাপরুদ্রের সমকালবর্ত্তী রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ঠিক এই

ধরণের রচনা নয়; কিন্তু ইহাতে জয়দেবের অনুকরণে কয়েকটি পদাবলী রহিয়াছে। যথা—

মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব-বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত-মরকত-মণিতল-বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্।
যুবতি-মনোহর-বেষং
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমনু পরিণত-রূপবিশেষম্॥ ইত্যাদি

এই ধরণের পদাবলী যে কিরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল তাহা সংস্কৃতে রচিত পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে বুঝা যায়। প্রবোধানন্দের সঙ্গীত-মাধবে, কবিকর্ণপুরের আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূতে, রূপ গোস্বামীর গীতাবলীতে এবং জীব গোস্বামীর গোপালচম্পূতে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। ইহার ভাষা, ভঙ্গি ও ছন্দ কিরূপ অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা রূপ গোস্বামীর একটি পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলে বুঝা যাইবে—

কোমল-শশিকর-রম্য-বনান্তর-নির্মিত-গীত-বিলাস।
তূর্ণসমাগত-বল্লবযৌবত-বীক্ষণ-কৃতপরিহাস॥

জয় জয়

ভানুসুতা-তট-রঙ্গ-মহানট সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত-দিব্যরসাবৃত-মঙ্গল-রাসবিহার॥ (ধ্রুব)
গোপীচুম্বিত-রাগকরম্বিত-মান-বিলোকন-লীন।
গুণগর্বোন্নত-রাধাসংগত-সৌহৃদ-সম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত-পান-মদাহৃত-বলয়ীকৃত-পরিবার।
সুরতরুণীগণ-মতি-বিক্ষোভন খেলন-বল্লিত-হার॥
অসুবিঘাতন-নন্দিত-নিজজন মণ্ডিত-যমুনাতীর।
সুখসংবিদ্ঘন-পূর্ণসনাতন-নির্মলনীল-শরীর॥

এমন কি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মত অবৈষ্ণব গ্রন্থেও যে গীতগোবিন্দের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল তাহা উক্ত গ্রন্থের দুএকটি পদাংশ হইতে বুঝা যায়: যথা—

রসিকেশ কেশব হে।
রসসরসীমিব মামুপযোজয় রসময় রসনিবহে॥

অথবা—

কেশব কমলমুখী কমলং
কমলনয়নকলয়াতুলমমলম্।
কুঞ্জগেহে বিজনেঽতিবিমলম্॥ (ধ্রুব)
সুরুচির-হেমলতামবলম্ব্য তরুণতরুং ভগবন্তম্।
জগদবলম্বনমবলম্বিতুমনু কলয়তি সা তু ভবন্তম্॥ ইত্যাদি।

বাংলা দেশের কবির কাব্য যে এককালে এইরূপ সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছিল, তাহার কারণ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অতি অল্পকথায় ঠিকই বলিয়াছেন—

বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
সুরভি করেছে সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

ইহার সহিত আর একটু বেশি করিয়া বলা যায়—

যাহার ভণনে হরিগুণগানে ভক্তির সাথে প্রীতি
মিশে একাকারে মানবী ও দেবী, কল্পনা সাথে স্মৃতি!

চৈতন্য-সম্প্রদায় ও মাধ্ব সম্প্রদায়

চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে আজকাল এইরূপ একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, এই সম্প্রদায় প্রাচীনতর মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। চৈতন্য-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার তিনখানি গ্রন্থে দিনেশচন্দ্র সেন এই মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই দেশে মাধ্ব সম্প্রদায়ের গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদবর্গ যে শুধু এই পূর্ব্বতন সম্প্রদায়ের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন তাহা নহে, এই সম্প্রদায়কে গুরু-সম্প্রদায় বলিয়া বরণ করিয়া স্বয়ং চৈতন্যদেব প্রকারান্তরে ইহার অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এই মতবাদ কতদূর সমীচীন তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি আকারে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই সময়ে মাধ্ব-মতের প্রচুর প্রচলন সম্বন্ধে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা প্রবাদ পাওয়া যায় না। জয়দেব বা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়, তাহার সহিত মাধ্বমতের কোনও সম্পর্ক দেখা যায় না। রাস-পঞ্চাধ্যায় মাধ্ব বৈষ্ণবগণের স্বীকৃত নহে; এবং যে শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা জয়দেব ও চণ্ডীদাসের উপজীব্য, তাহা মাধ্ব-উপাসনাতত্ত্বে উচ্চ স্থান অধিকার করে না। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গ্রন্থাদিতে প্রতিফলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাহাই স্বরূপ হউক না কেন, ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের গ্রন্থে বিশিষ্ট মাধ্ব মতের পরিপোষক কিছুই পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনতিপূর্ব্বে যাঁহাদের প্রেরণায় এই দেশে বৈষ্ণব ভক্তিরসের প্রচার হইয়াছিল তাঁহাদের অগ্রগণ্য ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী নামক একজন সন্ন্যাসী। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণব-তোষণী টীকার নমস্ক্রিয়ায় বলিয়াছেন যে, মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারাই কৃষ্ণভক্তিরূপ রস-তরু অঙ্কুরিত হইয়াছিল; এবং এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন,—"ভক্তিকল্পতরুর তিঁহ প্রথম অঙ্কুর"। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে, মাধবেন্দ্র পুরী ভক্তিরসের আদি সূত্রধার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; এবং কবিকর্ণপুর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,

উজ্জ্বলাদি-রস-প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারাই প্রবর্ত্তিত। কথিত আছে যে, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে অদ্বৈত আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় তাঁহার সহিত নাকি নিত্যানন্দের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। মাধবেন্দ্রের সহিত চৈতন্যদেবের কখনও দেখা হইয়াছিল কিনা, জানা যায় না; বোধ হয় পূর্ব্বেই মাধবেন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবেন্দ্রের অন্যতম শিষ্য ঈশ্বর পুরী তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন, এবং কেহ কেহ বলেন যে তাঁহার সন্ন্যাস-গুরু কেশব ভারতীও মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্যভাগবতাদিতে মাধবেন্দ্র পুরীর যে সমাধি ও ভাবোন্মাদের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা চৈতন্যদেবেরই অনুরূপ। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

মাধবেন্দ্র পুরী কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন।

ইহা হইতে মনে হয় যে, চৈতন্যদেবের ন্যায় তিনিও ভাবপ্রধান সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং তাঁহার ভক্তিরসময় সাধনার ধারায় চৈতন্যদেবের ভাব-জীবনের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ লেখকগণের মতে চৈতন্যদেবের অগ্রগামী এই মহাপুরুষ মাধ্ব সন্ন্যাসী ছিলেন; এবং ইঁহাকে পরম গুরু বলিয়া স্বীকার করাতে চৈতন্যদেবকে সম্প্রদায়-অনুরোধে মাধ্ব সন্ন্যাসী বলিতে হইবে। ইহা হইতে তাঁহারা আরও অনুমান করেন যে, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে মাধ্ব মতের বহুল প্রচার ছিল। কিন্তু এই সকল অনুমানের কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, মাধবেন্দ্র পুরীকে মাধ্ব সন্ন্যাসী বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রমাণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের কোনও প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের যে কয়খানি চরিত-গ্রন্থ আছে এবং চৈতন্য-লীলা অবলম্বনে কবিকর্ণপুর যে কাব্য ও নাটক রচনা রচনা করিয়াছিলেন, একমাত্র তাহাতেই মাধবেন্দ্র পুরীর উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু কুত্রাপি তিনি মাধ্ব সন্ন্যাসী বলিয়া বর্ণিত হন নাই। মাধ্ব সম্প্রদায়ের আদিগুরু মধ্বাচার্য্য, অচ্যুতপ্রেক্ষ বা পুরুষোত্তম তীর্থের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া, 'আনন্দতীর্থ' এই সন্ন্যাস-নাম গ্রহণ করেন। পরে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিপক্ষে স্বীয় দ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের এই তীর্থআখ্যা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত শিষ্যানুক্রমে মাধ্ব

গুরুগণ শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের এই 'তীর্থ' আখ্যা দ্বারা পরিচিত; তাঁহাদের মধ্যে 'পুরী' বা 'ভারতী' এই সন্ন্যাস-উপাধি পাওয়া যায় না। 'তীর্থে'র শিষ্য 'পুরী' বা 'ভারতী' হইতে পারেন না—'তীর্থ'ই হইবেন। ইহা হইতে মনে হয়, মাধবেন্দ্র ও তৎশিষ্য ঈশ্বর পুরী শঙ্কর-সম্প্রদায়ী ছিলেন, এবং কেশব ভারতীও এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য যে, শঙ্কর সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীরা 'শিখা' ও 'সূত্র' পরিত্যাগ করেন, কিন্তু মাধ্ব সন্ন্যাসীরা তাহা করেন না। চৈতন্য-ভাগবতে (অন্ত্য, তৃতীয় অধ্যায়) লিখিত আছে যে, মাধবেন্দ্র শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং চৈতন্যদেবও কাটোয়াতে সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় সেইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্বত্র লিখিত আছে।

চৈতন্যদেবের মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির যেমন কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না, তেমনি শঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য, যে ধর্ম্মমত তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার বিশিষ্ট সম্প্রদায়-ভুক্তির কোনও সম্পর্ক নাই; কারণ, তাঁহার ধর্ম্মমত তাঁহার নিজস্ব ও সাম্প্রদায়িক মতের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়। চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের স্মার্ত্ত তত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব ও উপাসনা তত্ত্ব, মাধ্ব বা শঙ্কর সম্প্রদায়ের সেই সব তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সুতরাং তাঁহাকে অন্য কোন আচার্য্য-সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত করিলে তাঁহার সম্প্রদায়ের কোনও গৌরব হানি হয় না। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে মনে হয় যে, সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় তিনি কেশব ভারতীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আপনাকে প্রথমে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসী বলিয়াই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতের একাধিক স্থলে চৈতন্যদেব আপনাকে 'মায়াবাদী' সন্ন্যাসী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু কোথাও মাধ্ব সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেন নাই। পুরীতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট তিনি ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কঠোর প্রস্থান পরিত্যাগ করার জন্য অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে আরও জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্য পর্য্যটনকালে মধ্বাচার্য্যর স্থান উড়ুপীতে উপনীত হইয়া, চৈতন্যদেব মাধ্ব-তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় মতে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সব আলোচনা করিলে তাঁহাকে কোন মতে মাধ্ব সন্ন্যাসী বলা যায় না।

কিন্তু মায়াবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া চৈতন্যদেব ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মাধবেন্দ্র-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ কিরূপে সগুণ উপাসনা ও ভক্তিবাদের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে শঙ্করের পরবর্ত্তী যুগে প্রচলিত ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতের ধারা বুঝিতে হইবে। এই যুগে অদ্বৈতবাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার সহিত কোন বিশিষ্ট দেবতার আরাধনা যে কখনও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। প্রবাদ আছে, স্বয়ং শঙ্করের ইষ্টদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ; বিষ্ণুপুরাণাদির টীকার নমস্ক্রিয়া হইতে জানা যায় যে, শঙ্কর-সম্প্রদায়ী শ্রীধর স্বামী, শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদের ন্যায়, নৃসিংহমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। এইরূপ একাধিক অদ্বৈতবাদী শঙ্কর-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী নির্গুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশক হিসাবে প্রতীক উপাসনার অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের ও ভগবদ্গীতার টীকায় শ্রীধর স্বামী যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সহিত ভাগবত ভক্তিবাদ মিশ্রিত করিবেন ইহা কিছুই বিচিত্র নয়। শ্রীধর স্বামীর টীকায় এই বিরোধ লক্ষ্য করিয়া জীব গোস্বামী (তত্ত্বসন্দর্ভ, বহরমপুর সংস্করণ, পৃঃ ৬৭-৬৮) এইরূপ সমাধান করিয়াছেন যে, শ্রীধর সত্য সত্যই পরম বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীদিগের নিকট ভগবন্মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে, তিনি অদ্বৈতমতের দ্বারা স্বীয় মত কর্বুরিত করিয়া, তাঁহাদিগের গ্রহণযোগ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই, বরং তদীয় ভগবদ্গীতার টীকার প্রারম্ভে শ্রীধর, ভাষ্যকার শঙ্করের মতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, এবং বহুস্থলে শঙ্কর-বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বাহুল্য হইতে বিরত হইয়াছেন। যদিও ভক্তিব্যাখ্যাই তাঁহার টীকা-সমূহের বৈশিষ্ট্য, তথাপি তিনি অদ্বৈতবাদের প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ দেখাইয়াছেন। এই ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়-প্রয়াসের যাহাই মূল্য হউক না কেন, ইহা তৎকালীন বিশিষ্ট দার্শনিক মনোভাবের পরিচায়ক। প্রবাদ আছে, শ্রীধরের এই অপূর্ব্ব চেষ্টার ফলে কাশীধামে স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে দৈববাণীর দ্বারা শ্রীধরী ব্যাখ্যারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। বোধ হয়, শ্রীধরী ব্যাখ্যার অনুসরণে এই সময় হইতেই, এক শ্রেণীর ভাব-প্রধান সন্ন্যাসীর উদ্ভব হইয়াছিল, যাঁহারা অদ্বৈত-সন্ন্যাসের কঠোরতাকে ভক্তিবাদের সরস ধারায় অভিষিক্ত করিয়া, ধর্ম্মকে শুষ্ক দর্শনের গণ্ডী হইতে জীবনের বিচিত্র ভাবধারার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি এই ধরণের সন্ন্যাসী ছিলেন। এবং চৈতন্যদেবও, বোধ

হয়, এই প্রস্থানের ভক্তিপ্রবণতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রথমে এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ভক্তিবাদী হইয়াও অদ্বৈত আচার্য্যেরও যে অদ্বৈত জ্ঞানবাদের প্রতি পক্ষপাত ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তীরভুক্তির বিষ্ণু পুরীও এই শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহাকেও মাধ্ব বলিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। শ্রীধরের সরণি অনুসরণ করিয়া বিষ্ণু পুরী শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিপ্রধান শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিয়া 'ভাগবত-ভক্তিরত্নাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের শেষে একটি শ্লোক আছে, তাহাতে সংগ্রাহক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে শ্রীধরের ব্যাখ্যাই তাঁহার উপজীব্য, এবং শ্রীধরের লিখন হইতে স্বরচনায় যদি কিছু ন্যূনাধিক দৃষ্ট হয়, তাহার জন্য সুধীবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। বাস্তবিক, পরবর্ত্তীযুগের ধর্ম্মমতের উপর শ্রীধর স্বামীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। স্বয়ং চৈতন্যদেব শ্রীধর স্বামীর মতের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং একবার পুরীতে বল্লভ ভট্ট-বিরচিত ভাগবতের কোনও ব্যাখ্যাকে তিনি 'স্বামী'মতের বিরোধী বলিয়া, শ্লেষপূর্ব্বক 'ভ্রষ্টা' এই আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণব-তোষণী নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামীর ভক্তি-ব্যাখ্যার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন; এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়ের পরম দার্শনিক জীব গোস্বামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে (বিশেষতঃ ভগবৎসন্দর্ভে ও পরমাত্মসন্দর্ভে) বারংবার শ্রীধর স্বামীর টীকা উদ্ধৃত করিয়া তাহার উপর স্বীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

চৈতন্য-সম্প্রদায় বা ইহার ধর্ম্মমতের আদি উৎস হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবত। যেমন শ্রী, ব্রহ্ম প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়-চতুষ্টয় এই মহাগ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ভক্তিবাদের প্রচার করিয়াছিল, তেমনি চৈতন্য-সম্প্রদায়ও স্বাধীনভাবে উক্ত গ্রন্থকে আপন ধর্ম্মমতের দার্শনিক ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল; অন্য কোনও প্রচলিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বা সাহায্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীধরী ব্যাখ্যা অনুসৃত হইলেও ইহার জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় চৈতন্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু শ্রীধরের ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ যে এক নূতন শ্রেণীর ভক্তিবাদী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রেরণা ও ভক্তির আদর্শ বাঙ্গালা দেশের এই নূতন সম্প্রদায়কে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন কোনও বিশিষ্ট বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব বা অন্তর্ভুক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। জীব

গোস্বামীর দার্শনিক গ্রন্থসমূহে অনেক স্থলে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে রামানুজ-মতাবলম্বী বলা যায় না। তেমনি কোন কোন মতের সাদৃশ্য বা ঋণ দৃষ্ট হইলেও, চৈতন্য-সম্প্রদায়কে নিম্বার্ক বা মাধ্ব সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণনা করা যায় না, এবং বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় ত ইহার প্রায় সমসাময়িক। চৈতন্যদেবের অনুচর ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থের আদি রচয়িতা বৃন্দাবনের গোস্বামী মহাশয়গণ, তৎপ্রেরিত হইয়া যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সম্প্রদায় মাধ্বমতাবলম্বী ছিল বলিয়া কোন কথাই পাওয়া যায় না। পরন্তু, জীব গোস্বামী তদীয় সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—ইহার কোন বাদকেই সম্প্রদায়-নিরূপিত বাদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রূপ গোস্বামী তাঁহার লঘু ভাগবতামৃতে মাধ্ব ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় উক্ত ভাষ্যমত দুই এক স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন; জীব গোস্বামীও তাঁহার ভগবৎ-সন্দর্ভাদিতে মাধ্ব-ভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতিবাক্য কয়েকস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি, জীব গোস্বামী তদীয় তত্ত্বসন্দর্ভে মধ্বাচার্য্যের বৈষ্ণবমতের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্ম তীর্থ ও ব্যাস তীর্থ, এই তিন মাধ্ব আচার্য্যের রচিত ক্রমান্বয়ে ভাগবত-তাৎপর্য্য, ভারত-তাৎপর্য্য ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য নামক গ্রন্থসমূহ হইতে তিনি উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মান্য এই তিন জন গোস্বামী কুত্রাপি মধ্বাচার্য্যদিগকে পূর্ব্ব-গুরু বলিয়া উল্লেখ বা স্বীকার করেন নাই।

মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির উল্লেখ একমাত্র বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহার গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রারম্ভে ও প্রমেয়-রত্নাবলীতে, মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের গুরু-পরম্পরার একটি তালিকা পাওয়া যায়; কিন্তু বলদেবের উক্তি ভিন্ন, চৈতন্যদেব ও মাধবেন্দ্র-পুরী প্রভৃতির মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সকল মাধ্ব আচার্য্যগণের নাম এই তালিকায় উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহাদের ঐতিহাসিক পরম্পরা বা কাল-নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার নহে; কিন্তু শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র রায় ইতিপূর্ব্বে উদ্বোধন পত্রিকায় (১৩৩৬-৩৭) দেখাইয়াছেন যে, এই তালিকায় মাধ্ব গুরুদিগের যে পৌর্ব্বাচার্য্য উক্ত হইয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট গোলযোগ রহিয়াছে। এই

তালিকার কিছু ঐতিহাসিকতা থাকিলেও মোটামুটি ইহা কল্পনাপ্রসূত অথবা অপর্য্যাপ্ত তথ্য অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই তালিকার অনুরূপ একটি গুরু-প্রণালিকা কবিকর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই দুই তালিকার এরূপ আক্ষরিক সাদৃশ্য আছে যে, তাহাতে মনে হয়, এই তালিকাটি বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুরের গ্রন্থে পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কারণ, কবিকর্ণপুর অন্যত্র তাঁহার চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের পঞ্চম অঙ্কে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেব অদ্বৈতবাদীদের তুরীয় আশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, উড়িষ্যা-নিবাসী বলদেব বিদ্যাভূষণ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, এবং চৈতন্যদেবের বহু পরবর্ত্তী। তিনি রূপ গোস্বামীর স্তবমালার যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ১৬৮৬ শকাব্দ (অথবা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) এইরূপ তারিখ দিয়াছেন। চরমা প্রাপ্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ঐক্যমত না দেখাইলেও তাঁহার বিবিধ গ্রন্থে মাধ্ব সম্প্রদায় ও তন্মতবাদের প্রতি তিনি স্পষ্ট অনুরাগ দেখাইয়াছেন। অতি আধুনিক সময়ে তিনি সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ও সর্ব্বজনমান্য দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু ছয় গোস্বামীর মত, তিনি চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ অনুচর ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার উক্তি বা মতবাদকে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক বা ঐতিহাসিক তথ্যের অভ্রান্ত নিদর্শক হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু বলদেব বিদ্যা-ভূষণের এই মাধ্ব অনুরাগের বোধ হয় একটি ঐতিহাসিক কারণ ছিল। এরূপ প্রবাদ আছে যে তাঁহার সময়ে অপেক্ষাকৃত নূতন চৈতন্য-সম্প্রদায়কে কোন্ প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করিতে হইবে এই প্রশ্ন লইয়া বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজে একটি বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং জয়পুর রাজ্যের গল্‌তা উপত্যকায় যে বৈষ্ণব সমাজের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বলদেব ইহার মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যে কেন ইহা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। মাধ্ব মতের প্রতি তাঁহার ত অত্যধিক অনুরাগ ছিলই; কিন্তু এই ব্যক্তিগত কারণ ছাড়িয়া দিলে মনে হয় যে, সেই সময়ে অর্ব্বাচীন গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে কোনও প্রাচীনতর সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা তিনি শ্রেয়স্কর পন্থা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গোবিন্দভাষ্য রচনার ইতিহাসও এই ঘটনার সহিত সংপৃক্ত। অদ্বৈত-

বাদের বিরুদ্ধে স্বকীয় বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ স্থাপন করিবার জন্য, পূর্ব্বতন সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই বেদান্ত-সূত্রের আপন মতানুযায়ী ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহা করেন নাই; কারণ তাঁহাদের মতে ব্যাস-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের আদি ও অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত নূতন চৈতন্য-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বেদান্ত-সূত্রের নূতন ভাষ্য রচনা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল; তাঁহার গোবিন্দ-ভাষ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণ এই অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই ভাষ্যের প্রারম্ভে যে মাধ্ব গুরু-পরম্পরার তালিকা বিবৃত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় এই ঘটনা-প্রসূত।

কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, মাধ্ব মতের সহিত চৈতন্য-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য নাই। ইহার স্মৃতি, দর্শন ও উপাসনাতত্ত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত শ্রীমদ্ভাগবতই ইহার ভক্তিবাদের প্রেরণার মূলে রহিয়াছে; সেইজন্য ইহার উৎপত্তি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত স্বাধীন-ভাবেই হইয়াছিল। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের তুরীয় আশ্রম গ্রহণ করিলেও, শ্রীধর স্বামী মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি শঙ্কর-সম্প্রদায়ীর মত, চৈতন্যদেব ভক্তিবাদী হইয়া, স্বীয় সাধনার বলে স্বসম্প্রদায়কে অতিক্রম করিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নূতন সম্প্রদায় বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এইজন্য চৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকায় আনন্দী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাঁহারই পার্ষদগণ সাম্প্রদায়িক গুরু, অন্য কেহ নহে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুঃ স্বয়ং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকস্তৎপার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো নান্যে)।

গোপাল ভট্ট

কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিলে, চৈতন্যদেবের অনুচর ও ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের যে-পরিচয় বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি বিক্ষিপ্ত, সামান্য ও অনিশ্চিত। কথিত আছে, চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় গোপাল ভট্ট শেষ জীবন রূপ-সনাতন প্রভৃতির সাহচর্য্যে বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই তাঁহার পুস্তকগুলির রচনা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে 'চৈতন্যচরিতামৃত'-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে নিশ্চয়ই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন; কারণ, উক্ত গ্রন্থে (আদি, ১।৩৭) বৃন্দাবন-গোস্বামীদের উল্লেখ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী গোপাল ভট্টকে আপনার অন্যতম শিক্ষাগুরু বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। কিন্তু আরও কয়েক বার (আদি, ৯।৪, ১০।১০৫ ; মধ্য, ১৮।৪৯) তাঁহার নাম গ্রহণ করিলেও কৃষ্ণদাস গোপাল ভট্ট সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। উক্ত আছে, বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের বশবর্ত্তী হইয়া গোপাল ভট্ট নিজের সম্বন্ধে কোনও বিবরণ লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে, অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দীর অধিক কাল পরে, নরহরি চক্রবর্ত্তী এই প্রবাদের কথা বলিয়া[1], তাঁহার স্বরচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এই ত্রুটি-সংশোধন উপলক্ষ্যে মুখ্যতঃ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আপাততঃ গোপাল ভট্টের পরিচয়ের প্রধান অবলম্বন। নরহরির বিবরণ হইতে জানা যায়, চৈতন্যদেবের সহিত গোপাল ভট্টের প্রথম সাক্ষাৎ ও তদনুগ্রহলাভ হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। গোপাল ভট্টের পিতা বেঙ্কট ভট্ট ছিলেন দক্ষিণ-দেশের এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল, তাহা নরহরি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ত্রিমল্ল, বেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ, এই তিন ভ্রাতা ছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক ও শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু চৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁহারা রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত হইয়া-

---

১। শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল ॥
কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে। নিরন্তর অতিদীন মানে আপনারে ॥
কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার। নামমাত্র লিখে অন্য না করে প্রচার ॥
('ভক্তিরত্নাকর', বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, মুর্শিদাবাদ, সন ১৩৩২, পৃঃ ১৫)

ছিলেন। এবং বেঙ্কটতনয় বালক গোপাল ভট্ট তাঁহার সেবক ও ভক্ত হইয়া, পরে রূপসনাতনের সহিত বৃন্দাবনে মিলিত হইবার স্বপ্নাদেশ সেই সময়ে লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে চৈতন্যদেব ভট্টগৃহে চারি মাস বাস করিয়াছিলেন, এবং তাহার নাকি

চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন।[২]

কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উল্লেখ করিয়া নরহরি স্বীকার করিয়াছেন যে—

গোপাল ভট্টের নাম অব্যক্ত সেথায়।

এবং স্বীয় উক্তির কৈফিয়ৎ স্বরূপ পুনরায় বলিয়াছেন—

অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল বেঙ্কটতনয়।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' এবং "অন্যত্র" এই প্রসঙ্গে যাহা পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। কবিকর্ণপূর তাঁহার সংস্কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে[৩] লিখিয়াছেন, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সময়ে শ্রীচৈতন্য শ্রীরঙ্গপুরীতে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারি মাস অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সূত্রে বেঙ্কট ভট্টের বা তৎপুত্র গোপাল ভট্টের কোনও উল্লেখ নাই। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে এ ঘটনার কোন কথা পাওয়া যায় না। যে সংস্কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃত'[৪] মুরারি গুপ্তের নামে প্রচলিত আছে, তাহাতে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারি মাস আতিথ্য গ্রহণের কথা আছে; কিন্তু সেখানে গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র নহে, ত্রিমল্লের স্বল্পবয়স্ক বালক পুত্র বলিয়া বর্ণিত! কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে (মধ্য, ১।১০৮-১০ ও ৯।৮২-১৬৩) প্রকাশ পায় যে, চৈতন্যদেব ত্রিমল্ল ও বেঙ্কট ভট্টের গৃহে ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ও চারি মাস বাস করিয়াছিলেন; উভয়েই শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ও শ্রীরঙ্গ-নিবাসী, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধের কোনও নির্দ্দেশ নাই, এবং গোপাল ভট্টের নামও অব্যক্ত! চৈতন্যদেবের অন্যান্য চরিতগ্রন্থে এ প্রসঙ্গ একেবারেই বর্ণিত হয় নাই।

তাহা হইলে, নরহরি চক্রবর্ত্তীর "অন্যত্র ব্যক্ত" এই কথার দ্বারা বোধ হয় বুঝিতে হইবে যে, এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে কোনও বিবরণ না থাকিলেও, তিনি ইহা অন্য কোনও অর্ব্বাচীন পুস্তকে পাইয়াছিলেন।

---

২ 'ভক্তিরত্নাকর', পৃঃ ৭।

৩ রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৩১৪।

৪ অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে মুদ্রিত (তৃতীয় মুদ্রাঙ্কণ, কলিকাতা, সন ১৩৩৭) ৩।১৫।১৪-১৬।

নিত্যানন্দ দাস-রচিত 'প্রেমবিলাসের' বর্ণনা[৫] সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অনুরূপ। ইহাতে পাওয়া যায়, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্লের গৃহে চাতুর্মাস্য করিবার সময় চৈতন্যদেব ত্রিমল্লের ভ্রাতা প্রবোধানন্দের উপর বালক গোপাল ভট্টের শাস্ত্রশিক্ষার ভার দেন, যাহাতে পরে গোপাল ভট্ট সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়া পিতা-মাতার বিয়োগান্তে বৃন্দাবনে গমন করিতে পারেন। এখানে বেঙ্কটের নাম উল্লিখিত হয় নাই; তাহাতে মনে হয়, নিত্যানন্দ দাসের মতে গোপাল ভট্ট ত্রিমল্লের পুত্র। মনোহর দাস রচিত 'অনুরাগবল্লী'[৬] গ্রন্থেও যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা নরহরির বর্ণনার সহিত প্রায় মিলিয়া যায়। মনোহর দাসের মতে ত্রিমল্ল জ্যেষ্ঠ, বেঙ্কট মধ্যম ও প্রবোধানন্দ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এবং গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। যখন চৈতন্যদেব ইঁহাদের গৃহে চারি মাস অতিথি হইয়াছিলেন, তখন গোপাল ভট্ট বালক নহেন, প্রাপ্তবয়স্ক। চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় তিনি পরে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। উপরোক্ত বিবরণগুলির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও যথেষ্ট অসংলগ্নতা ও অসঙ্গতি রহিয়াছে। নরহরিও যে এ-কথা জানিতেন না তাহা নহে। তবে বিরোধ সত্ত্বেও মহাজন-দের নিগূঢ় ও প্রাকৃত জনের দুর্ব্বোধ্য বাক্যের উপর অশ্রদ্ধা করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। (পৃঃ ১৪-১৫)—

শ্রীগোপাল ভট্টের এ সব বিবরণ। কেহ কিছু বর্ণে কেহ না করে বর্ণন॥

না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে। অপরাধ-বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে॥

তথাপি, ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চরিতাখ্যায়কগণের কেহ কেহ গোপাল ভট্টের দাক্ষিণাত্যে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য হয়ত জানিতেন না; অন্ততঃ এ-বিষয়ে তাঁহারা একমত নহেন। ইহা আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্যে যখন রূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হইবার স্বপ্নাদেশ পান, তখন কিন্তু চৈতন্যদেবের সহিত রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্তও হয় নাই! এ-বিষয়ে নরহরির বিবরণের মধ্যেও সঙ্গতির অভাব রহিয়াছে। গোপাল ভট্টের

৫ বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত, মুর্শিদাবাদ, সন ১৩১৮; অষ্টাদশ বিলাস দ্রষ্টব্য। ইহা ১৫২২ শকাব্দে রচিত বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু এই তারিখ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না।

৬ অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে মুদ্রিত (কলিকাতা, ১৮৯৮) পৃঃ ৮-১২। ইহা বৃন্দাবনে ১৬১৮ (=খ্রীঃ অঃ ১৬৯৬) শকে রচিত বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই।

সূচকে তিনি লিখিয়াছেন যে, রূপ-সনাতনের বৃন্দাবনে আগমনের পূর্ব্বেই গোপাল ভট্ট সেখানে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ সনাতন। গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন।

'প্রেমবিলাসে'র মতে গোপাল ভট্ট পরে আসিয়া রূপ ও সনাতনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-যাত্রার সময় কোনও বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহার অনুগামী না হওয়ায়, ইহা কিছুই বিচিত্র নয় যে, পরবর্ত্তী কালে যে সকল বর্ণনা লেখা হইয়াছিল, তাহা নানাবিধ কল্পনা ও জনশ্রুতির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ তথ্যজ্ঞানের অভাব স্বীকার করিয়াছেন, এবং নরহরিও এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন (পৃঃ ১৫)—

প্রাচীন বৈষ্ণবমুখে এ সব শুনিল।

বর্ত্তমান কালেও এই বিষয়ে নানারূপ মতবাদের অভাব নাই। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ও তাঁহার অনুবর্ত্তিতায় জগদ্বন্ধু ভদ্র ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রচার করিয়াছেন যে, গোপাল ভট্টের তথাকথিত পিতা বেঙ্কট ভট্ট এবং বেদান্ত-পরিভাষার রচয়িতা ধর্ম্মরাজাধ্বরির গুরু বেলগুণ্ডি-নিবাসী বেঙ্কট ভট্ট বা বেঙ্কটনাথ একই ব্যক্তি। কিন্তু নামের সাদৃশ্য ভিন্ন ইহার সপক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই। বেঙ্কট এই নামটি দাক্ষিণাত্যে অসাধারণ নহে, সুতরাং অভিন্নতা প্রমাণ করিতে হইলে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, গোপাল ভট্টের আদিনিবাস ছিল ভট্টমারি নামক কোনও গ্রামে; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে (মধ্য, ১।১১২ ; ৯।২২৪, ২২১-২৩০ ইত্যাদি) ভট্টমারি (পাঠান্তর 'ভট্টথারি') কোনও স্থানের নাম নহে, একদল ভণ্ড সাধুর নাম বলিয়া দেওয়া আছে, যাহাদের চৈতন্যদেব মল্লারদেশে (মালাবর ?) দেখিয়াছিলেন।

গোপাল ভট্টের পিতৃব্য বলিয়া প্রবোধানন্দের উল্লেখ আরও রহস্যজনক। ইহা কেবল মনোহর দাস ও নরহরির কল্পনা বা শোনা কথা বলিয়া মনে হয়। 'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের[৭] প্রথমেই গোপাল ভট্ট আপনাকে প্রবোধানন্দের

৭ ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।

গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সংতোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥

(রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, দিগ্‌দর্শনী টীকা সমেত, মুর্শিদাবাদ, সন ১২৯৬, ১২৯৮)।

শিষ্য বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন, কিন্তু নিজের বংশ-পরিচয় বা প্রবোধানন্দের সহিত আত্মীয়তার কোনও কথা বলেন নাই। তিনি প্রবোধানন্দকে 'ভগবৎ-প্রিয়' এই বিশেষণের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন; টীকাকার এই সমস্ত পদটি বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ, এই দুই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদি তৎপুরুষ হিসাবে লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রবোধানন্দ চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন, এইরূপ অর্থ হয়; এবং তাহা যদি হয়, তবে গোপাল ভট্টকে এই ভাবে চৈতন্যদেবের প্রশিষ্য বলিয়া গণনা করিতে হয়। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চৈতন্যদেবের কোনও চরিতগ্রন্থে বা মনোহর দাস ও নরহরির উল্লেখ ভিন্ন অন্য কোনও বৈষ্ণব-বিবরণে, গোপাল ভট্টের পিতৃব্য অথবা চৈতন্যদেবের ভক্ত হিসাবে প্রবোধানন্দের নাম পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। প্রবোধানন্দ বা প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামে কতকগুলি সংস্কৃত স্তোত্রকাব্য রহিয়াছে; তাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবভাব ও চৈতন্যানুরক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' অন্যান্য গ্রন্থগুলির অপেক্ষা অধিকতর সুপরিচিত[৮]; ইহাতে ১৪৩ শ্লোকে স্তুতি, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, অবতার প্রভৃতি দ্বাদশ বিভাগে চৈতন্যের বন্দনা ও গুণকীর্ত্তন রহিয়াছে। তাঁহার পঞ্চদশসর্গাত্মক 'সঙ্গীতমাধব'[৯] জয়দেবের অনুকরণে গীতিবহুল এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় পর্য্যবসিত। 'বৃন্দাবন-

৮ আনন্দীরচিত টীকা সহিত রাধারমণ প্রেসে মুদ্রিত (মুর্শিদাবাদ, ১৩৩৪)। ইণ্ডিয়া অফিস, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউট্ প্রভৃতি গ্রন্থাগারে রক্ষিত এই পুস্তকের শ্লোকসংখ্যার সহিত মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোকসংখ্যার মিল নাই; পাঠভেদও আছে। ৩৮ শ্লোকের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে স্তোত্রকার চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৩২ শ্লোকে চৈতন্যদেবকে 'গৌরনাগরবর' বলা হইয়াছে; অনেকের মতে ইহা নরহরি সরকার ও লোচনদাসের বর্ণিত নাগরভাবের অনুরূপ এবং সকলের রুচিগ্রাহ্য হয় নাই। সেই জন্য প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে প্রবোধানন্দের নাম বাদ পড়িয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট কিরূপে তাঁহাকে গুরু বলিয়া ব্যক্ত করিলেন?

৯ ভক্তিপ্রভা-কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত (আলাটী, হুগলী, সন ১৩৪৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের যে পুঁথি আছে (নং ১৪০২), তাহাতে ১৫টি সর্গ আছে; মুদ্রিত পুস্তকের ষোড়শ সর্গের যে চারিটি অধিক শ্লোক আছে, তাহা পুঁথিতে পঞ্চদশ সর্গের পুষ্পিকার পরে পাওয়া যায়; পৃথক্ সর্গে নিবদ্ধ নহে। গীতিগুলির শ্লোকানুক্রম ছাড়িয়া দিলে পুঁথির শ্লোকসংখ্যা ১৪১।

মহিমামৃত'[১০] নামক আর একটি শতক-কাব্য তাঁহার নামে প্রচলিত আছে ; ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়—নানাবিধ ছন্দে কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের বর্ণনা। ইহা নাকি এক শত শতকে লিখিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ষোলটি মাত্র শতক পাওয়া গিয়াছে ও মুদ্রিত হইয়াছে ; ইহাতেও প্রারম্ভে চৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া রহিয়াছে।[১১] কিন্তু আত্মীয়তার কথা দূরে থাকুক, এই পরিব্রাজকাচার্য্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে গোপাল ভট্টের গুরু ছিলেন, মনোহর দাস ও নরহরির উক্তি ভিন্ন তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

দীনেশচন্দ্র সেন-প্রমুখ দু-এক জন লেখক গোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দকে 'বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী'র রচয়িতা প্রকাশানন্দের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রবোধানন্দের সহিত কাশীতে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার কৃপায় প্রবোধানন্দ এই নাম প্রকাশানন্দে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তির সপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই।

১০ হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী (হরিদাস বাবাজী), নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, দীনেশচরণ দাস প্রভৃতির সম্পাদনায় বৃন্দাবনে ১৩৪০-৪৫ সনে প্রকাশিত। শতকগুলি বাস্তবিক পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড, এবং অনেক শতকে শতাধিক শ্লোকও রহিয়াছে। হেবর্লিন প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে (খ্রীঃ অঃ ১৮৪৭, পৃঃ ৪৩০) মুদ্রিত এবং জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক স্বীয় কাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে (৩য় সং, কলিকাতা ১৮৮৮, পৃঃ ৩৩৩-৮৪) পুনর্মুদ্রিত ১২৬ শ্লোকাত্মক এবং একটি শতকে সমাপ্ত যে বৃন্দাবন-শতক পাওয়া যায়, তাহাতে প্রবোধানন্দের নাম নাই, কিন্তু চৈতন্য-বন্দনা আছে। উপরোক্ত অধুনাতন ষোলটি শতকসংগ্রহে এই শতকটি নাই। অনেকগুলি পুঁথির তালিকায় বৃন্দাবনশতকের উল্লেখ আছে, তাহা বোধ হয় একটি শতকে সমাপ্ত এই গ্রন্থ।

১১ আরও দুইটি গ্রন্থ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামে পাওয়া যায়, যথা—'বিবেকশতক' রাজেন্দ্রলাল মিত্র, *Notices*, vii, p. 261, no. 2510) ও 'গোপালতাপনী'র টীকা (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুঁথির তালিকা, vol. x, pp. 158-59)। হুগলী ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় হইতে দুই খণ্ডে (২য় সং ১৩৩১, ১৩৪২) 'রাধারসসুধানিধি' নামক যে গ্রন্থ প্রবোধানন্দের নামে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা প্রবোধানন্দের রচিত নহে। ইণ্ডিয়া অফিস, বডলিয়ন্ ও কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ইহার যে সকল পুঁথি আছে, তাহাতে ব্যাসপুত্র হিতহরিবংশ ইহার রচয়িতা বলিয়া বর্ণিত। হিতহরিবংশ রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুদ্রিত পুস্তকে যে প্রথম ও শেষ শ্লোকে চৈতন্যবন্দনা আছে, তাহা উক্ত পুঁথিগুলিতে নাই। মুদ্রিত গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ২৭২, কিন্তু পুঁথিগুলির শ্লোকসংখ্যা অন্যরূপ।

'মুক্তাবলী'র প্রণেতা ছিলেন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জ্ঞানানন্দের শিষ্য; এবং তিনি যে চৈতন্যমতাবলম্বী ছিলেন, তাহার কোনও পরিচয় উক্ত গ্রন্থে নাই। কাশীতে কোনও প্রবোধানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের মিলন হয় নাই। যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসপরিপন্থী নৃত্যগীতাদির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, তিনি যে মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দ, তাহা কোনও চৈতন্যচরিতগ্রন্থে নাই। পরন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, চৈতন্যদেবের ভক্তির উৎস কাশীর মত জ্ঞানপ্রধান স্থানকে ভাসাইয়া লইতে পারে নাই। কারণ, চৈতন্যের মুখে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলাইয়াছেন (মধ্য, ২৫।১৬১-৬২)—

কাশীতে বেচিতে আমি আইলাম ভাবকালি॥
কাশীতে গ্রাহক নাই বস্তু না বিকায়।

বৃন্দাবন দাস এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু প্রকাশানন্দ যদি চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে প্রকাশানন্দের সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস যে রুক্ষ ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন (মধ্য, ৩ ও ২০), তাহা নিতান্ত অসমীচীন ও অবৈষ্ণবোচিত। মুরারি গুপ্ত বা কবিকর্ণপুর প্রকাশানন্দের নামও করেন নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, গোপাল ভট্টের যে-ইতিহাস বাংলা বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা একেবারেই পরিষ্কার বা সুসঙ্গত নহে, কিন্তু এইখানেই সমস্যার শেষ নহে। 'হরিভক্তিবিলাস' যে গোপাল ভট্টের সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা, তাহাতেও সন্দেহ রহিয়াছে; কিন্তু সে-কথা পরে বলিতেছি। 'হরিভক্তিবিলাস' ভিন্ন আর একটি রচনা ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের বলিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী ও মনোহর দাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সম্বন্ধেও যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বিপরীত। এই রচনাটি হইতেছে লীলাশুক-রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' স্তোত্রকাব্যের কৃষ্ণবল্লভা নাম্নী টীকা। নরহরি চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন (পৃঃ ১৬)—

করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরমানন্দ যাহা শুনি॥

ইহার পূর্ব্বে মনোহর দাস আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন (পৃঃ ১১-১২)—

শ্রীভট্ট গোসাঞি কর্ণামৃতের টীকা কৈল।
অশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা তাহাতে লিখিল॥

যাহার দর্শনে ভক্ত পণ্ডিতে চমৎকার।
রসপরিপাটী যাতে সিদ্ধান্তের সার॥
সে টীকার মঙ্গলাচরণ দুই শ্লোক।
লিখিয়াছে যাহা দেখি শুনি সর্ব্বলোক॥
আপনা পাসরে রহে চকিত হইয়া।
পুলকিত অশ্রু বহে মুখ বুক বাঞা॥

ইহার পরে, 'তথাহি শ্লোকৌ' বলিয়া তিনি উক্ত টীকার দুই আদিশ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই দুইটি শ্লোক গোপাল ভট্টের রচিত কৃষ্ণবল্লভা টীকার সমস্ত পুঁথিতে[১২] প্রারম্ভে অবিকল পাওয়া যায়। ইহার প্রথম শ্লোকটি কৃষ্ণবন্দনা; দ্বিতীয় শ্লোকটিতে গ্রন্থকার নিজেকে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন[১৩]; কিন্তু এই টীকায় চৈতন্যদেবের নমস্ক্রিয়া নাই; এবং টীকার শেষে টীকাকার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত বঙ্গীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থোক্ত পরিচয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্লোকটি এইরূপ—

শ্রীমদ্দ্রাবিড়নীবৃদম্বুদবিধুঃ শ্রীমান্নৃসিংহোঽভব-
ভট্টঃ শ্রীহরিবংশ উত্তমগুণগ্রামৈকভূস্তৎসুতঃ।
তৎপুত্রস্য কৃতিস্ত্বিয়ং বিতনুতাং গোপালনাম্নো মুদং
গোপীনাথপদারবিন্দমকরন্দানন্দিচেতোলিনঃ॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, দ্রাবিড়বাসী হরিবংশ ভট্ট টীকাকার গোপাল ভট্টের পিতা এবং নৃসিংহ তাঁহার পিতামহ। টীকার পুষ্পিকার পাঠও তদনুরূপ, যথা: ইতি শ্রীদ্রাবিড়হরিবংশভট্টৈকচরণশরণগোপালভট্টবিরচিতা

---

১২ কৃষ্ণকর্ণামৃতের মূল এবং চৈতন্যদাসের সুবোধনী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকাদ্বয় সহিত কৃষ্ণবল্লভা টীকার একটি সংস্করণ বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক, পাঠভেদ, বিস্তৃত ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও সূচী সমেত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৩৮)। কৃষ্ণবল্লভা টীকার জন্য কাশী সংস্কৃত গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৬৬২ সংবতে লিখিত প্রাচীন পুঁথি এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির অন্য একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুঁথি, এই দুইটি দেবনাগরাক্ষরে লিখিত সম্পূর্ণ পুঁথি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত খণ্ডিত পুঁথি, সর্ব্বসমেত তিনখানি পুঁথি অবলম্বিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সকল সমস্যার সূচনা করা হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এই সংস্করণের ভূমিকাদিতে দ্রষ্টব্য।

১৩ কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্। গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জরঃ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সমাপ্তা॥—বলা বাহুল্য, এরূপ কোন শ্লোক বা পুষ্পিকা 'হরিভক্তিবিলাসে' নাই। মনোহর ও নরহরির মতে যদি এই দুই গোপাল ভট্ট একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে বেঙ্কট-ত্রিমল্ল-প্রবোধানন্দের গল্প একেবারেই উড়িয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভা টীকার কথা অন্য কোনও বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই।

হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও কৃষ্ণবল্লভার রচয়িতা গোপাল ভট্টের আরও দুইটি পুস্তকের পুঁথির সন্ধান আমরা পাইতেছি, যাহাতে উল্লিখিত শ্লোক বা অনুরূপ পুষ্পিকা রহিয়াছে। ইহার প্রথমটি হইতেছে, ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের রসিকরঞ্জনী টীকা।[১৪] ইহারও দ্বিতীয় শ্লোকের পরিচয়ে[১৫] তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে, এবং ইহার একটি সমাপ্তি-শ্লোক কৃষ্ণবল্লভার উপরোদ্ধৃত শ্লোকের (শ্রীমদ্দ্রাবিড়) সহিত অভিন্ন বলিয়া ইনিও যে হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃহিংহের পৌত্র, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ইহার পুষ্পিকাও কৃষ্ণবল্লভার পুষ্পিকার অনুরূপ।[১৬] গ্রন্থকার আলঙ্কারিক ও রসশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবল্লভাতে যেরূপ রূপগোস্বামি-বিরচিত চৈতন্য-সম্প্রদায়ের রসশাস্ত্র উল্লিখিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতে তাহা নাই, এবং বৈষ্ণব ভাবের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কৃষ্ণবল্লভার মত এ-টীকাতেও চৈতন্যবন্দনা নাই। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য, এই টীকার বাংলা অক্ষরে লিখিত কোনও পুঁথি এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই—সবই দেবনাগরাক্ষরে লিখিত।[১৭]

১৪ এই টীকা সম্বন্ধে মল্লিখিত *Sanskrit Poetics*, vol i, p. 252 দ্রষ্টব্য।

১৫ শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ব্রাহ্মণপর্বণা। ক্রিয়তে রসমঞ্জর্য্যাষ্টীকা রসিকরঞ্জনী॥

১৬ ইতি হরিবংশভট্টৈকচরণশরণগোপালভট্টকৃতা রসমঞ্জরীটীকা রসিকরঞ্জনী সমাপ্তা।

১৭ যথা Mitra, Notices, iv p. 294 no. 1712; Mitra. Catalogue of Skt. MSS, in the Library of the Maharaja of Bikaner (Calcutta 1880), p. 709, no. 1573; Eggeling, Descriptive Catalogue of Skt. MSS in the India Office Library, iii, p. 357, no. 1228-29; Stein, Catalogue of Skt. MSS in the Raghunath Temple Library of of Jammu (Bombay 1894), p. 63, no. 748; Hultzsch, Report on the Search of Skt. MSS in Southern India (Madras 1896), iii, p, 48. no, 1251; Peterson, Sixth Report, p. 92, no. 377; R. G. Bhandarkar, Report of 1891-95. p. 46, no. 705. শেষোক্ত তালিকাদ্বয়ের

রাজেন্দ্রলাল মিত্র[১৮] এই গোপাল ভট্ট-রচিত 'সময়কৌমুদী' অথবা 'কালকৌমুদী' নামক এক স্মৃতিগ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন। ইহার একটি প্রারম্ভ-শ্লোকও[১৯] কৃষ্ণবল্লভা ও রসিকরঞ্জনীর দ্বিতীয় শ্লোকের অনুরূপ; তাহাতে গোপাল ভট্ট গ্রন্থের রচয়িতা ও তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, এই কথা পাওয়া যায়। ইহার পুষ্পিকাও[২০] বিভিন্নরূপ নয়। সংস্কৃত গদ্যে ও পদ্যে লিখিত এই পুস্তকের উদ্দেশ্য হইতেছে নিত্যনৈমিত্তিক আচার, সংস্কার, দীক্ষা, ব্রত, উৎসব (যথা জন্মাষ্টমী), ভগবৎ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য উপযুক্ত শুভ মুহূর্ত্ত, দিন বা মাসের নির্দ্ধারণ। পুঁথিখানি ছাপা হয় নাই, কিন্তু বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহাতে ১২৪টি পত্র (folio) ছিল, পৃষ্ঠায় ৯ লাইন। সুতরাং বইটি খুব ছোট বা সামান্য ছিল না, এরূপ অনুমান অন্যায় হইবে না।

এই গোপাল ভট্ট যে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের গোপাল ভট্ট হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। মনোহর দাস কৃষ্ণবল্লভার প্রথম দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু যে-অন্তিমশ্লোক ও পুষ্পিকায় টীকাকারের বংশপরিচয় রহিয়াছে, তাহার খবর বোধ হয় জানিতেন না। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপাল ভট্টকে স্বীয় শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি 'কৃষ্ণবল্লভা' তাঁহার শিক্ষাগুরু গোপাল ভট্টের রচিত হয়, তবে ইহা বিস্ময়কর যে, কৃষ্ণদাস স্বয়ং কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারঙ্গরঙ্গদা নামক যে-টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই কৃষ্ণবল্লভা টীকা অভিহিত বা অনুসৃত হয় নাই; বরং কৃষ্ণদাস চৈতন্যদাসের প্রায়

দুইটি পুঁথি (no. 453 of 1887-91 and no. 705 of 1891-95) এবং স্বতন্ত্র সংগৃহীত আরও দুইটি পুঁথি (no. 244 of Visrambag i and no. 207 of Visrambag i) পুনা ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটে আমরা দেখিয়াছি।—বোম্বাই নির্ণয়সাগর মুদ্রাযন্ত্রের কাব্যমালা পর্য্যায়ে রুদ্রভট্টের শৃঙ্গারতিলকের যে সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার পাদটীকায় (গুচ্ছক ৩, পৃঃ ১১১) গ্রন্থের সম্পাদক গোপাল ভট্ট-রচিত রসতরঙ্গিণী নামক শৃঙ্গারতিলকের একটি টীকার নাম করিয়াছেন; কিন্তু ইহার অন্য কোনও বিবরণ বা পুঁথির সংবাদ পাওয়া যায় না।

১৮ *Notices*, vii, p. 254, no. 2501. পুঁথিখানি খুব প্রাচীন নহে, কিন্তু বঙ্গাক্ষরে লিখিত।

১৯ শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ব্রাহ্মণজন্মনা। ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ রম্যা সময়কৌমুদী॥

২০ ইতি হরিবংশভট্টচরণশরণগোপালভট্টকৃতা কালকৌমুদী সমাপ্তা॥

সমসাময়িক টীকাকে আত্মসাৎ করিয়া বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই কৃষ্ণবল্লভা টীকা যে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের কোনও বৈষ্ণব কর্ত্তৃক লিখিত, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব মত বা মূলের দাক্ষিণাত্য পাঠ ইহাতে গৃহীত হয় নাই, বরং বঙ্গীয় পাঠ ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব মত স্পষ্ট অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ অবতার নহেন, অবতারী স্বয়ং ভগবান্, চৈতন্য-সম্প্রদায়ের এই যে বিশিষ্ট মতবাদ, তাহা টীকায় উক্ত হইয়াছে। দ্বিভুজ নরাকৃতি, কিশোরমূর্ত্তি, বৃন্দাবনকেলিকার কৃষ্ণের উপাসনাতেও টীকাকার ভক্তিমান্। চৈতন্য-নমস্ক্রিয়ার অভাব সন্দেহ-জনক হইলেও, নিশ্চিত প্রমাণ নহে; কারণ, রূপ গোস্বামীর দুইটি দূতকাব্য ও 'দানকেলিকৌমুদী' নাটকেও এইরূপ নমস্ক্রিয়া নাই। টীকাকার যে বঙ্গীয় বৈষ্ণবমতের সহিত পরিচিত, তাহার আর একটি নিদর্শন এই যে, রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' এই দুইটি চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক রসগ্রন্থ এই টীকাতে নামোল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'ভক্তিরসামৃতে'র রচনার তারিখ ১৪৬৩ শকাব্দ; সুতরাং ইহার পূর্ব্বে এই টীকা লিখিত হয় নাই। যদি ত্রিমল্ল-বেঙ্কট-প্রবোধানন্দের উপাখ্যান বাদ দেওয়া যায়, তবে দুই গোপাল ভট্টের একাত্মতা স্বীকার একেবারে অসম্ভব নয়।

অন্য দিকে ষড়্গোস্বামীর অন্যতম চৈতন্য-সম্প্রদায়ের গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত 'হরিভক্তিবিলাসে', রচয়িতা তাঁহার পিতৃপিতামহের নাম উল্লেখ করেন নাই; কেবল চৈতন্য-নমস্ক্রিয়াপূর্ব্বক আপনাকে প্রবোধানন্দের শিষ্য এবং রূপ-সনাতন-রঘুনাথদাসের প্রীতিকামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহার রচনাভঙ্গীও স্বতন্ত্র। ইহা বিশটি বিলাসে বিভক্ত সুবৃহৎ বৈষ্ণবস্মৃতির সংগ্রহ-গ্রন্থ। ইহাতে যুক্তিতর্ক নাই; বৈধী ভক্তির অঙ্গস্বরূপ প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবোচিত সদাচার, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, পূজাপদ্ধতি, মন্দির-সংস্কার, মূর্ত্তিগঠন ও মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, ব্রতপার্ব্বণ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মের বিধিনিষেধ নির্দ্ধারিত ও সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এবং প্রত্যেক বিধিনিষেধের প্রমাণস্বরূপ বহুসংখ্যক স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ইত্যাদি হইতে বচন সঙ্গে সঙ্গে সংকলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইহাতে এমন কতকগুলি মত ব্যক্ত হইয়াছে, যাহা ঠিক চৈতন্য-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত বলা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইহাতে চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীনারায়ণের বীজমন্ত্র, জপ ও উপাসনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শূদ্রের শালগ্রামশিলা উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মূর্ত্তিগঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তিনির্ম্মাণের কথা নাই। এই কৃষ্ণ চক্রধররূপে বর্ণিত, দ্বিভুজ মুরলীধর নহেন। এমন কি, কৃষ্ণের ধ্যানে রাধার উল্লেখ নাই, যদিও প্রথমেই বৈষ্ণব দীক্ষার কথা আছে। গ্রন্থের উপর তন্ত্রের প্রভাব প্রচুর ও স্পষ্ট। উৎসব ও পার্ব্বণের মধ্যে, বৈষ্ণবগ্রাহ্য শিবরাত্রি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু (রঘুনন্দনের যাত্রাতত্ত্বেও অনুক্ত) রাসযাত্রা বর্জ্জিত হইয়াছে।[২১]

'হরিভক্তিবিলাস' যে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের গোপাল ভট্টের রচনা, তাহা গ্রন্থের আদিতে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত আছে, এবং তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। রূপ গোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতে' ইহার নামোল্লেখপূর্ব্বক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং ইহা ভক্তিরসামৃতের রচনাকালের (শকাব্দ ১৪৬৩) পূর্ব্বেই সংকলিত হইয়াছে। 'হরিভক্তিবিলাসে'র 'দিগ্‌দর্শনী' নামক একটি সংক্ষিপ্ত টীকাও আছে; তাহা সনাতন গোস্বামীর লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু টীকাতে টীকাকারের নাম নাই। তথাপি মনোহর দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে শুধু টীকা নহে, মূলগ্রন্থও গোপাল ভট্টের ব্যপদেশে মুখ্যতঃ সনাতনের রচনা।[২২] নরহরি বলিতেছেন—

---

২১ 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' ও সংস্কারদীপিকা' নামক আরও দুইটি স্বল্পায়তন বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ বর্ত্তমান কালে গোপাল ভট্টের নামে গৌড়ীয় মাধ্ব মঠ হইতে ছাপা হইয়াছে; কিন্তু এগুলি দুই গোপাল ভট্টের কাহারও রচিত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমটিতে 'হরি-ভক্তিবিলাসে' অনুক্ত বিবাহাদি চতুর্দ্দশ সংস্কারের বিবরণ আছে; দ্বিতীয়টিতে বেশাশ্রয়বিধি অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের পালনীয় ধর্ম্মাদির কথা আছে। মনে হয়, 'হরিভক্তিবিলাসে' যে-যে বিষয় বিবৃত হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পরবর্ত্তীকালে এই দুইটি স্মৃতিসংগ্রহ সংকলিত হইয়া গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম পুস্তকের পুঁথির সন্ধান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সংকলিত *Notices*, 2nd Series, i, no. 397; ii, p. 209-10, no. 235, এই বিবরণে পাওয়া যায়; কিন্তু দ্বিতীয় পুস্তকের কোনও পুঁথির খবর পাওয়া যায় না। 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' প্রথমে 'সজ্জনতোষিণী' পত্রিকায় (১৫-১৭ খণ্ডে) কেদারনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে, সংস্কারদীপিকা সমেত, দ্বিতীয় সংস্করণ গৌড়ীয় মাধ্ব মঠ হইতে (কলিকাতা, ১৯৩৫) মুদ্রিত হইয়াছে।

২২ নিত্যানন্দের মত পরিষ্কার নয়, তবে তাঁহার কথা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, রূপ ও সনাতনের আজ্ঞায় গোপাল ভট্ট এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

করিতে বৈষ্ণবস্মৃতি হইল ভট্টমনে।
সনাতন গোস্বামী জানিলা সেহ ক্ষণে॥
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিলা শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন।

মনোহর দাস আরও বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন যে, মূল গ্রন্থটি সনাতনের লেখা, কিন্তু গোপাল ভট্ট পুরাণের বাক্য সঙ্কলন করিয়া ইহার বিস্তার রচনা করিয়াছিলেন—

শ্রীসনাতন গোসাঞি গ্রন্থ করিল।
সর্ব্বত্র আভোগ ভট্ট গোসাঞির দিল॥…
শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ দাস।
ইহা সভায় সুখ দিতে হরিভক্তির বিলাস॥
সংগ্রহ করিল শ্রীভাগবত-প্রধান।
সর্ব্ব পুরাণের বাক্য করিয়া সন্ধান।

কৃষ্ণদাস কবিরাজও (মধ্য, ১৷৩৫ ; অন্ত্য, ৪৷২২১) 'হরিভক্তিবিলাস' সনাতনের লেখা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং মধ্যলীলার চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ইহার সমগ্র মর্ম্মার্থ সনাতনের শিক্ষাচ্ছলে চৈতন্যের মুখে বলাইয়াছেন। ইহা ছাড়া, ভাগবতের লঘু বৈষ্ণবতোষিণী টীকার অন্তে জীব গোস্বামী সনাতনের রচিত গ্রন্থগুলির যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও 'হরিভক্তিবিলাস' ও তাহার টীকা সনাতনের রচনা বলিয়া ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস ও জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না; কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কুত্রাপি সনাতনকে গ্রন্থকার বলা হয় নাই; বরং গোড়াতেই গোপাল ভট্ট স্বীয় নাম গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, তিনি এই গ্রন্থ রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাসের সন্তোষার্থে লিখিতেছেন। এই বিরোধ পরিহারের কোনও উপায় নাই। ইহা সম্ভব যে, স্বসম্প্রদায়ের অগ্রণী সনাতন স্বীয় সহকর্ম্মী ও সুহৃৎ গোপাল ভট্টকে এই গ্রন্থ রচনায় (টীকা লেখা ছাড়া অন্যরূপেও) বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উল্লেখ ইহাতে কোথাও নাই; এরূপ সহায়তা যে গোপাল ভট্ট অনুক্ত রাখিয়া যাইবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অবশ্য, এই সকল সংসারত্যাগী ভক্ত বৈষ্ণবগণ নিজ নাম প্রচারে উৎসাহী ছিলেন না; কিন্তু জীব গোস্বামী স্বীয় 'ষট্‌সন্দর্ভ', ভট্টলিখিত সংক্ষেপের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন বলিয়া ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। অথচ সনাতনের ঋণ গোপাল ভট্ট স্বীকার না করিয়া

আত্মনাম জ্ঞাপন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া মনে হয়। এই সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,[২৩] সনাতনের নাম 'হরিভক্তিবিলাসে'র রচনার সঙ্গে স্পষ্টভাবে জড়িত করা হয় নাই, তাহার কারণ, তিনি যবন-সংসর্গে আসিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন, এবং হয়ত সেই জন্য সনাতনের নামে বৈষ্ণব সদাচারের গ্রন্থ প্রচার করিলে ইহার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় গোপাল ভট্টের নামই গ্রন্থকারের বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এরূপ কল্পনায় সর্ব্বপূজ্য বৈষ্ণব গোস্বামীদের উপর যে হীন চক্রান্ত বা বঞ্চনার অভিপ্রায় আরোপ করা হয় তাহা ছাড়িয়া দিলেও, এই কল্পনার মূলে কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। সনাতনের নাম যদি এরূপ বর্জ্জনীয় ছিল, তাহা হইলে তাঁহার ভাগবতের টীকা ও 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত' কিরূপে অশেষ শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্ববৈষ্ণব-গ্রাহ্য হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না; এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ নাম রূপ, জীব, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির গ্রন্থের সহিত জড়িত হইয়া তাহাদের দূষিত করে নাই, বরং ভূষিত করিয়াছে। সনাতন ও রূপ যে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিচ্যুত হইয়াছিলেন, এই গল্পের কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। ইহা সত্য যে, তাঁহারা মুসলমান দরবারে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং চৈতন্য-দেবের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে মুসলমানী নাম বা খেতাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে ইহার অধিক কোনও অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। জীব গোস্বামী রূপ-সনাতনের বংশ-পরিচয়ে তাঁহাদের কর্ণাট-ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত বলিয়াছেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র বাক্য (পৃঃ ৪২-৪৩) যদি সত্য হয়, তবে তাঁহারা মুসলমান দরবারে চাকুরী করিলেও, পরম্পরাগত পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা বা শাস্ত্রালোচনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না, এবং সামাজিক সম্বন্ধ ও আচার-ব্যবহারের জন্য রামকেলির নিকট বহু কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়িয়া দিলেও, চৈতন্য-দেবের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেও তাঁহারা যে নবদ্বীপের বিদ্যাবাচস্পতির শিষ্য, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলিয়াছেন—

---

২৩ *Vaisnava Literature*, Calcutta University 1917, pp. 37-38; *Chaitanya and his Age*, Calcutta University 1922, p. 290, Kennedy, *Chaitanya Movement*, Oxford Univ. Press, 1925, p. 137-এ ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লইয়া।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া ॥

পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণলীলা ও বৈষ্ণব মতের প্রতি প্রবণতা ছিল বলিয়াই চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁহাদের যে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, তাহা বুঝা যায়। এবং তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে যে অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় রহিয়াছে, তাহা দু-চারি দিনের শিক্ষায় আয়ত্ত হয় নাই, আজীবনের ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের ফল বলিয়াই মনে হয়।

উল্লিখিত সমালোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে, চৈতন্য-সম্প্রদায়ের গোপাল ভট্টের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ ও মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহা তথ্যদর্শী ঐতিহাসিককে সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে ও অন্যান্য স্থান হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে এইরূপ দাঁড়ায়—

(১) 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের'র 'কৃষ্ণবল্লভা' টীকা, 'কালকৌমুদী' এবং 'রসমঞ্জরী'র 'রসিকরঞ্জনী' টীকা যে গোপাল ভট্ট লিখিয়াছেন, আত্মপরিচয় অনুসারে তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ, হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহ ভট্টের পৌত্র। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলিতে এই সম্প্রদায়ের মতবাদ বা উহার রসশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই। বরং তাহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং 'কৃষ্ণকর্ণা-মৃতে'র দাক্ষিণাত্য পাঠ নহে, বঙ্গীয় পাঠই তাঁহার টীকায় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং যদি নরহরি প্রভৃতি-কথিত বংশপরিচয় বর্জ্জন করা যায়, তবে ইঁহার সহিত পরবর্ত্তী গোপাল ভট্টের ঐক্য স্বীকার কঠিন নয়।

(২) তবে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম যে গোপাল ভট্টের নামে 'হরিভক্তি-বিলাস' প্রচলিত, তিনি উপরোক্ত গোপাল ভট্টের সহিত অভিন্ন, তাহারও কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই। তাঁহার পরিচয় অস্পষ্ট ও ইতিহাস জনশ্রুতিমূলক, এবং বিভিন্ন জনশ্রুতির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব রহিয়াছে। তিনি দাক্ষিণাত্যোদ্ভব ছিলেন কি না, তাহাও অনিশ্চিত, এবং তাঁহার যে বংশপরিচয় ও বৃত্তান্ত বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাতে যথেষ্ট অসঙ্গতি ও বিরোধ রহিয়াছে। 'হরিভক্তিবিলাসে' তিনি নিজেকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলিয়াছেন, কিন্তু বংশপরিচয় দেন নাই। এই প্রবোধানন্দের ইতিবৃত্ত অতি সামান্য, এবং ইনি স্তোত্রকাব্য-লেখক পরিব্রাজকাচার্য্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ইনি গোপাল ভট্টের পিতৃব্য ছিলেন কি না,

তাহাও নিশ্চিত নহে ; এবং ত্রিমল্ল-বেঙ্কট-প্রবোধানন্দের যে উপাখ্যান নিত্যানন্দ দাস, মনোহর দাস ও নরহরি চক্রবর্তী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্যত্র তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ নাই।

সম্প্রতি আরও দুই-একটি, খুব সম্ভব চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত, গোপাল ভট্টের আবিষ্কারে এই সমস্যা জটিলতর হইয়াছে।[২৪] পুণা ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা-মন্দিরে রক্ষিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র আর একখানি টীকার পুঁথি[২৫] পাওয়া গিয়াছে, তাহাও গোপাল ভট্টের রচিত। কিন্তু এই টীকা স্বতন্ত্র গ্রন্থ ; এই গোপাল ভট্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন, কিন্তু উপরোক্ত দুই গোপাল ভট্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পুঁথিখানি ১৪৫ পত্রে (folio) সমাপ্ত ; অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পৃষ্ঠমাত্রাযুক্ত দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ; মূল ও টীকা দুই পুঁথিতে রহিয়াছে। টীকার নাম 'শ্রবণাহ্লাদিনী'। শেষের যে শ্লোকে টীকাকারের পিতার নাম লিখিত আছে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, যথা—

> শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দভজনত্যক্তাখিলার্থত্র্যাহঃ (ত্রয়ঃ ?)
> শ্রীমদ্ভাগবতার্থবিৎ সমভবদ্ ভদ্দন্ফণা (উদ্যৎফণো ?) বিশ্রুতঃ।
> শ্রীরাধারমণাঙ্ঘ্রিসক্তমনসা গোপালভট্টেন তৎ-
> পুত্রেণ শ্রবণামৃতস্য রচিতা টীকাস্তু সৎপ্রীতয়ে ॥

ইহার পরবর্তী শ্লোকে টীকাকার বলিতেছেন যে তিনি নিজের ও আত্মসুহৃৎ বনমালী দাসের কর্ণদ্বয়ের এবং অনুজ লক্ষ্মীনারায়ণের কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ তাঁহার টীকা রচনা করিয়াছেন—

> তৈরর্থরত্নৈর্বনমালিদাসমিত্রস্য কর্ণদ্বয়মাত্মনশ্চ।
> বিভূষয়ামীহ তথৈব লক্ষ্মীনারায়ণস্যাপ্যনুজস্য কণ্ঠম্ ॥

---

২৪ সংস্কৃত সাহিত্যের বৃত্তান্তে আরও গোপাল ভট্ট আছেন। কিন্তু তাঁহাদের এখানে ধরা নিষ্প্রয়োজন। Aufrecht-এর *Catalogus Catalogorum*-এ (কেবল গোপাল নাম ছাড়া) অন্ততঃ বার জন গোপাল ভট্টের নাম পাওয়া যায়।

২৫ MS. no. 178 of 1879-80. এই পুঁথি শ্রীধর ভাণ্ডারকরের সংকলিত *Catalogue of the Collections of MSS deposited in the Deccan College*, 1888, p. 135-এ তালিকাভুক্ত হইয়াছে ; Deccan Collage-এর সমস্ত পুঁথি-সংগ্রহ এখন ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউটে রক্ষিত। এই পুস্তক Aufrecht-এর তালিকায় ধৃত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত সমস্যাগুলির বিস্তৃত আলোচনা মৎরচিত *Early History of the Vaiṣṇava Faith and Movement in Bengal* (Calcutta, 1942) পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

টীকাকারের গুরুর নাম নারায়ণ। ইহা বঙ্গীয় পাঠ অনুসরণে লিখিত; ইহাতে গীতগোবিন্দ (fol. 22b) এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র (fol. 16a, 19a) নামোল্লেখপূর্ব্বক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইনি অপর গোপাল ভট্টের 'কৃষ্ণবল্লভা' দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আরও একটি গোপাল ভট্টের নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুঁথির তালিকার ভূমিকায় (p. xvii) রাধারমণ দাস-রচিত শ্রীধর স্বামীর 'ভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকা' টীকার 'দীপিকা-দীপন' নামক একটি অনুটীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে রাধারমণ দাস আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন যে, তিনি শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টের দাস্যে সংসক্তমানস, রাধারমণ-(বিগ্রহ-)সেবী, এবং কৃষ্ণগোবিন্দের মিত্র। এই গোপাল ভট্ট কি 'হরিভক্তিবিলাস'-কার গোপাল ভট্ট হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি?

চৈতন্য-চরিতাখ্যায়িকা

মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত, বিস্তৃত ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু চৈতন্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ও মূল্যবান শাখা হইতেছে—বৈষ্ণব চরিতাবলী; ইহা ততটা সুপরিচিত না হইলেও, কম বিস্তৃত ও চিত্তাকর্ষক নয়। চৈতন্যদেবের তিরোধান হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রায় আড়াই শত বৎসরের মধ্যে, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ওড়িয়া, অসমীয়া ও হিন্দী ভাষায় তাঁহার ও তাঁহার অনুচরবর্গের লীলানাট্য অবলম্বন করিয়া শতাধিক লেখক, স্তব পদ বা কাহিনী রচনা করিয়াছেন, যাহার মধ্যে কেবল জীবনীর উপাদান নয়, তাঁহাদের ভাব-সাধনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। বৈষ্ণব প্রভাবের ফলেই প্রবর্ত্তিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই নূতন ধরণের রচনা। ইহা চৈতন্য-ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট দান, যাহা হইতে বাংলা ভাষায় জীবনী লিখিবার প্রথার হইয়াছিল সূত্রপাত। কেবল তৎকালীন সমাজের চিত্র, অথবা ধর্ম্মভাব ও তত্ত্বের বিবরণ হিসাবে নয়, সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হিসাবেও, ভাষা ভাব ও রচনাভঙ্গীর দিক্ দিয়াও, বৈষ্ণব চরিতাবলীর মূল্য ও বিস্তৃতি কোন অংশে কম বলা যায় না।

কিন্তু পদাবলী ও চরিতাবলী পরস্পর-সাপেক্ষ, একটি বুঝিতে হইলে অন্যটিও বোঝার প্রয়োজন আছে। গীতিকাব্যধর্ম্মী হইলেও মহাজন-পদাবলী মুখ্যতঃ ভক্ত ও সাধকের অনুভূতির বিষয়; কাব্য হিসাবে রচিত হয় নাই, ব্রজলীলা-ধ্যানের ইহা ছিল আনুষঙ্গিক ফল ও সহায়। তেমনি মহাজন-চরিতাবলী শুধু জীবন-রচিত নয়; একই ধরণের আধ্যাত্মিক অনুভূতির অন্যবিধ প্রকাশ। চরিত-কথার লেখকদের মধ্যে, কেহ লীলা-বর্ণনা করিয়াছেন, কেহ তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিয়াছেন; পদাবলী রচয়িতাদের মত, ইঁহাদের সকলেই পরম ভক্ত। ইঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, বা অতি অল্পই ছিল, কিন্তু অনুভূতি ছিল অপরিসীম। চৈতন্যদেবের সহিত যাঁহাদের ব্যক্তিগত পরিচয় বা ঘনিষ্টতা ছিল, তাঁহারাও যে সকল ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও নহে। কারণ, তাঁহারা চৈতন্যের বহিরঙ্গ জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিতেন না, তাঁহার অন্তরঙ্গ ভাব-জীবনই তাঁহাদের আস্বাদ্য

ছিল। সুতরাং ভাব, রূপ ও লীলা বর্ণনার দিক্ দিয়া, পদাবলী ও চরিতাবলী এই উভয়েরই উদ্দেশ্য প্রায় একই। সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে পদাবলীর প্রচলন থাকিলেও, কৃষ্ণলীলাই পদাবলী-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য; কিন্তু চরিতা-বলীর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে চৈতন্য-লীলা। তথাপি চৈতন্যের চরিতকারগণ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং চৈতন্যলীলা কৃষ্ণলীলারই রূপান্তর বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য, পদাবলী ও চরিতাবলী, এই উভয় শাখার তাৎপর্য্য ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নাই, কারণ উভয়েরই উদ্দেশ্য হইতেছে এই লীলার রস-মাধুর্য্যের আস্বাদন।

ইঁহারা সকলেই ভাবরাজ্যের ভক্তিমান্ লেখক। সেইজন্য, আধুনিক সময়ে জীবন-চরিত বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বৈষ্ণব চরিতাবলী ঠিক সেই ধরণের রচনা নয়। ইহার অধিকাংশই পরম্পরাগত বা লৌকিক কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। চরিত নয়—চরিতামৃত; চরিতের অংশ কম, অমৃতের অংশই বেশি। প্রত্যক্ষদর্শীর নিখুঁত বিবরণ নয়, অথবা তথ্যদর্শী ঐতিহাসিকের প্রমাণ ও বিচারের মানদণ্ডে নির্ণীত ঘটনাবলীর চিত্র বা ব্যাখ্যাও নয়। ভক্তের হৃদয়ে যাহা লীলারূপে স্ফুরিত হইয়াছে, তাহারই অভিব্যক্তি। সেইজন্য, ইঁহারা বারবার বলিয়াছেন—

অলৌকিক লীলা ইহ পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইবে, তর্কে হয় বহুদূর॥

ভক্ত-কবির মনোভূমিতে যে অলৌকিক চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি ঐতিহাসিক চৈতন্য না হইতে পারেন, কিন্তু ভক্তের প্রাণে তিনি সজীব ও সশরীরী সত্য। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, ভক্ত-কবির ভাব, কল্পনা, বিশ্বাস ও ভক্তির ধারায় অবগাহন করিতে হইবে; ঐতিহাসিকের নীরস তথ্যের মধ্যে তিনি ধরা দেন না।

অপ্রাকৃত বা অলৌকিক ঘটনাবলী ছাড়িয়া দিলেও, এই চরিতকথাগুলি আলোচনা করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, অনেক ঘটনা-সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে যে বিভিন্ন বিবরণ রহিয়াছে, তাহা অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী; অনেক সময় ভক্তিবাহুল্যে বিকৃত বা বিরূপ। কিন্তু, এরূপ পার্থক্য বা বিরোধ সত্ত্বেও, যদি কোন ঘটনা বৈষ্ণব আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ও ভক্তিরসশাস্ত্রের বিরোধী না হয়, তবে সব বিবরণগুলি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চৈতন্য-ভক্তের কোন বাধা

নাই। তাঁহারা বলেন, প্রভুর লীলা অনন্ত—সুতরাং সবই সত্য হইতে পারে। যাহা ঘটে তাহা সত্য নয়, তথ্যমাত্র; ভক্তের হৃদয়ে যাহা স্ফুরিত হয় তাহাই সত্য। ঐতিহাসিক তথ্য পারমার্থিক সত্য নহে; কারণ ইতিহাস সত্য-মিথ্যার যে মানদণ্ডে প্রাপঞ্চিক ঘটনার বিচার করে, তাহা প্রপঞ্চাতীত ভগবান্ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে না। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কেহ কেহ ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

এই সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা চৈতন্যের নিত্যত্বে ও নিত্যলীলায় বিশ্বাস করিতেন; তাই তাঁহাদের আস্বাদনে প্রকটলীলার নিখুঁত বিচারের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা নিত্যলীলা ও প্রকটলীলা, ঐতিহাসিক ও পারমার্থিক সত্য, একসঙ্গে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে হয়ত ভক্তির আতিশয্যে তাঁহাদের চিত্র বহুলাংশে অতিরঞ্জিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক তথ্য না হইলেও ভাব-জীবনের সত্য। প্রকৃত ঐতিহাসিকের চক্ষেও ইহা তুচ্ছ নয়, কারণ চৈতন্য-ধর্ম্ম-প্রণালীর ইতিহাসে ইহারও মূল্য আছে।

সংস্কৃত বা বাংলা ভাষায় চৈতন্যের কোন জীবন-চরিত রচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি পদ রচিত হইয়াছিল। গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, তাঁহার ভাব-জীবনের যে বিকাশ হইয়াছিল, এই পদগুলির তাহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। এইরূপ বত্রিশ জন পদকর্ত্তার রচনা প্রচলিত আছে। তাঁহাদের অনেকেই চৈতন্যের সমসাময়িক ও নবদ্বীপ-লীলার পরিকর; যথা নবদ্বীপের মুরারিগুপ্ত ও বংশীবদন, কাঞ্চনপল্লীর শিবানন্দ সেন, শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, কাটোয়া কুলাইগ্রামের বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ, কুলীনগ্রামের বসু রামানন্দ প্রভৃতি। এগুলি ধারাবাহিক জীবনী বা ঘটনাবলীর বিবরণ নয়, তত্ত্বকথাও নয়; ছোট ছোট দৃষ্ট ঘটনা ও অনুভূত ভাব লইয়া চৈতন্যের রূপ ও ভাব-জীবনের বর্ণনাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ভাব-আস্বাদনের জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য হিসাবে, ও সমসাময়িক ভক্তদিগের রচনা বলিয়া, এই পদগুলির মূল্য যথেষ্ট।

নবদ্বীপ-লীলার অন্যতম প্রধান পরিকর মুরারি গুপ্তই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম চৈতন্যের জীবনী রচনা করেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে ও জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে ইহার উল্লেখ নাই; কিন্তু কবিকর্ণপুরের কাব্যের ইহাই উপজীব্য। বর্ত্তমান কালে মুরারির যে গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত-কাব্য

এই নামে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত ভাষায়, কাব্যের আকারে ও পুরাণের পদ্ধতিতে রচিত। ইহা চারটি প্রক্রমে ও আটাত্তর সর্গে বিভক্ত, ও সর্ব্বসমেত ১,৯২৭ শ্লোকে চৈতন্যের প্রায় সমগ্র জীবনের বিবরণে সম্পূর্ণ। পরবর্ত্তী চরিতকার লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন যে, মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের "জন্ম হইতে বালক-চরিত্র" অথবা আদিলীলার কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, বৃন্দাবন-দর্শন, নীলাচল-লীলা, এমন কি তাঁহার তিরোধানেরও উল্লেখ রহিয়াছে— অর্থাৎ আদিলীলা ছাড়াও ইহাতে মধ্য ও অন্ত্যলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই জন্য সমগ্র গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তবুও সমসাময়িক বৃত্তান্ত হিসাবে, বিশেষতঃ নবদ্বীপ-লীলার বিষয়ে, মুরারির বর্ণনাকেই আপাততঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া মানিতে হইবে। চৈতন্যের মধ্য ও অন্ত্যলীলার পরিকর স্বরূপ-দামোদরও একখানি কড়চা বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন, এ কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন; কিন্তু স্বরূপ-দামোদরের কড়চা এখন পাওয়া যায় না।

কাঞ্চনপল্লীর শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর চৈতন্যের জীবনী-সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমটি, বিংশসর্গাত্মক কাব্য চৈতন্য-চরিতামৃত, প্রায় ১৯০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ; ইহা চৈতন্যের তিরোধানের নয় বৎসরের মধ্যে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। দ্বিতীয়টি দশ অঙ্কে গ্রথিত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক; অনেক পরে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার অধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের মনোবিনোদনের জন্য রচিত। শৈশবে তাঁহার পিতার সহিত কবিকর্ণপূর পুরীতে চৈতন্যের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু কাব্য-রচনার সময় তাঁহার বয়স খুব বেশী হয় নাই, কারণ তিনি নিজকে শিশু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থের বিবরণ তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট না হইলেও, পরম্পরাগত ও ভক্তগণের নিকট শ্রুত; এবং কাব্যটি যে মুরারি গুপ্তের কাব্য অবলম্বনে লিখিত তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। নাটকটিতেও সংক্ষেপে সমগ্র জীবনের কাহিনী আছে, কিন্তু চৈতন্যের অন্ত্যলীলাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ভক্তের চোখেই তিনি চৈতন্যকে দেখিয়াছেন এবং কবির কল্পনায় ও ভাবে তাঁহাকে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় কোন চরিত-কথা লিখিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই এবং চৈতন্য-তিরোভাবের অত্যল্পকালের মধ্যেই

তাঁহার ও মুরারি গুপ্তের কাব্য দুইটি রচিত হইয়াছিল। এই হিসাবে ইহাদের অগ্রগামী রচনার ঐতিহাসিক মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জয়ানন্দ ও লোচনদাস, এই উভয়েরই বাংলা ভাষায় ও ছন্দে রচিত চরিত-কথার নাম—চৈতন্য-মঙ্গল। জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে, নীলাচল হইতে মথুরা-গমনের পথে, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত আমাইতপুরা গ্রামে, চৈতন্যদেব জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মাতা রোদনী দেবী চৈতন্যকে রন্ধন করিয়া খাওরাইয়াছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দ তখন মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশু। চৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত জানিতেন, কিন্তু নবদ্বীপ-লীলার ঐতিহ্য অথবা ষড়্গোস্বামীদের তত্ত্ব-ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করেন নাই; এবং গ্রন্থ রচনায় বৈষ্ণবীয় রীতি অবলম্বন না করায়, তাঁহার গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হয় নাই। জয়ানন্দ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল পালাগানের বহি; প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের ধরণে রচিত। সুতরাং ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয় যে, তাঁহার চৈতন্যলীলা বর্ণনার মধ্যে ঐতিহাসিক ক্রম নাই; এবং শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া জয়ানন্দ এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন যাহাতে অনুসন্ধানের কোন পরিচয় নাই। তাঁহার গ্রন্থে কতকগুলি নূতন তথ্য থাকিলেও, তাহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। লোচনদাসের গ্রন্থে ইতিহাসের চেয়ে কবিত্বের প্রসারই বেশি। তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের অনুপ্রেরণায় তিনি চৈতন্যের নাগর-ভাব উপাসনাকে জনপ্রিয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপাসনার অনুভবে চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ; নদীয়ার নাগরীরা তাঁর রূপ ও গুণে আকৃষ্ট। কিন্তু এই বিশুদ্ধ রূপককে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিতে গিয়া অনেকে চৈতন্যদেবের চরিত্রকে বিকৃত করিয়া আঁকিয়াছেন; সেইজন্য বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি চরিতকারগণ এই মনোভাব স্বীকার করেন নাই। জীবনী হিসাবে লোচনদাসের গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য বেশী নয়। শেষখণ্ড নিতান্ত অসম্পূর্ণ, এবং চৈতন্যের ভাব-জীবনের বিশেষ পরিচয় নাই। তবে চৈতন্য-ধর্ম্মের শাখাবিশেষের পৃথক্ ভাব-সাধনা-প্রণালীর বিবরণ হিসাবে ইহাকে উপেক্ষা করা যায় না।

চৈতন্য-চরিতের মধ্যে যে দুইখানি গ্রন্থ সর্ব্বজনমান্য ও প্রামাণিক বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত, তাহা হইতেছে—বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত

ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। বৃন্দাবন দাস নিজে চৈতন্যলীলা দর্শন করেন নাই, তবে "যাহা লিখি তাহা শুনি ভক্ত-স্থানে"। তাঁহার বর্ণনার প্রধান উপজীব্য ছিল নিত্যানন্দের উপদেশ—

নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাঙ্ সবার মহত্ত্ব॥

কিন্তু লোচন দাস যেমন নরহরি সরকারের ভাবে অনুপ্রাণিত, তেমনি নিত্যানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বৃন্দাবন দাস চৈতন্যলীলার বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া, ইহার স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহাসিক মূল্য ক্ষুন্ন হইয়াছে। মধ্য ও অন্ত্যলীলার বর্ণনা সেইজন্য অসম্পূর্ণ। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বৃন্দাবন দাস

নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইলা আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥

তবে, নবদ্বীপে যে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় চৈতন্য-ধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছিল, বৃন্দাবন দাস সেই শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র। সেইজন্য তিনি নবদ্বীপ-লীলার পরিকর না হইলেও, সমগ্র ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন, এবং এই লীলার কথাই বেশী করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখায় তত্ত্বকথার বা পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই, তাঁহার ভাষা সহজ ও ভাব মর্ম্মস্পর্শী। অন্যান্য চরিতকারদের মত, ভক্তির প্রাবল্যে অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ থাকিলেও, চৈতন্যের ও তাঁহার পরিকরবর্গের ভাব-জীবনের যে আলেখ্য তিনি ভক্তজনের চিরাস্বাদ্য করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণলীলা-ব্যঞ্জক শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত, চৈতন্যলীলাদ্যোতক তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতের নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের অনুপ্রেরণা নবদ্বীপের অনুরাগী ভক্তগোষ্ঠী হইতে আসে নাই, বৃন্দাবনের ভক্ত ও শাস্ত্রবিদ্ ষড়্‌গোস্বামী হইতে আসিয়াছিল। ইহাতে একাধারে ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের বিচিত্র সমাবেশ হইয়াছে। চরিত-কথার দিক হইতে তিনি মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর, স্বরূপ-দামোদর ও বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার নিজের চৈতন্য-লীলা সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, এবং চৈতন্যচরিত-সমূহের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ কালহিসাবে সর্ব্বকনিষ্ঠ। কিন্তু

চৈতন্যের ভাব-বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন-গোস্বামিদের সমগ্র শাস্ত্রার্থ প্রকট করিয়াছেন। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-লীলার যে তত্ত্ব ও ভাব-সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া কৃষ্ণদাস অনুরূপ পাণ্ডিত্যের সহিত তাহা চৈতন্য-লীলায় প্রয়োগ করিয়াছেন। চৈতন্যের অন্তরঙ্গ জীবনের যে ভাবাস্বাদনকে তাঁহার নবদ্বীপ-ভক্তেরা সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন, শুধু তাহারই আলেখ্য নহে, তাঁহার গ্রন্থের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ষড়্‌গোস্বামিদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত সমগ্র সিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রতত্ত্ব সর্ব্বজনগ্রাহ্য করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত করা। ইহাই তাঁহার গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। ষড়্‌গোস্বামিদের মত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজেও ভক্ত ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যকে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ও তর্কপ্রিয়রূপে অঙ্কন করিবার সুযোগ পাইলে, কৃষ্ণদাস তাহা কখনো ছাড়েন নাই; অথচ তিনি নিজেই চৈতন্যের ভাবোন্মাদের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের বর্ণনা অসমঞ্জস হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃত শুধু চরিত-গ্রন্থ নহে, ইহা চৈতন্য-ধর্ম্মের অন্যতম সিদ্ধান্ত-গ্রন্থও বটে। একদিকে ভাবমাধুর্য্যের আস্বাদন, অন্যদিকে ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, একদিকে নবদ্বীপের সহজ সরল প্রেমোল্লাস, অন্যদিকে বৃন্দাবনের সূক্ষ্ম ও দুরূহ তত্ত্ববিচার,—চৈতন্য-ধর্ম্মের এই দুইটি দিক্, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত ও কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃত এই দুইটি সর্ব্বজনমান্য গ্রন্থে, অতি-সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রূপ ও রস

আজকাল আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর বিচার কেবল সাহিত্য হিসাবেই করিয়া থাকি; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বৈষ্ণব পদাবলীর আর একটি নাম হইতেছে মহাজন-পদাবলী এবং এই আখ্যা একেবারেই নিরর্থক নয়। 'মহাজন' শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, প্রাচীন বাংলার এই রচনাগুলি গীতিকাব্যধর্মী হইলেও মুখ্যতঃ ভক্ত-সাধকের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফল। বৈষ্ণব চরিত-কথাগুলি যেমন কেবল চরিতাখ্যায়িকা নয়, ভক্তের প্রাণে যাহা লীলারূপে স্ফুরিত হইয়াছে তাহারই অভিব্যক্তি, তেমনি বৈষ্ণব পদাবলী কেবল কবি-কল্পনার বস্তু নয়, লীলারস-মাধুর্য্যের আস্বাদন। অর্থাৎ পদকর্ত্তারা কেবল কাব্য রচনার জন্য পদাবলী রচনা করেন নাই; এগুলি বৈষ্ণব-সাধনার প্রধান অঙ্গ যে ব্রজলীলা-ধ্যান তাহারই আনুষঙ্গিক প্রকাশ বা সহায় মাত্র। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাংলা দেশের প্রাণে যে ভক্তি-ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, ইহা তাহারই একটি বিচিত্র বিকাশ, কেবল কাব্য নয়। কাব্যের মত স্বসংবেদ্য হইলেও, ইহা হইতেছে অন্তরঙ্গ সাধনার বিষয়, জীবনের গভীরতম অনুভূতির সামগ্রী। একথা সত্য যে, গীতি-কবিতাও কবির অন্তরঙ্গ অনুভূতি অবলম্বন করিয়া বিকশিত হয়, কিন্তু ভক্তের ভাব-সাধনা ও কবি-চিত্তের ভাব-স্ফূর্ত্তি ঠিক এক বস্তু নয়। উভয়েরই উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি, কিন্তু উভয়ের অনুপ্রেরণা, পদ্ধতি ও লক্ষ্যবস্তুর পার্থক্য রহিয়াছে। মহাজনদের অনেক রচনায় গীতি-কবিতার লক্ষণ হয়ত পাওয়া যাইবে এবং সেগুলি কাব্যের বাহ্য ও আভ্যন্তর রূপে ও রসে, ভাষায় ও ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ বলিয়া উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে, কিন্তু কেবল গীতি-কবিতা হিসাবে গ্রহণ করিলে বৈষ্ণব পদাবলীর মূলতাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না।

এই রচনাগুলি কবিতা হিসাবে গ্রহণ করিবার আর একটি অন্তরায় হইতেছে এই যে এগুলি 'পদাবলী', এবং কীর্ত্তন হইতেছে ইহাদের প্রকাশের প্রকৃষ্ট উপায়। অর্থাৎ এগুলি মুখ্যতঃ গান এবং এই গানের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, যাহার নাম কীর্ত্তন। যতই গীতিধর্মী হউক না কেন, কবিতা গান নয়, যদিও গান অনেক সময় কবিতা হইয়া উঠিতে পারে। কারণ, কবিতার প্রধান অবলম্বন হইতেছে কথা, গানের প্রধান অভিব্যক্তি হয় সুরে। সেই জন্য বৈষ্ণব পদাবলী সুর ও তালে কীর্ত্তনের রীতিতে গীত হইলে যেমন

মর্ম স্পর্শ করে, শুধু পাঠ করিলে তাহার কিছুই হয় না। ভাবমাধুর্য্যই পদাবলীর প্রাণ, এবং গীতি-কবিতা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে; কিন্তু কীর্ত্তনের সুর ও তালের ভিতর দিয়াই পদাবলীর ভাব-স্ফূর্ত্তি হয়, ইহার মাধুর্য্য মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে। 'পদাবলী' শব্দটি এই অর্থে জয়দেবের পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই; গীতগোবিন্দের অন্তর্গত গীতগুলির কোমলকান্ত পদাবলী এই বিশিষ্ট আখ্যা প্রথম পাওয়া যায়, যাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব রচনায় সার্থক হইয়াছে। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মতে, কীর্ত্তন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের নাম, লীলা, গুণাদির উচ্চ ভাষণ; রূপ গোস্বামীর বর্ণনায়— নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কীর্ত্তন বলিতে বাংলা দেশের এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত-পদ্ধতি বোঝায়। কীর্ত্তনের যে দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য প্রচলিত আছে, তাহার একটি হইতেছে নাম-কীর্ত্তন, অন্যটি হইতেছে লীলা-কীর্ত্তন। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম ও লীলা, একটি বিশিষ্ট রীতিতে গান করাই বাঙালী কীর্ত্তন বলিয়া জানে। রাগরাগিণীযুক্ত ধ্রুপদ, খেয়াল বা টপ্পা বাংলার গান নয়; বাংলার গান, বাঙালীর নিজস্ব গান হইতেছে কীর্ত্তন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, কীর্ত্তন নাকি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটি ক্রমবিবর্ত্তিত রূপ; কিন্তু ইহাও সত্য যে, কীর্ত্তনের দ্বারা বাঙালী তাহার আধ্যাত্মিক ভাব-প্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র সুর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে, যাহা বাঙালীর প্রাণের একটি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি।

কারণ, এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলকথা হইতেছে যে, সুর ও তালই কীর্ত্তনের একমাত্র অবলম্বন নয়; পদের অন্তর্নিহিত ভাবের বিকাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, যাহা ইহাকে নিছক হিন্দুস্থানী গান হইতে পৃথক করিয়াছে। সেইজন্য, যে-রসে যে-পদ গীত হয়, কীর্ত্তনীয়া যদি প্রাণে-প্রাণে সে-রস অনুভব না করেন, তবে শ্রোতাকেও অনুপ্রাণিত করিতে পারিবেন না। বিভিন্ন মহাজনের বিভিন্ন পদ, একটির পর একটি সাজাইয়া, কীর্ত্তনীয়ারা যে অপূর্ব্ব সুর ও ভাবের মাল্যরচনা করেন, তাহাতে শুধু সঙ্গীতসৌকুমার্য্য নয়, রসানুভূতিরও একান্ত প্রয়োজন আছে। কারণ, কীর্ত্তন-পদাবলী প্রধানতঃ সঙ্গীত হইলেও ইহার মধ্যে কথা, ভাব ও সুর, ত্রিবেণীসঙ্গমের মত, একাধারে মিশ্রিত হইয়া এক মধুর রস-প্রবাহের সৃষ্টি করে। কেবল পাঠের দ্বারা হয়ত পদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য্য গ্রহণ করা যায়, কিন্তু ইহার সমগ্র মাধুর্য্যের উপলব্ধি হয় না।

সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলী কেবল শুষ্ক তত্ত্ব-কথা বা দার্শনিক বিচার নয়; এবং কথা, ভাব ও সুরের মাধুর্য্যে বাহিত হয় বলিয়া মহাজনের সূক্ষ্ম অনুভূতির আস্বাদন সাধারণ লোকের পক্ষেও সম্ভব হয়। বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ হইলেও, ভক্ত-হৃদয়ের নিবিড় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ বলিয়া পদাবলীর প্রত্যক্ষ সরসতা ও তন্ময়তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। সম্পূর্ণ কাব্যধর্ম্মী না হইলেও ইহা আস্বাদনের অতীত নয়। কারণ, বৈষ্ণব মহাজনেরা ছিলেন রূপের সাধক, রসের উপাসক; পদাবলী সেই শাশ্বত রূপ ও রসের প্রকাশ। আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা প্রেরিত হইলেও অনুভূতির দ্বারা লব্ধ বলিয়া এই ভাব অনুভূতির দ্বারা রসজ্ঞের উপভোগ্য।

বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন, মানুষ কেবল মানুষের ভাব দিয়াই ভগবানের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের উপলব্ধি করিতে পারে। মানুষের অলভ্য ও অপরিমেয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণের মানুষোচিত, অথচ মানুষের ইয়ত্তার অতীত, রূপ ও রসের আস্বাদন, অথবা রসময় উপাসনাই বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য উদ্দেশ্য:

কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহারি স্বরূপ॥

নরবপু শ্রীকৃষ্ণের এই নরলীলার আস্বাদন মহাজন-পদাবলীর ভাবে ও ভাষায়, ছন্দে ও গানে মূর্ত্তিমান হয় বলিয়া ইহা কেবল ভক্তসাধকের নয়, সাধারণ লোকেরও অধিগম্য হয়।

এই দিক দিয়া দেখিলে বৈষ্ণব পদাবলীর ধর্ম্ম হইতেছে রূপ-ধর্ম্ম এবং ইহার প্রকাশ হইতেছে রসের প্রকাশ। বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন, তাঁহাদের উপাস্য দেবতা দূরের নয়, অন্তরের। তিনি যেমন রূপময় তেমনি রসময়, যেমন সুন্দর তেমনি মধুর, তাঁহার সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের তুলনা নাই। তাই ভক্ত লীলাশুক ভজনানন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাও চিরনবীনা, চিরকিশোরী, যাঁহার প্রেমমাধুর্য্যে তিনি চিরদিন গোপবেশী বেণুধর নটবর। তাঁহাদের প্রেমলীলার বৈচিত্র্য তাই অফুরন্ত। প্রাচীন কবি মাঘ বলিয়াছেন:

ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি
তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।

যাহা ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নূতনভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাই হইতেছে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত রূপ। এই রূপবৈচিত্র্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিত্যনূতন, নিত্যমধুর।

কিন্তু এরূপ মানবীয় ভাব ও ভাষায় উদ্ভাসিত হইলেও, ইহার অন্তর্নিহিত অতিমানবীয় প্রেরণাই হইতেছে মহাজন-পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। ইহাতে যে প্রেমের কথা রহিয়াছে, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে তাহাকে 'অপ্রাকৃত আদিরস' অথবা 'উজ্জ্বল' বা 'মধুর' রস বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, ইহা প্রাকৃত জনের লৌকিক প্রেমের অনুরূপ হইলেও বস্তুতঃ অপ্রাকৃত ও অলৌকিক লীলা। তাই সাধারণ প্রেমের দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা সহজ বা সঙ্গত নয়। অনেক সময় যাহা অত্যুক্তি বা অসম্ভব মনে হয়, ইহার পক্ষে তাহা সহজ ও স্বাভাবিক। শুধু মানবীয় প্রেমগীতি নয়, কেন্দ্রীভূত আধ্যাত্মিক উপাদান ইহার সুরকে ভাবের এক উচ্চ গ্রামে হঠাৎ চড়াইয়া দিয়া যে অপূর্ব্ব রাগিণীর আভাস দেয়, তাহা শুধু কবির নয়, ভক্ত ও সাধকের কানের ভিতর দিয়া মরমে আসিয়া প্রবেশ করে, ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে পৌছাইয়া দেয়।

একটি উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। বৈষ্ণব পদাবলীতে—বিশেষ করিয়া চৈতন্যের পরবর্ত্তী যুগের পদাবলীতে—রাধার পূর্ব্বরাগের যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা সাধারণ নায়িকার অনুভবের মত হইলেও ঠিক সমপর্য্যায়ের নয়। চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেবের রাধিকা—

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং
ত্বদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্।

অথবা সা বিরহে তব দীনা।
মাধব মনসিজ-বিশিখ-ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥

ইনি হইতেছেন সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত বিরহ-পীড়িতা, মদনের শরসংপাতের ভয়ে ত্রস্তা, যৌবনকাতরা নায়িকা। বিদ্যাপতির রাধার চিত্র—

ক্ষণে-ক্ষণে নয়নকোণে অনুসরই।
ক্ষণে-ক্ষণে বসন তনু ধূলি ভরই॥

উদ্ভিন্নযৌবনা নায়িকার বিভ্রমের চিত্র মাত্র। কিন্তু চৈতন্যের ভক্তি-সাধনায় অনুপ্রাণিত পরবর্ত্তী যুগের ভাবোন্মাদিনী রাধার মূর্ত্তি বিভিন্ন।

কেবল নাম শুনিয়া পূর্ব্বরাগের তন্ময়তার দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে বিরল নয়; কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা নামজপের মাধুর্য্যে আত্মহারা,

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো—

যেমন ভক্তচিত্ত ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তেমনি—

না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

তাই এ রাধা কেবল বিয়োগিনী নয়, ধ্যানপরায়ণা যোগিনী—

বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা।

এ রাধা জয়দেবের নীলনিচোল-পরিহিতা সোহাগিনী নন; ইনি উপবাস-ক্লিষ্টা, সন্ন্যাসিনীর মত ইহার পরিধানে গেরুয়া। মেঘের শ্যাম শোভায় শ্যামের বর্ণমাধুর্য্য দেখিয়া—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নতারা॥

এই অপরূপ প্রেমোন্মাদ সাধারণ নায়িকার নয়; ইহা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা বৈষ্ণব সাধকদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন, মাধবেন্দ্র পুরীর বর্ণনায় অনুরূপ অনুভূতির কথাই শুনি—

মাধবেন্দ্র পুরী কথা অকথ্য কথন।
মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন॥

চৈতন্যের লীলাতেও এরূপ অকথ্য-কথন ঘটনা নিত্য দেখা যায়। কৃষ্ণের নাম শুনিয়া রাধা-ভাবে তন্ময় গৌরাঙ্গের সোনার অঙ্গ ধূলায় অবলুণ্ঠিত—

যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়।
সোনার পুতলি যেন ভূতলে লুটায়॥

কখনও বা কৃষ্ণভাবে—

রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥

অথবা কৃষ্ণের বিরহে রাধার মত অন্বেষণ-কাতর—

কাঁহা কানু কাঁহা কানু কাঁহা তারে পাও।
বিচ্ছেদ-অনলে পোড়া পরাণ জুড়াও॥

ভক্তচিত্তের এই দিব্যোন্মাদ পদাবলীর রাধায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ, চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে নায়িকা রাধার বর্ণনা অপেক্ষা চৈতন্যদেবের আস্বাদিত রাধাভাবেরই প্রাধান্য রহিয়াছে।

এই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আস্বাদনের তন্ময়তা মহাজন-পদাবলীর সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু পদাবলী-সাহিত্য এত বিস্তৃত যে তাহার সমস্ত দিকের বিশ্লেষণ অল্পকথায় করা যায় না। প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর রচনার ধারা, বিভিন্ন রচয়িতাদের পদের পার্থক্য ও বিভিন্ন রসের প্রকাশ-নৈপুণ্য প্রভৃতি বিষয়ের সমালোচনা করিবার অবসর এখানে নাই। তবে মোটামুটি ইহার তাৎপর্য্যের আভাস দিয়া, এখন একটি দিকের কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। সখ্য দাস্য বাৎসল্য প্রভৃতি সকল ভাবই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যে ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-অবলম্বনে উজ্জ্বল বা মধুর রস। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বলা যায় যে, এই রসবিচারে প্রেমকে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ, অর্থাৎ মিলন ও বিরহ, এই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ বা বিরহের আবার পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য এই চতুর্ব্বিধ বৈচিত্র্য। বৈষ্ণবেতর সংস্কৃত রসশাস্ত্রে মান ও প্রবাসের কথা আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্য বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। রসশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও পদাবলীর একটি লক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, যাহা ইহাকে অভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করিয়াছে। সমগ্রভাবে দেখিলে পদাবলীর মধ্যে মিলনের চেয়ে বিরহের, আনন্দের চেয়ে বেদনার কথাই অধিক; এমন কি আনন্দও অনেক সময় বেদনার নামান্তর মাত্র। কারণ, পার্থিব হোক্ বা অপার্থিব হোক্, মিলনের চেয়ে বিরহের মধ্যেই প্রেমের সমধিক পরিপুষ্টি। তাই পূর্ব্বরাগে বিরহ, মানে বিরহ, প্রবাসে বিরহ, প্রেমবৈচিত্ত্যে বিরহ,—বিরহের গভীর বেদনায় মহাজন-পদাবলী ওতপ্রোত। এমন কি, নায়িকার আটটি অবস্থাভেদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি বিরহের অবস্থান্তর। যেমন—উৎকণ্ঠিতা, যিনি প্রিয়ের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্না; বিপ্রলব্ধা, যিনি প্রিয়ের বঞ্চনায় বিপন্না; খণ্ডিতা, যিনি প্রিয়কে অন্যাসক্ত জানিয়া ক্ষুব্ধা; কলহান্তরিতা, প্রত্যাখ্যাত প্রিয়ের প্রস্থানে যিনি পশ্চাত্তাপে খিন্না; এবং প্রোষিতভর্ত্তৃকা, প্রবাসে স্থিত প্রিয়ের জন্য যিনি বিরহ-কাতরা।

পূর্ব্বরাগ বিরহের নামান্তর মাত্র, কারণ ইহাতে অপ্রাপ্তির অসীম আকুলতা আছে, প্রাপ্তির পূর্ণতা নাই। পূর্ব্বরাগে প্রথম দর্শনের যে আকাঙ্ক্ষা —চোখে দেখার ভিতর দিয়া অন্তরে পাওয়ার ব্যাকুলতা—তাহা বৈষ্ণব পদাবলীতে যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেরূপ অন্যত্র দুর্লভ। একদিকে রাধার অনুরাগের উন্মেষ—

পেখলু নাগর পন্থকি মাঝ।

অন্য দিকে কৃষ্ণের—

অপরূপ পেখলু রামা।

কিন্তু দেখিয়াও চক্ষের তৃপ্তি নাই। একদিকে কৃষ্ণের উক্তি—

ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সনে তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥

অন্য দিকে রাধার আক্ষেপ—

সজনী, মঝু মনে লাগল নন্দকিশোর।
অনিমিখ লাখ নয়ন যুগ শত শত
হেরইয়ে না পাইয়ে ওর॥

উপাস্য দেবতার রূপ-মাধুর্য্যের বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। একদিকে জয়দেবের—

চন্দনচর্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী।

হইতে গোবিন্দদাসের—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।

পর্য্যন্ত; অন্য দিকে যমুনার তীর হইতে সেই 'ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি' যখন—

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

তখন দ্বিজ চণ্ডীদাসের বর্ণনায়—

মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
সোনার পুতলি কায়া।
তাহে নীল শাড়ী ভেদিয়া আঁচল
রূপ-অনুপম ছায়া॥

এই অপরূপ রূপানুসক্তির প্রেরণায় পূর্ব্বরাগের উন্মেষ, যাহা তিলে তিলে নূতন হইয়া অনুরাগে পরিণত হয়। ভক্ত কবি বলিয়াছেন, এ যেন দরিদ্রের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি—

নব রে নব রে নব দোঁহাকার প্রেম রে।
দরিদ পায়ল যেন ঘটভরা হেম রে॥

তাই জ্ঞানদাসের ভাষায়—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

কিন্তু ইহাতেও ব্যাকুলতায় দুঃখ। রাধার ধৈর্য্য আর বন্ধন মানে না—

কিবা সে নাগর কি খনে দেখিনু,
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥

তেমনি কৃষ্ণের বেদনা-বিধুরতা—

চম্পকদাম হেরি' চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তুয়ার সোহাগ॥

তাই অন্তরের ব্যাকুলতায় দেহের জন্য দেহ, হৃদয়ের জন্য হৃদয় কাঁদিয়া মরে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

তারপর আসে দুর্লভের আকাঙ্ক্ষায় দুর্গম পথে অভিসার—

ঘন আঁধিয়ার, ভুজগ ভয় কত শত,
পন্থ বিপথ নাহি মান।

কিন্তু কৃষ্ণনামের জপে সমস্ত ভয় কাটিয়া যায়, তাই—

শ্যামমন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।

এই প্রসঙ্গে বর্ষাভিসারের কয়েকটি সুপরিচিত পদ আছে, যেমন রায়শেখরের

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

অথবা

গগন অব ঘন মাহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।

যাহার মধ্যে বৃন্দাবনের নয়, বাংলা দেশেরই বর্ষার স্মৃতি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বর্ষার ঘনধারা যখন দিগন্তরাল মুছিয়া দিয়া বহির্বিশ্বের সঙ্গে অন্তরের ব্যবধান সৃষ্টি করে, তখন আপনাতে ফিরে-আসা নিঃসঙ্গ মনের যে অসীম বিরহ-দুঃখ, তাহাই যেন এই পদগুলিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

অভিসারের পরিণতি হইতেছে মিলন। তার পর আসে মান ও বিচ্ছেদ, যাহার বৃত্তান্ত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অপ্রতুল নয়। কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্য ও তাহার আনুষঙ্গিক আক্ষেপানুরাগের যে পদগুলি চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের রচনায় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত থাকিয়াও বিরহের যে আশঙ্কা, পাইয়াও হারাইবার যে উদ্বেগ, তাহাই হইতেছে পদাবলীর প্রেমবৈচিত্ত্য। যেমন, দ্বিজ চণ্ডীদাসের বর্ণনায়—

দুঁহু কোড়ে, দুঁহু কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

এই পদটি যেমন সুপরিচিত, তেমনি হইতেছে কবিবল্লভের বহুপ্রশস্ত—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।

যাহার চরম পংক্তিতে অসীম তৃপ্তির মধ্যে অতৃপ্তির অপার ব্যাকুলতা অপূর্ব্ব ভাষায় ধ্বনিত হইয়াছে—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

ইহার সহিত তুলনীয় বলরাম দাসের দুইটি সহজ সরল পদ—

সাজায়ে বদন নিরখয়।
তবু আঁখি তিরপিত নয়॥

এবং

সাজাঞা কাচাঞা বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লইয়া হাতে মুখ নিরখিতে
নয়ন তিতিল লোরে॥

কিন্তু বুকে-বুকে চোখে-চোখে রাখিয়াও তৃপ্তি নাই, তাই ইচ্ছা হয় যেন বুক চিরিয়া অন্তরের মধ্যে রাখিতে—

বুকে বুকে মুখে চোখে লাগি থাকে
সতত তবু হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥

আকাঙ্ক্ষার এই চিরব্যাকুলতা আছে বলিয়াই প্রেমের সার্থকতা, চিরনবীনতা। এমন কি, রূপ ও রাগের চরম পরিণতি—

সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।

এই আত্মনিবেদনের মধ্যেও আছে প্রেমের তপস্যা, ভোগের চেয়েও ত্যাগের কথাই বেশি। কারণ, পদাবলীর যেন শেষ কথা হইতেছে—

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হৃদয়ে লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

রামনিধি গুপ্ত

রামনিধি গুপ্তের বা নিধু বাবুর "টপ্পা" এক কালে এই দেশে যথেষ্ট আদৃত ছিল। নিধু বাবুই যে এই শ্রেণীর গান বাংলায় প্রথম রচনা করিয়াছিলেন, তাহা না হইতে পারে; তথাপি এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে তাঁহার "বাঙ্গালার শোরি মিঞা" এই গৌরবাস্পদ আখ্যা একেবারে নিষ্ফল নয়। আধুনিক রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে নিধু বাবুর গানের আর সেরূপ আদর দেখা যায় না, তথাপি গান হিসাবে ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ হইতে এই গানগুলির মূল্য যথেষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

নিধু বাবুর গানসমূহের বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তদ্রচিত "গীতরত্ন গ্রন্থ" ১২৪৪ সালে প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হয়। ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে আছে। ইহা নিধু বাবুর রচিত সমস্ত টপ্পার সংগ্রহ বলিয়া প্রচারিত। ইহার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে—সেটি গ্রন্থাকারের নিজের রচনা বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে উক্ত গ্রন্থ আবার "তদাত্মজ[২] জয়গোপাল[৩] গুপ্ত" কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও নিধু বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত[৪] হইয়া ১২৭৫ সালে

১। ইহার পত্রসংখ্যা ।৶০+১৪১। পরিষদ্ গ্রন্থাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহার ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠা নাই। ইহার টাইটেল পেজ বা পরিচয়-পত্র এইরূপ—শ্রীশ্রীরামঃ। / শরণং /, গীতরত্ন / গ্রন্থ /, শ্রীরামনিধি গুপ্ত / রচিত / গৌড়িয় সাধুভাষায় নানা প্রকার ছন্দে / রাগ রাগিনা সহিত শংশোলিত হইয়া /, সন ১২৪৪ শালে / কলিকাতা বিদ্যোদ প্রেষে / মুদ্রিত হইল। / এই পুস্তক শোভাবাজার ৺নন্দরাম সেনের / ইষ্ট্রিটে নং ২০ বাটিতে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।/,

২। *Bengal Academy of Literature* (vol I, no 6. (1893) p. 4)এ জয়গোপাল গুপ্তকে ভ্রমক্রমে নিধুবাবুর অনুজ বলা হইয়াছে।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে জয়গোপালকে ভ্রমক্রমে জয়চন্দ্র বলা হইয়াছে।

৪। এই জীবন-বৃত্তান্ত জয়গোপাল-লিখিত নহে, প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধু বাবুর যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সঙ্কলিত। কেবল উল্লিখিত জীবনীতে "পক্ষীর দল" ও আখড়াই গাওনা সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

প্রকাশিত হয়; এ পুস্তকখানি তৃতীয় সংস্করণ[৫]। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বোধ হয়, ১২৬৩ সালে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইহা আমাদের অধিগত হয় নাই। উল্লিখিত তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে জয়গোপাল গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কবিবর ১২৪৪ সালে তাঁহার রচিত গীতগুলি গীতরত্ন নাম দিয়া প্রথম বার মুদ্রিত করেন; বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত প্রথম মুদ্রাঙ্কণ উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে। এই সংস্করণের সহিত প্রথম সংস্করণের অবিকল মিল আছে, পত্রাঙ্কও প্রায় একরূপ; কেবল ইহাতে নিধু বাবুর কিঞ্চিৎ জীবনী, সাতটি আখড়াই সঙ্গীত, একটি ব্রহ্মসঙ্গীত, একটি শ্যামাবিষয়ক গীত ও একটি বাণী-বন্দনা বেশী দেওয়া আছে।

এই গীতরত্ন গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ উল্লেখযোগ্য; ইহা বটতলা হইতে ১২৫৭ সালে প্রকাশিত এবং ইহাও তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে লেখা আছে যে, "এই গীতরত্ন গ্রন্থ যাহা রামনিধি গুপ্ত কর্ত্তৃক অশক্তাবস্থায় ও বিস্তর অশুদ্ধ সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য দ্বারা সুধাসিন্ধু-যন্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল।" ইহাতে বহুসংখ্যক আদিরসাত্মক গান আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি গীতরত্ন ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, এবং নিধুবাবুর গানের সহিত অন্যান্য লোকের রচিত বিস্তর টপ্পাও মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, বটতলায় কিরূপ সংশোধন হইয়াছিল।

১২৫২ সালে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর তাঁহার "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে" বাঙ্গালা ভাষার গান মুদ্রিত করেন[৬]। তাহাতে নিধু বাবুর রচিত সার্দ্ধ-শতাধিক গান স্থান পাইয়াছে। ইহার গানগুলি অধিকাংশ গীতরত্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং গীতরত্নের ধারানুসারে গান-বিন্যাস করা হইয়াছে; কেবল আখড়াই সঙ্গীতগুলি শেষে না দিয়া গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে।

১২৯৩ সালে আশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট

৫। ইহার টাইটেল পেজ এইরূপ—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। গীতরত্ন গ্রন্থ। ৺রামনিধি গুপ্ত প্রণীত। কবিতা সমূহ ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। তৃতীয় সংস্করণ। কলিকাতা। এম, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত। নং ৬৫ আহীরীটোলা। ১২৭৫। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।—ইহার পত্রসংখ্যা ২+১।০+১৪৮ (১৪০ পৃঃ পর্য্যন্ত টপ্পা। ১৪১—১৪৮ পৃঃ আখড়াই ও ব্রহ্ম-সংগীতাদি)।

৬। সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের বঙ্গাংশ বা তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪—৩১২ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" বা "কবিবর নিধু বাবুর রচিত গীতাবলী" পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রায় ১৬০ গান আছে; কিন্তু গ্রন্থের কাটৃতি সম্ভাবনায় নিধু-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ গীত অপরাপর ব্যক্তির রচিত এবং নিধু বাবুর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য বেশী নহে।

আধুনিক সময়ে বটতলা হইতে বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা সমেত "গীতাবলী" বা "নিধু বাবুর (৺রামনিধি গুপ্তের) যাবতীয় গীতসংগ্রহ" পুস্তকে উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ হইতে নিধু বাবুর পদ উদ্ধার করিয়া একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে বিশেষ ফলবতী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এ পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া লিখিত আছে; ইহার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখি নাই। তারিখ ১৩০৩।

উল্লিখিত সংগ্রহগুলি ছাড়া কতকগুলি বিবিধ বাংলা সঙ্গীতসংগ্রহে নিধু-বাবুর অনেকগুলি গীত চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "সঙ্গীত-সারসংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ (১৩০৬), বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত ভূমিকা-সম্বলিত "রসভাণ্ডার" (১৩০৬), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সঙ্কলিত "প্রীতিগীতি" (১৩০৫), "বাঙ্গালীর গান" (বঙ্গবাসী প্রকাশিত), দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়" দ্বিতীয় খণ্ড (ইং ১৯১৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল সংগ্রহে মুদ্রিত অধিকাংশ গীতাবলী নূতন করিয়া সংগৃহীত নহে, উল্লিখিত গীতরত্ন প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

নিধু বাবুর টপ্পার এই সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে গীতরত্ন গ্রন্থখানিকে আদি ও প্রামাণিক ধরা যাইতে পারে। কিন্তু গীতরত্নের মধ্যেই এমন অনেক গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা নিধু বাবুর কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গীতরত্ন গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠায়[৭] নিম্নলিখিত গানটি দৃষ্ট হইবে—

এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে;
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥

৭। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গীতরত্ন গ্রন্থের যে পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ আছে, তাহা (অন্য সঙ্কেত না থাকিলে) তৃতীয় সংস্করণের পত্রাঙ্ক বুঝিতে হইবে।

অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

কিন্তু তারাচরণ দাস-চরিত "মন্মথ-কাব্য"এর ৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়,—

এই কি তোমার সই ছিল রে মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥ হে
চিত্রা কি চিত্রে চিত্রে দহিসে কেনে।
যে চিত্র করিলে কোথা পাব সে জনে॥[৮]
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

উদ্ধৃত গানেতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু অন্য অনেক গানে উভয় পুস্তকে অবিকল ঐক্য দেখা যায়। যথা,—গীতরত্ন ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "প্রবল প্রতাপে বুঝি প্রাণ তুমি কি ভূপতি হলে" মন্মথকাব্যের ৫৯ পৃষ্ঠায় অবিকল পাওয়া যায়। এইরূপ মন্মথকাব্যের প্রায় ২১টি গান গীতরত্নে দেখা যায়।

বটতলা-প্রকাশিত নিধু বাবুর "গীতাবলী"র ভূমিকায় ও "মন্মথ-কাব্যে"র ১২৬৯ সালে পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সময়ে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্যে যে সকল গীতের ঐক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় মন্মথকাব্য-প্রণেতা তারাচরণ দাসের রচনা। কারণ, তারাচরণ দাস রাজা নবকৃষ্ণের সমকালীন ও তদাজ্ঞায় প্রণীত মন্মথ-কাব্য প্রায় একশত বৎসরের অধিক হইল রচিত হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "রামনিধি ১২৪৪ সালে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে যদি স্বয়ং গীতরত্ন ছাপাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গীতের খাতাতে অপরের রচিত যে সকল উত্তমোত্তম গীত উদ্ধৃত ছিল, তাহা তিনি অশক্তাবস্থাপ্রযুক্ত সংশোধন ও নির্ব্বাচন না করিয়া মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন।" এই মতের বিরুদ্ধে দুএকটি আপত্তি আছে। প্রথমে দেখিতে হইবে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্য ইহার কোনখানি অপরটির পূর্ব্বে রচিত। আমরা পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে যে একখানি

৮। এই দুই পংক্তি গ্রন্থ-বর্ণিত মদনমুঞ্জরীর মনমোহনের চিত্রপট দর্শন প্রসঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

মন্মথ-কাব্য পাইয়াছি তাহার টাইটেল পৃষ্ঠা বা মুদ্রণ-তারিখ নাই। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-রচনার সময় সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করা আছে—

শাকে যুগ্মরসাদ্রিচন্দ্রবিমিতে লেয়ে গতে পূষণি
পক্ষে নন্দসুতস্য নামমিলিতে বারে বিধৌ বাণতিথৌ।
বাবুশ্রীনবকৃষ্ণদাসকৃপয়াপ্যারভ্য কাব্যং শুভং
শ্রীতারাচরণাভিধেয়রচিতং সম্পূর্ণতামাপিতম্॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, মন্মথ-কাব্যের রচনা ১৭৬২ শকে অথবা ১২৪৭ সালে বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায় সমাপ্ত হইল। যদি মন্মথকাব্য ১২৪৭ সালে রচিত হয়, তাহা হইলে গীতরত্নের তিন বৎসর পরে ইহার রচনা-সমাপ্তির কাল। উপরোদ্ধৃত শ্লোকে ও গ্রন্থের সর্ব্বত্র "বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায়" এইরূপ ভণিতা আছে; কুত্রাপি রাজা নবকৃষ্ণ বলা হয় নাই। গ্রন্থকার যেখানে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সেখানেও বলিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়। মনমথ কাব্য রচি ভাবি শারদায়॥" (পৃঃ ৭)। নবকৃষ্ণের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বাবু নবকৃষ্ণ ও শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ যে এক ব্যক্তি, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তার পর নবীনবাবু নিধু বাবুর অশক্তাবস্থার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, সংবাদ-প্রভাকরে নিধু বাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা নিধু বাবুর পুত্র জয়গোপাল গীতরত্নের প্রারম্ভে পুনর্মুদ্রিত করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যদিও মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৬ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; কেবল মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ও অবশিষ্ট সময় নানাবিধ বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকপাঠে কাটাইতেন[১]। নিধু বাবু স্বয়ং গীতরত্নের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের সময় সবিশেষ সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তারাচরণকৃত এক আধটি নহে—একুশটি গান যে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা অনবধানবশতঃ স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়

১। গীতরত্ন, পৃঃ ৫০; সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১।

না। আমাদের বোধ হয় যে, আলোচ্য গানগুলি নিধু বাবুরই রচিত; তারাচরণ স্বীয় কাব্যের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধির জন্য সেগুলি নিজের রচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শুধু মন্মথ-কাব্যে নহে, এইরূপ বনওয়ারীলাল-প্রণীত "যোজনগন্ধা", মুন্সী এরাদোত-প্রণীত "কুরঙ্গভানু" (১২৫২) প্রভৃতি কাব্যেও গীতরত্নের অনেকগুলি গান চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সকল কাব্যে দু'একটি এমন গান উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা নিধু বাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। যথা—মন্মথকাব্যে উদ্ধৃত (পৃঃ ১২০) "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন"[১০] গানটি নিধু বাবু তাঁহার প্রথম স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধ এবং জয়গোপাল গুপ্তের সঙ্কলিত জীবনীতেও এই কথা আছে। বোধ হয়, নিধু বাবুর টপ্পা তৎকালে এরূপ বিখ্যাত ও সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে, তাহা স্বীয় গ্রন্থে তুলিয়া দিতে কোনও গ্রন্থকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; আধুনিক সময়েও এইরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বিখ্যাত গান বিবিধ নাটক নভেলে "কোটেশন" চিহ্ন ব্যতিরেকেও উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিধু বাবু তাঁহার জীবদ্দশাতেই গীতরত্ন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। সুতরাং উক্ত পুস্তক যে তাঁহার টপ্পার আদি ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংগ্রহ, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইহার ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দররূপ ব্যক্ত থাকাতে কোনমৎ প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না। এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণবশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরিপুর্ন্নিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আসঙ্কাপ্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আপ্ত বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিরদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল।" অবশ্য গীতরত্নে অনবধান-প্রযুক্ত অপরের দু'একটি গান আসিয়া পড়ে নাই

১০। গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯।

অথবা নিধু বাবুর দুএকটি গান যে বাদ পড়ে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পরবর্ত্তী সকল সংগ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত।

বাস্তবিক প্রাচীন কবিগান বা টপ্পা-লেখকদের রচনা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বা বিশুদ্ধরূপে সংগৃহীত হয় নাই; এরূপ সংগ্রহের বোধ হয় বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। কোন্‌টি কাহার পদ, তাহা নির্ব্বাচন করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য, এবং অনেক গান এক বা ততোধিক রচয়িতার নামে এরূপ চলিয়া আসিতেছে যে, এতকাল পরে তাহা প্রকৃত কাহার রচনা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উদাহরণস্বরূপে এই গানটি—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু-মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্যে দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

একাধিক্রমে শ্রীধর কথক, রাম বসু ও নিধু বাবুর বলিয়া বিবিধ সংগ্রহে দেখা যায়। ইহা খুব সম্ভব, প্রথমোক্ত ব্যক্তির রচনা। গীতরত্ন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু গীতরত্নে যে নিধু বাবুর সমস্ত গান আছে, তাহাও বোধ হয় বলা যায় না। "নয়নেরে দোষ কেন। মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন। আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন॥" অথবা, "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" প্রভৃতি গান নিধু বাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, এবং "সঙ্গীতসারসংগ্রহ" (পৃঃ ৮৭৫ ও ৮৫১), "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ১৫৩ ও ১২৭), "রসভাণ্ডার" (পৃঃ ১০৭) প্রভৃতি সংগ্রহে নিধু বাবুরই বলিয়া দেওয়া আছে; কিন্তু গীতরত্নে একেবারে পরিত্যক্ত হওয়াতে অনেক সময় সন্দেহ হয়, এগুলি প্রকৃতই নিধু বাবুর কি না। এইরূপ "তবে প্রেমে কি সুখ হত। আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥" ইত্যাদি সুন্দর গানটি "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ৩৭৬) ও "নিধু বাবুর গীতাবলী" (পৃঃ ১৭২) প্রভৃতি পুস্তকে নিধু বাবুর বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু অনেকের মতে ইহাও শ্রীধর কথকের রচিত, এবং গীতরত্নেও ইহা পরিত্যক্ত। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। টপ্পা-রচনায় নিধু বাবুর এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী অনেক টপ্পা তাঁহার রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমে" (পরিষৎ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড,

পৃঃ ২৯৪) "ককারে আকার অর ছাড়ি লয়ে দীর্ঘ ঈকার বল" শীর্ষক উদ্ভট গানটি নিধু বাবুর গীতের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইহা পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী রামলোচন ঘোষের পুত্র "গীতাবলী"-প্রণেতা আনন্দনারায়ণ ঘোষের রচনা এবং উক্ত গানের শেষে তাঁহার নামের এইরূপ ভণিতা আছে,—"আনন্দের নিবেদন মন দিয়া শুন মন" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ১৪৮) আছে; কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের অতিরিক্ত গানের মধ্যে, প্রথম সংস্করণে নয়। আশুতোষ ঘোষাল-সংগৃহীত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" দ্বিতীয় খণ্ডে নিধু বাবুর যে সকল গান দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীধর কথক, কালী মির্জ্জা, ছাতু বাবু প্রভৃতি অপরাপর লোকের বিস্তর গান মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরাগে রচিত "কেন রে ভ্রমরা তুমি যাবে পদ্মবন" গানটি "গায়নহ্রদকুমুদ"[১১] ২৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে; সমস্ত গীতরত্নে নিধু বাবুর শ্রীরাগের গান নাই। কিন্তু গায়নহ্রদকুমুদের (পৃঃ ২৪) "দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন" গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ২৭) পাওয়া যাইবে। "সঙ্গীতসারসংগ্রহে" (পৃঃ ৮৭৪), বটতলা-প্রকাশিত "নিধু বাবুর গীতাবলী"তে (পৃঃ ১৭২), এবং অনাথকৃষ্ণ দেবের "বঙ্গের কবিতা"য় (২৯৪)—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
আমি এই মাত্র চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থাক এ দেহে সকলি সবে॥

গানটি নিধু বাবুর বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহা জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক-রচিত[১২] এবং গীতরত্নে বর্জ্জিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি এইরূপ—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে দেহে প্রাণ না রহিবে॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান পলকে নিশ্চিত প্রাণ
অবশ্য অন্তর হলে প্রলয় হইবে তবে॥
কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই আমি মাত্র এই চাই
তুমি সুখে থাক মম শব দেহে সব সবে॥

১১। গায়নহ্রদকুমুদ বিভিন্ন লোকের রচিত কবিতার সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহা বংশীধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং বটতলা হইতে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত।

১২। প্রীতি-গীতি, পৃঃ ৪৬১।

এমন কি, "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা"য় (পৃঃ ৪০) "পিরীতি পরম রতন" শীর্ষক যে গানটি নিধু বাবুর বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত পদ্মাবতী নাটকে দেখা যায়। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন কবি বা গীতরচকদিগের পদাবলী বিশুদ্ধরূপ উদ্ধার বা নির্ব্বাচন করা কি প্রকার কষ্টসাধ্য। তথাপি গীতরত্ন গ্রন্থ যখন নিধু বাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এতকাল তাঁহার আদি ও প্রামাণিক গীতসংগ্রহ[১৩] বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন ইহাকেই তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ ধরিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।[১৪]

এই ত গেল নিধু বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে। তারপর নিধু বাবুর জীবন-বৃত্তান্ত। রামনিধি গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা শুধু ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে লিখিত জীবনী হইতে। গীতরত্নের তৃতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে যে জীবন-বৃত্তান্ত আছে, তাহাও প্রভাকর হইতে সঙ্কলিত। এই সমস্ত স্থল হইতে সারাংশ লইয়া রামনিধির জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে নিকটস্থ ত্রিবেণীর চাঁপতা গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল কলিকাতা কুমারটুলীতে। এই পৈতৃক বাটী নন্দরাম সেনের গলিতে অবস্থিত।

১৩। পরিষৎ-প্রকাশিত সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমের ভূমিকায় (পৃঃ ৪) উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হিন্দী ও বাংলা পুস্তকের তালিকায় রামনিধি গুপ্তকৃত গীতাবলীর উল্লেখ আছে; ইহার দ্বারা বোধ হয়, গীতরত্নই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

১৪। গীতরত্নে যে নিধু বাবুর অনেকগুলি গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা তৎপুত্র জয়গোপাল উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,—"অনেকে কহিয়া থাকেন যে, যে সকল কবিতা লোকে নিধু বাবুর বলিয়া শুনাইয়াছে এবং যে সকল কবিতা আমরা জ্ঞাত আছি সে সকল কবিতা এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে, যে সকল গীত তাঁহার বলিয়া মহাশয়েরা জানেন এবং যাহা তাঁহার বলিয়া শুনায় সে সকল তাঁহারি গীত বটে কারণ তাঁহার গীত অসংখ্য, সে গীত সকলের আদর্শ রাখা হয় নাই বলিয়া ইহার ভিতর সন্নিবেশ হয় নাই, আর যখন সে সকল গীত রচনা হইয়াছিল, তখনকার লোক পরম্পরায় মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গীত এই ক্ষণে সংগ্রহ কিম্বা সংশোধন করিবার উপায় নাই তাহার ভিতর বিস্তর অশুদ্ধ পদ এবং কথা শুনিতে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে নিরস্ত রহিতে হইল। ইহাতে মহাশয়েরা ক্ষোভিত হইবেন না।" (গীতরত্ন, পৃঃ ৸৵৹)

নিধু বাবুর পিতা হরিনারায়ণ ও পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ বর্গীর হাঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত চাঁপতা গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১১৫৪ সালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই স্থানেই নিধু বাবুর বিদ্যাশিক্ষা হয়। সংস্কৃত ও পারস্য ভিন্ন তিনি কোনও পাদরী সাহেবের নিকট কিছু ইংরেজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩৯)। রামনিধি ১১৬৮ সালে সুখচর গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন এবং ১১৭৫ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান লাভ করেন। অনন্তর ৩৫ বৎসর বয়সে[১৫] নিধু বাবু নিজ পল্লীবাসী ছাপরা কালেক্টারের দেওয়ান রামতনু পালিতের আনুকূল্যে উক্ত কালেক্টারীতে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে পালিত মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন জনাই গ্রামবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, এবং নিধু বাবু তাঁহার কেরাণীগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ছাপরায় অবস্থানকালে নিধু বাবু অবকাশমত সঙ্গীত-বিদ্যায় সুপণ্ডিত জনৈক যবন গায়কের নিকট সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। যখন ঐ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিল, তখন তিনি ওস্তাদের শিক্ষাদানে কার্পণ্য বুঝিতে পারিয়া যাবনিক গীতশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, আপনিই হিন্দী গীতের আদর্শে রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া বঙ্গভাষায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার বাংলায় টপ্পা রচনার সূত্রপাত। প্রায় ১৮ বৎসর[১৬] ছাপরায় কর্ম্ম করিবার পর উৎকোচাদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে দেওয়ান জগন্মোহনের সহিত মতান্তর হওয়াতে সদাচারনিষ্ঠ রামনিধি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটি ও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে নিধু বাবু শোকাকুল হইয়া "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন" (গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯) ইত্যাদি গান রচনা করেন। তদনন্তর ১১৯৮ সালে জোড়াসাঁকোতে নিধু বাবু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে সংসার অতি শীঘ্রই গত হইয়াছিল। ১২০১ বা ১২০২ সালে বরিঝাটি চণ্ডীতলা গ্রামের হরিনারায়ণ সেনের তৃতীয়া কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। এই সংসারে তাঁহার

১৫। *Bengal Academy of Literature*, vol. I, no 6. p. 4.

১৬। *Bengal Academy of Lit., loc. cit.* যদি ইহা ঠিক হয়, তবে তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাগমনের তারিখ ১২০১ বা ১২০২ হয়; কিন্তু তাহা হইলে তিনি ১১৯৮ সালে কিরূপে কলিকাতায় দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন?

চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল গীতরত্ন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক।

শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে[১৭] একখানি বড় আটচালা ছিল। সঙ্গীতরসজ্ঞ নিধু বাবু প্রতি রজনী তথায় গিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেন এবং সহরের প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার টপ্পা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। নিমতলানিবাসী নারাণচন্দ্র মিত্র-গঠিত "পক্ষীর দলের"ও উক্ত আটচালায় বৈঠক বসিত। এই পক্ষীর দলে সকলে গঞ্জিকাসেবী হইলেও ভদ্রসন্তান, উপস্থিত-কবি ও সৌখীন-নামধারী বাবু ছিলেন, এবং নিধু বাবুকে তাঁহারা যথেষ্ট মান্য করিতেন[১৮]। বটতলার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে বাগবাজারস্থ রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটীতে কিছুদিন নিধু বাবুর বৈঠক হয়। নিধু বাবু পেশাদারী গায়ক বা কবিওয়ালা ছিলেন না, তথাপি তাঁহারই উদ্যোগে ১২১২-১৩ অব্দে[১৯] দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। বাগবাজারনিবাসী মোহনচাঁদ বসু সাবেক আখড়াই পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাফ-আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন; মোহনচাঁদ আখড়াই গাহনা নিধু বাবুর নিকট শিক্ষা করেন[২০]।

উক্ত জীবনবৃত্তান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, নিধু বাবু সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ, ও পরোপকারী ছিলেন। যদিও তিনি নিজ গুণে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও কোনও বড় লোকের তোষামোদ করেন নাই, নিজের মান বজায় রাখিয়া চলিতেন।

১৭। প্রভাকরে প্রকাশিত জীবনী হইতে জানা যায় যে, এই আটচালা শোভাবাজার বটতলানিবাসী এমেরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছদ্দি রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

১৮। ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ সংবাদ-প্রভাকরে দ্রষ্টব্য।

১৯। ১২১১ সাল (প্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১)।

২০। গীতরত্ন, বিজ্ঞাপন, পৃঃ ৸৶০। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে নিধু বাবুর টপ্পার কথা বলিয়াছি, আখড়াই গান সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করি নাই। আখড়াই গাহনার বিবরণ ও ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত-লিখিত নিধু বাবুর জীবনীতে পাওয়া যাইবে। (সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র, ১২৬১)।

তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে কেহ তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। ইহা সত্বেও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দু-একটি অপবাদ ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক এইরূপ লিখিয়াছেন: —"মুরসিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া বহুদিন অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিদিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদপ্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনা ছিল। এই বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত, এবং বাবুও তাঁহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন, এই শ্রীমতী নিধু বাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা, কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীয় অনেকে একথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন, তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্যপরিহাস কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন। আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহারই এক২ গীত রচনা করিতেন। এবং সেই গীত সকল রাগে এবং সকল তানে গান করিতেন, এতাদৃশ যে যখন যে গীত যে রাগে গান করিতেন বোধ হইত যে এ গীত এই রাগে উদ্ভব হইয়াছে।" (গীতরত্ন, পৃঃ ॥০; সংবাদ-প্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১)। এইরূপ সুখ ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিয়া প্রায় ৯৭ বৎসর বয়সে, ২১শে চৈত্র ১২৪৫ সালে, নিধু বাবু দেহত্যাগ করেন। শেষ বয়সে অনেক শোকতাপ পাইলেও তিনি শারীরিক নিয়ম এত যত্নের সহিত পালন করিতেন যে, আমরণ সুস্থ শরীরে কাটাইয়াছিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁহার রচিত গানে কেবল সঙ্গীতকুশলতা নয়, অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত, পারসী ও অল্প অল্প ইংরেজীও জানিতেন। অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভটশ্লোক-মূলক; যথা—

মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ আইল মনোরঞ্জন
গাও এমন কল্যাণ।
নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পূর,
ভুরু আম্রশাখা তাহে বাখান॥

কেহ কয় অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুর শ্বাস, হয় ত বিধান।
কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১১)[২১]

ভারতচন্দ্রের স্থায় পারস্য হইতে ভাব আহরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। "প্রীতিগীতি"র সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন[২২] যে, নিম্নোক্ত দুইটি ছত্র হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল অনুবাদ—

ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে বল না আমারে॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৫৫)

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, নিধু বাবুর গানের ভাব অনেক হিন্দী টপ্পায় পাওয়া যায়।

আধুনিক সময়ে অনেকের ধারণা আছে যে আদিরসাত্মক প্রণয়-সঙ্গীত মাত্রই টপ্পা, এবং আদিরস অর্থে এখানে হীন ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির প্রকাশ বুঝায়; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার বাঙ্গালা শব্দকোষে "টপ্পা" হিন্দী শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়া ইহার মৌলিক অর্থ "লম্ফ" এবং গীতের অর্থ "সংক্ষিপ্ত লঘুপ্রকৃতি গীত" দিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, ধ্রুপদ খেয়ালের মত টপ্পা গীত-রচনার রীতিবিশেষ। কোনও বিশেষজ্ঞ লেখক এই রীতির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—"টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ; তাহা হইতে রূঢ়ার্থ, সংক্ষেপ; অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক; অস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। টপ্পাতে প্রাচীন রাগের মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, এবং কালাংড়া আর আধুনিক রাগের মধ্যে কাফী, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোঁয়া, ইমন, ও লুম ব্যবহৃত হয়। আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। গানের এক পৃথক্ রীতির নাম টপ্পা; ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।"[২৩]

২১। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত গানগুলিতে মূলের বানান ও পংক্তিবিন্যাস অবিকল রাখা হইয়াছে।

২২। প্রীতি-গীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ২।৶০।

২৩। "সঙ্গীত-তানসেন" গ্রন্থে (১২৯৯) গীতের দুই প্রকার রীতি কথিত হইয়াছে— ধ্রুপদ ও রঙ্গীন গান। ধ্রুপদ গান প্রায় ২৪ প্রকার ও রঙ্গীন গান প্রায় পঞ্চাশ প্রকার

নিধু বাবু যখন টপ্পা গান গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন এক দিকে ভারতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব, অন্য দিকে কবিগানের পূর্ণ গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ যদি ১১৬৭ হয়, তবে সে সময় নিধু বাবু উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক মাত্র। ভারতচন্দ্রের নাম ও প্রভাবের মধ্যেই তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা। এই প্রভাবের জের "কামিনীকুমার" "চন্দ্রকান্ত" প্রভৃতি বিদ্যাসুন্দর ধরণের বিকৃতরুচি কাব্যের ভিতর দিয়া ইংরেজী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মদনমোহনের "বাসবদত্তা"য় প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দিকে রাসু, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরু ঠাকুর, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি পুরাতন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালারা সকলেই নিধু বাবুর সমসাময়িক। আধুনিক সময়ের ধারণা, কবিগান খেউড়, উহা অশ্লীলতাময়। কবিগানের বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু বস্তুতঃ আদৌ কবিগান সেরূপ ছিল না; রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অন্যান্য পুরাতন জিনিষের ন্যায় যখন কবিগানের আদর কমিয়া গেল, তখন এই শ্রেণীর গীতিও শিক্ষিত-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতরসমাজে উপনীত হইয়া খেউড়ে পরিণত হইতে লাগিল। যাহা হউক, কবিগান তখন কেবলমাত্র খেউড় না হইলেও ভারতচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় পুরাতন সাহিত্যের জের মাত্র। বিরহ, গোষ্ঠ, মান, দান, মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত ছিল কবিগানের প্রধান অঙ্গ এবং এই হিসাবে ইহা পুরাতন বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক অভিনব শাখা মাত্র। যদিও বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় সকল কবিওয়ালাদের প্রতিভা ও তন্ময়তা ছিল না, তথাপি নানা কারণে কবিগানকে বৈষ্ণব-গীতির এক নিম্নতর সংস্করণ ধরা যাইতে পারে। নিধু বাবু পুরাতন সাহিত্যের এই দুই পথের কোনও পথ অবলম্বন করেন নাই। তখন ভারতচন্দ্রের বাতাস অতিক্রম করা বা কবিগান রচনা না করিয়া নূতন ধরণের গান রচনা করা কম সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক ছিল না। তখনকার গীতি-সাহিত্যে নিধু বাবু সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র পথাবলম্বী। এক দিকে বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ, অন্য দিকে কবিগান ইত্যাদি, ইহার কোনও দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া নিধু বাবু হিন্দী খেয়াল টপ্পা ভাঙিয়া বাঙ্গালায় নূতন ধরণের প্রেম-সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত গানই প্রেম-বিষয়ক; কিন্তু

উক্ত হইয়াছে। খেয়াল ও টপ্পা রঙ্গীন গানের একটি বিশেষ প্রকার মাত্র। (পৃঃ ৬৬-৬৯)। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে বাঙ্গালা রঙ্গীন গানের মধ্যে নিধু বাবুর টপ্পা ধরা হইয়াছে।

তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যাসুন্দরের নাম-গন্ধও নাই। কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি, ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, পরকীয় ভাব অবলম্বন করেন নাই। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে নিধু বাবুর স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মোটামুটি ধরিলে প্রাচীন সাহিত্য বহির্জ্জগৎ লইয়াই ব্যস্ত; কবি আপন অনুভূতি বা অন্তর্জ্জগতের কথা বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহা আবার পরের অনুভূতির ভিতর দিয়া। আধুনিক সাহিত্য অল্প-বিস্তর অন্তর্জ্জগৎ লইয়া; আপনার সুখ-দুঃখের কথা অথবা আত্ম-প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া পরের কথা বোঝা, ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। পুরাতন ভাব ও কাঠামো বজায় রাখিলেও নিধু বাবু তাহার মধ্যে যেটুকু নূতন ভাবের আলোক আনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন। গীতরত্নের সমস্ত গান রত্ন না হইলেও আধুনিক সময়ে যেরূপ উপেক্ষিত ও অনাদৃত, তাহারা বোধ হয় সেরূপ উপেক্ষা ও অনাদরের যোগ্য নহে।

বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, আধুনিক সময়ে এরূপ শক্তিশালী কবির সম্যক্ গুণ গ্রহণ করা হয় নাই; বরং তাহাকে উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাগই বেশী দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি দুএকজন গুণজ্ঞ সমালোচক সুখ্যাতি করিলেও নিধু বাবুর গানের সহিত একটা কালক্রমাগত অযথা অখ্যাতি জড়িত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, দেখিতেছি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় রসজ্ঞ লেখকও "অতি নীচ শ্রেণীর কবিতার করতোপ" বলিয়া নিধু বাবুর গানের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন।[২৪] তাই নিধু বাবুর মৃত্যুর মাত্র ষোল বৎসর বৎসর পরে ঈশ্বর গুপ্ত দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—"অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।"

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিধু বাবু নামমাত্রাবশেষ; তাঁহার টপ্পা অতি অল্প লোকেই পড়েন এবং অনেকে না পড়িয়াই ঘৃণা করেন। তাঁহারা বলেন, যে লোক জঘন্য অশ্লীল প্রণয়গীত রচনা করিয়া লোকের চরিত্র

২৪। বঙ্গদর্শন (পুরাতন পর্য্যায়), ৭ম-৮ম ভাগ (১২৮৭-৮৮)। নারায়ণ পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩৪) 'নিধু গুপ্ত' প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় নিধু বাবুর প্রতি সুবিচারে উদ্যত হইয়া এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পুরাতন মত অনেকদিন পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য তিনি দুঃখিত।

দূষিত করে, তাহাকে কবি বলিলে কবি নামের অবমাননা হয়। এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া নিধু বাবুর গীত সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য" পুস্তিকায় (১২৯২) লিখিয়াছেন,—"ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতা-দুষ্ট"। ইহা অপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করিয়া "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, এ সকল সঙ্গীতে যে প্রেমের আদর্শ, তাহা কুৎসিত অসংযত ইন্দ্রিয়লালসার নামান্তর মাত্র; ইহা "আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র।"[২৫] অবশ্য এরূপ বলা যায় না যে, নিধু বাবুর গানে মোটে অশ্লীলতা নাই; এখনকার মার্জ্জিত রুচি দ্বারা বিচার করিলে তাঁহার কতকগুলি গীত রুচি-বিরুদ্ধ বলিতেই হইবে। কিন্তু আজকালকার ও সেকালের রুচির যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল তাহা মনে রাখিতে হইবে; এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিভাশালী হইলেও কবি অনেক সময় সাধারণ লোকের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্রের অধীন। এরূপ অশ্লীলতা অপবাদ প্রাচীন কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাত-নাগাদ ঈশ্বরগুপ্ত পর্য্যন্ত অনেকেরই আছে; কিন্তু এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সমালোচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এ সমস্ত তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, নিধু বাবুর গীতাবলীর মধ্যে অশ্লীলতা অত্যন্ত বিরল। দুএকটি টপ্পা, কয়েকটি হাফ আখড়াই ও খেউড় ছাড়িয়া দিলে তাঁহার গানের রুচি সর্ব্বত্র সঙ্গত, এবং গানের মধ্যে ভোগ অপেক্ষা আত্মসমর্পণের কথাই অধিক। নিধু বাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীতও "নিধুর টপ্পা" বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গীতরত্ন গ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই এবং নিধু বাবুর গানেরও চর্চ্চা নাই; নিধুর টপ্পা অর্থে আধুনিক পাঠক বুঝেন, বটতলা-প্রকাশিত নিধুর নামে বিক্রীত জঘন্য টপ্পার সংগ্রহ। সেই জন্যই বোধ হয়, নিধুবাবুর গানের এত অশ্লীলতা অপবাদ। বাস্তবিক নিধু বাবুর রচিত টপ্পার মত সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী টপ্পা আর রচিত হয় নাই।

নিধু বাবুর রচনায় বিশেষ কারিগরি না থাকিলেও ভাষার যেমন লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা সুরলয়ের তেমনি পারিপাট্য, ততোধিক ভাবের কোমলতা ও

২৫। রস-ভাণ্ডার (বসুমতী কার্য্যালয়), ভূমিকা, পৃঃ ৵৹-৶৹।

গভীরতা। শব্দের ছটা, ছন্দোবৈচিত্র্য বা অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য নাই; এমন কি, চরণের মিল সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অমনোযোগী, তথাপি সাধাসিধে অল্প কথায় স্বভাব-কবির ভাবুকতায় প্রাণের আবেগ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর্ট বা শিল্পনৈপুণ্য হিসাবে হয় ত অনেকেই এ গানগুলিকে খুব উচ্চ স্থান দিবেন না; চরণের মিল, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিধু বাবুর রচনা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নয়। অনেকে আবার হয়ত ইহার মামুলী সেকেলে কাঠামো পছন্দ করিবেন না। নিধু বাবুর অতি অল্প গানই আছে, যাহার সমস্তটা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; কবি যে প্রেরণার বশে গাহিতে বসিয়াছেন, তাহা অনেক সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। এই দোষ অল্প-বিস্তর অধিকাংশ কবিওয়ালাদের মধ্যেও দেখা যায়। নিত্যানন্দ বৈরাগীর—

> বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
> শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
> নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো
> সুধা বরিষিলো শ্রবণে।[২৬]

এই মহড়াটি সুন্দর; কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী অন্তরা ও চিতেন ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। নিধু বাবু হইতেও এইরূপ ক্রমভঙ্গের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

> সাধিলে করিব মান কত মনে করি
> দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১০০)

লাইন দুইটি নিখুঁত; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দুই লাইন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। এই সকল গীতরচকদিগের রচনা আমূল শেষ পর্য্যন্ত সমভাবাপন্ন বা নির্দ্দোষ নয়। নিধু বাবুর টপ্পাতেও এ সকল দোষ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, এই সমস্ত টপ্পার ভাব কদর্য্য ও অতি নীচশ্রেণীর অথবা ইহা ভাবসৌন্দর্য্য-বিহীন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারা যায় না। ভাবের মনোহারিতাই নিধু বাবুর গানের বিশিষ্টতা।

প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে, নিধু বাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, নিধু বাবুর মত স্বভাব-কবি পূর্ব্ব হইতে একটা

২৬। সংবাদ প্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৬১, পৃঃ ৭; কবিওয়ালাদিগের গীত-সংগ্রহ (ইং ১৮৬২), পৃঃ ১১০-১১১; সঙ্গীতসারসংগ্রহ (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৪৭।

মতামত বা ধারণা খাড়া করিয়া গীত রচনা করিতে বসেন নাই। পরন্তু যখন যে মনের ভাব উদয় হইয়াছে, তাহাই সুরলয়ে গঠিত করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু সখীসংবাদ, মান, বিচ্ছেদ, মিলন নয়, সহস্রতন্ত্রী হৃদয়-বীণায় প্রেমের কোমল স্পর্শে যে শত সহস্র ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহার প্রতিধ্বনি নিধু বাবুর গানের মধ্যে বিভিন্ন আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেম-সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যে নূতন নয়; কিন্তু প্রেমের স্বর চিরপরিচিত হইলেও চিরমুগ্ধকর। যুগে যুগে কবিগণ প্রেমের গান গাহিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু এই অপূর্ব্ব অনুভূতির আলোক বিভিন্ন কবি-হৃদয়ের স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া যুগে যুগে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার অন্যান্য মধুর প্রেম-সঙ্গীতের সহিত নিধু বাবুর রচনাও গীতি-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

নিধু বাবুর প্রেম-সঙ্গীত যে শুধু ইন্দ্রিয়লালসা বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতামূলক নয়, আমরা নিধু বাবুর গীতিগুলি আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রায় সমস্ত টপ্পাগুলি প্রেম-বিষয়ক। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই প্রীতির প্রশংসা করিয়াছেন; আমাদের কবিও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> পিরীতি না জানে সখী সে জন সুখী বল কেমনে।
> যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৭৭)

প্রেমমুগ্ধ কবি প্রেমের কথা বলিতে গিয়া আত্মহারা—

> পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
> শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর সিহরে॥ (ঐ, পৃঃ ১২৫)

যে প্রেম জানে না, সে সুখীও নয়, দুঃখীও নয়; প্রেমের সুখ-দুঃখই জীবনের প্রধান অনুভূতি—

> নহে সুখী নহে দুঃখী প্রেম নাহি জানে।
> সুখী দুখী সেই সখী এ রস যে জানে॥ (ঐ, পৃঃ ২১)

কিন্তু প্রেম শুধু ধ্যান-ধারণার জিনিস নয়; হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ, তৃষ্ণা তৃপ্তি, পুণ্য পাপ, এ সকলের মন্থন-ধন প্রেম জীবনের একটি বাস্তব অনুভূতি। যত দিন দেহ আছে, প্রেম দেহসম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না। এইখানেই নিধু বাবুর ধারণার সহিত অনেক আধুনিক কবির ধারণার পার্থক্য। অনেক আধুনিক কবির প্রেম দেহসম্পর্ক-শূন্য স্বপ্নময় কাল্পনিক বস্তু। তাঁহাদের

মতে প্রেম ইন্দ্রিয়গত না হইলেও চলে; ভালবাসিবার জন্ত আধুনিক কবিগণ একটি কাল্পনিক প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু সে কালের কবিগণ ইহাতে তৃপ্ত হইতেন না; এ কালের কবিগণও কোথায় তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন। শুধু একটি দূর মানসী প্রতিমার মিলনের প্রতীক্ষায় না বসিয়া প্রকৃত পৌত্তলিকের স্তায় হাত-পা-চোখ-মুখ-সম্বলিত একটি জীবন্ত প্রতিমার আরাধনায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিতেন। এই পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগকে বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। এই জন্ত তাঁহাদের লেখা শুধু একটা অপরিস্ফুট গীতোচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই।

কিন্তু প্রেম দেহ আশ্রয় করিয়া জাগিলেও আবার দেহকে ছাড়াইয়া যায়। সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন যে, প্রেমের প্রথম জন্ম—চোখের নেশায়। এই জন্ত রূপ বা আঁখির মিলন কবি ও ঔপন্তাসিকের প্রিয় বস্তু। "উভয় মন সংযোগ নয়ন কারণ তায়।" (গীতরত্ন, পৃঃ ১০৯)। প্রিয় জনকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার কামনা প্রেমের একটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ ও আনুষঙ্গিক ফল।

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১১৯)

অদর্শনে দুঃখ, দর্শনে সুখ। চোখের দেখায় যে সুখ, শুধু ধ্যান-ধারণায় তাহা হয় না—

হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি॥ (ঐ, পৃঃ ১২)
নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি, তথাপিহ আশা নাহি পূরে॥
যদি বিনয়েতে মনঃ স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে॥ (ঐ, ৭৫)
নয়ন-অন্তরে, অন্তরে তোরে নিরখি মন-নয়নে।
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে॥ (ঐ, পৃঃ ৩)
মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে। (ঐ, পৃঃ ৮৭)
মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না॥ (ঐ, পৃঃ ১৩)

কিন্তু এ চোখের তৃষ্ণা যেন মিটে না—

বিচ্ছেদে যা ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পূরে ক্ষণ দরশনে॥ (ঐ, পৃঃ ১০৭)
নয়নে নয়নে রাখি (প্রাণ) অনিমিখ হয় আঁখি
বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি,
কি জানি অন্তর হও অই ভয় দেখি॥ (ঐ, পৃঃ ৭৯)

কিন্তু প্রেম রূপের বন্ধনে ধরা পড়িলেও গুণের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে; চোখের নেশায় জন্মিলেও শেষে মনকে আশ্রয় করে—

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে। (ঐ, পৃঃ ১৩৩)
নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন॥
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন॥[২৭]

—(প্রীতিগীতি, পৃঃ ১৫৪; রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৭; সঙ্গীতসারসংগ্রহ, পৃঃ ৮৭৫)। চোখের নেশায় প্রেমের সূত্রপাত হইলেও প্রেম আন্তরিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়া, ইন্দ্রিয় ছাড়াইয়া, মনের রাজ্যেই প্রেমের সিংহাসন। সেই জন্য যত দিন নয়ন মনের বশ না হয়—যত দিন প্রেম "নয়নেরে দুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়" (গীতরত্ন, পৃঃ ৪) না হয়—ততদিন প্রেমের পূর্ণতা লাভ হয় না—

এত দিনে মনবশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান॥

২৭। এই গানটি ও নিম্নোদ্ধৃত তিন চারিটি গান গীতরত্নে নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এগুলি নিধু বাবুর কি না সন্দেহ; কিন্তু বরাবর এগুলি নিধু বাবুর নামের সহিত জড়িত; অন্য কাহারো বলিয়া যত দিন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হয়, তত দিন নিধু বাবুর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতরত্ন প্রামাণিক হইলেও সম্পূর্ণ সংগ্রহ নয়। যেগুলি অন্য লোকের রচিত বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, সেগুলি বর্জ্জন করিয়াছি। এরূপ সন্দেহযুক্ত গান মোট পাঁচটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি; বাকি সব গানই গীতরত্ন হইতে গৃহীত

বাহে অদর্শনে দুঃখী নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তার করি দরশন॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৮৪)

বাস্তবিক একাত্মমিলন না হইলে প্রেমের সার্থকতা কোথায় ?—

এত দিন পর নিবিল আমার মনের অনল সখী।
দেখ যত দিন ছিল দুই জ্ঞান, সতত ঝুরিত আঁখি॥ (ঐ, পৃঃ ৪০)
আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার মোর মনে ;
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দুজনে॥ (ঐ, পৃঃ ৭)

এরূপ হইলে বিচ্ছেদ-মিলনের আর ভয় থাকে না—

হরিষ বিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন।
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥ (ঐ, পৃঃ ১১৯)

যখন এইরূপ মিলন হয়, তখন প্রেমের আতিশয্যে হৃদয়ের যে অপূর্ব্ব ভাব, তাহা প্রেমিক নিজেই বুঝিতে পারে না—

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয়নিবাসী তুমি হয় হে বুঝিতে॥ (ঐ, পৃঃ ৭)
তুমি কি জানিবে আমার মন।
মন আপনারে আপনি জানে না॥ (ঐ, পৃঃ ৭৩)

এরূপ আত্মসমর্পণই প্রেমের মূল মন্ত্র—

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর আছে কি রতন॥ (ঐ, পৃঃ ২০)

প্রতিদানে প্রেমের সার্থকতা বটে, কিন্তু ভালবাসিতে যত সুখ, ভালবাসাইতে তত নয়। এইজন্য নিরপেক্ষ প্রেমের কথা কবিরা গাহিতে ভালবাসেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু-মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥[২৮]

প্রেম একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে তাহার আর বিনাশ নাই—

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে॥

২৮। পৃঃ ১১০ দ্রষ্টব্য।

আর কি সে রূপ ভুলি প্রেমতুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
সে দিন ভুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে॥[২৯] (গীতাবলী বা
নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১৩১ ; রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৬)

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে।
কখন না পাসরিব জীবন মরণে॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৪৯)
তাহারে কি ভুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মনঃ।
দেখিতে তাহার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন॥
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন॥ (ঐ, পৃঃ ১২৩)

প্রেম অনন্যগতি ; একবার ভালবাসিলে কখন ভোলা যায় না—

মনে করি ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ মরি হে দুখেতে॥ (ঐ, পৃঃ ২৮)
কিবা দিবা বিভাবরী পাসরিতে নাহি পারি
আঁখি অনিমিষ, পথ হেরিতে হেরিতে॥ (ঐ, পৃঃ ৯)
আমি কি তারে ত্যজিতে পারি।
দিবে নিশি সেই ধ্যান সেই ধন সেই জ্ঞান
মন প্রাণ প্রাণ প্রাণ করি॥ (ঐ পৃঃ ১৩৯)
প্রেম অন্তর কি হয় প্রিয়জন প্রতি নয়ন-অন্তরে। (ঐ, পৃঃ ২৭)

কিন্তু এই প্রেমনিধি সর্ব্বত্যাগী না হইলে লাভ করা যায় না—

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে আছে যত অপমান॥

২৯। প্রীতিগীতিতে এই গানটি হরিমোহন রায়ের নামে আছে (পৃঃ ৫৩)। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকেও এই গানটি দেখা যায়। এই গানটি নিধু বাবুর কি না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্কে পূরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ ॥
(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীত-সংগ্রহ, পৃঃ ১৩০)

প্রেম—লজ্জা-ভয় মান-অপমানের অতীত। যে প্রেম-সঙ্গীতে কলঙ্ক বা কুলত্যাগের কথা আছে, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাহা সমাজ-নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন রসজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,[৩০] —'যাঁহারা এ দেশের প্রীতিগীতির ইতিবৃত্ত জানেন, তাঁহাদের নিকট এই কলঙ্কের প্রকৃত মর্ম্ম অবিদিত নাই।...বৈষ্ণব পদে যে কলঙ্কের উল্লেখ আছে, তাহা ভাগবতী লীলার অন্তর্ভূত। যদি ভগবান্‌কে চাও, তবে লোকাপবাদের ভয় করিলে চলিবে না। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ভাবিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, কুল কোন্ ছার? কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে এই মর্ম্ম, নিধুবাবু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন—

অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার।
লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে ॥
—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৮)

কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে অর্থ, সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমের গানেও সেই অর্থ—প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ। শত অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার কি ঐকান্তিকতা! এই ঐকান্তিকতা দেখাইবার জন্যই কবি প্রেমের উপর কলঙ্ক আরোপ করেন। কবির এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমরা যেন কাব্যের জগতে সমাজ-নীতির বিতণ্ডা উপস্থিত না করি; তাহা হইলে আমরা কোন কালে কাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না।" সেইজন্য নিধু বাবু গাহিয়াছেন,—

হউক হে হউক প্রাণ যায় যাউক আমার,
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলেম যদি কি করে লাজেতে ॥
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে।
আমি বলি এত দিনে আইলেম কুলেতে ॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১১২-১৩)

উল্লিখিত ভাবমূলক সঙ্গীত ছাড়াও নিধু বাবু প্রেম সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক

৩০। প্রীতিগীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ৩৶০।

টপ্পা রচনা করিয়াছেন। মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের আনন্দ, অভিমান, সাধনা, সোহাগ, আত্মনিবেদন, বিচ্ছেদের দুঃখ, অপূর্ণ প্রেমের নৈরাশ্য, উদ্বেগ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রেমে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা, অনুযোগ প্রভৃতি বহুরূপী প্রেমের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা তাঁহার সঙ্গীতে অপ্রতুল নহে। নিম্নোদ্ধৃত মিলন-সঙ্গীতটি যেন একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া দেয়,—

আনন্দ ভর করি দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মনসংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জনে ॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন-খঞ্জনে ॥ (ঐ, পৃঃ ১৩০)

এরূপ চিত্র-কুশলতার পরিচয় বিরল নয়—

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে ॥
যতক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিক হেরিতে হেরিতে। (গীতরত্ন, পৃঃ ৮৭)

মিলন—

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত বিচ্ছেদ চলিল। (ঐ, পৃঃ ১৩২)

আদর—

স আদরাদর যা আদর অধর কম্পে কহিতে।
দরশনে পরশনে অমিয় বচনে
শরীর শ্রবণ সুখী আঁখি সহিতে ॥ (ঐ, পৃঃ ৪১)

প্রেমের তন্ময়তা—

যে দিকে চাই সে দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে,
তোমার বিহনে না দেখি কাহারে ॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে।
পুনঃ জাগরণে নয়নে নয়নে
থাকি সেই মনে, কি হলো আমারে ॥ (ঐ, পৃঃ ১৩৬)

কিন্তু নিধু বাবু মিলনের এরূপ সুখ-চিত্র আঁকিলেও, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ,

সুখ অপেক্ষা দুঃখ, তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির কথাই বেশী বলিয়াছেন। মিলনের চেয়ে বিচ্ছেদের গান গাহিতে তিনি ভালবাসেন। প্রেমে সুখ-দুঃখ চিরন্তন—

ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল শর। (ঐ, পৃঃ ৭৭)

কিন্তু সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক—

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে। হে
সুখ আশে ভাসে সদা দুঃখের সাগরে॥ (ঐ, পৃঃ ২)

মিলনেও দুঃখ, বিরহেও দুঃখ—

পিরীতি সুখের লোভে মজে হে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ দুঃখের ভাজন॥
বিচ্ছেদে মিলন আশে থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ॥ (ঐ, পৃঃ ১২০)

পথ চাহিতে চাহিতে দিন কাটিয়া যায়—

উদয় সুখতারা আমার নয়নতারা তার পথ নিরখিয়ে।
কারণ না জানি আমি আছি কি রসে ভুলিয়ে॥ (ঐ, পৃঃ ১৩০)
এক পল বিপল না হেরি ওলো হতো মোর নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল॥ (ঐ, পৃঃ ৬)

চক্ষের তৃষ্ণা মিটে না—

তিল অদর্শন হলে হয় সজল নয়ন। (ঐ, পৃঃ ৫)

নয়নের জলে মনের অনল নিভে না—

নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল। (ঐ, পৃঃ ১১৫)

হৃদয়ের আশাও কখন পুরে না—

তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো॥

(গীতাবলী বা নিধু বাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১৭২, সঙ্গীতসারসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮৭৩ ; প্রীতিগীতি, পৃঃ ৩৭৬)

কিন্তু দুঃখ-যাতনা সত্ত্বেও কবি প্রেমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে তেজো না।
যদি রাত্র দিন, কর জালাতন, ভাল যে যাতনা॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১৩১)

প্রেমের দহনে হৃদয় আরও নির্ম্মল হয়—

অন্ত অন্ত চিন্তা যত আমার আছিল।

তব হুতাশনে তারা শবদাহ হল॥ (ঐ, পৃঃ ১৩২)

দুঃখের ভয়ে প্রেম ভুলিতে পারা যায় না—

থাকিতে বাসনা যার চন্দন বনে।

ভুজঙ্গেরে ভয় সেহ করে কি কখনে॥ (ঐ, পৃঃ ৪৪)

প্রেমিকের কাছে প্রেমের দুঃখেও সুখ—

সেই সে পিরীতি প্রাণ পারে লো রাখিতে।

দুঃখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে॥ (ঐ, পৃঃ ১৭)

পিরীতের দুঃখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়। (ঐ, পৃঃ ৯৪)

প্রেমের এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেও প্রেমিকের আশ্বাস—

দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব।

দুঃখে সুখ বোধ করে যতনে তায় তুষিব॥

না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,

তবু সে বিধুবদন দূর থেকে দেখিব॥ (বঙ্গের কবিতা, পৃঃ ২৯৫)

কেমনে বল তারে ভুলিতে।

প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে॥

ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।

দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ২০)

উদ্ধৃত গীতসমূহ হইতে বুঝা যাইবে, নিধু বাবুর এই প্রেমের ধারণার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার প্রসারই অধিক। ইহাতে ভাবের গভীরতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তথাপি সমালোচক চন্দ্রশেখর ইহার মধ্যে "ইন্দ্রিয়লালসার আধিক্য", "উন্মুক্ত ও নির্লজ্জ বিলাসিতার ভাব" কিরূপে পাইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকালীন গীতরচকদিগের মধ্যে নিধু বাবু প্রতিভা ও ক্ষমতা হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি ইহার কীর্ত্তিত প্রেমের "ইন্দ্রিয়-লালসাতেই উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই সমাপ্তি" ইত্যাদি যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কোনও মতে সমীচীন বলা যায় না।

আর একটি কথা। নিধুবাবুর গানগুলি গান হিসাবেও বিচার করিতে

হইবে; সেগুলি শুধু কবিতা বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। অনেক সময় আমরা গানকে কবিতার মাপকাটীতে মাপিয়া ভুল করি; কবিতা ও গানে যে পার্থক্য থাকিতে পারে, এ কথা ভুলিয়া যাই। গানের প্রধান সৌন্দর্য্য স্বর; স্বরের দিয়াই ইহা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। নিধু বাবুর প্রেমস্নিগ্ধ গানের মাধুর্য্য শুধু পাঠে উপলব্ধি করা যায় না, প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; তাহা শুনিবার জিনিস। শুধু নিধু বাবুর টপ্পায় কেন, এ কথা বৈষ্ণব কবিদিগের রচনাতেও খাটে। সেইজন্য যাঁহারা রসজ্ঞ সুগায়ক কীর্ত্তনীয়ার মুখে মহাজনপদাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মাধুর্য্য অধিকতর উপলব্ধি করিয়াছেন। নিধু বাবুর টপ্পাও গান; শব্দপ্রধান নয়, স্বরপ্রধান; কবিতা হিসাবে শুধু তাহার সৌন্দর্য্য নহে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে; তবে নিধু বাবুর টপ্পার যে গান হিসাবেও যথেষ্ট মূল্য, তাহা সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমের মত গ্রন্থে নিধুবাবুর সার্দ্ধশতাধিক টপ্পার পুনর্মুদ্রণ হইতে অনুমান করিতে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ, ভারতবর্ষীয় গীতরচকদিগের মধ্যে নিধু বাবুকে যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় স্থান দেন নাই, তাহাই তাঁহার রচনাগৌরবের পরিচায়ক।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আজিকালিকার দিনে এরূপ শক্তিশালী গীতরচককে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি, এবং তাঁহার টপ্পাগুলি অশ্লীল রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধা ও অনাদরের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন কি, গুপ্ত কবিও তাঁহার সময়ে এইরূপ বিরাগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এত অবজ্ঞা অশ্রদ্ধার মধ্যেও নিধু বাবুর টপ্পা যে আজও বাঁচিয়া আছে শুধু তাহাই ইহার জীবনী শক্তির পরিচায়ক। ইংরেজি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভাষার দুর্দ্দিনের সময় যে সকল যুগপ্রবর্ত্তনকারী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিধু বাবুও তাহার মধ্যে একজন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই অনাড়ম্বর বাঙ্গালী কবি তৎকালে অবজ্ঞাত মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি:—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর,
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৯৮)

ভদ্রার্জ্জুন

ভদ্রার্জ্জুন নাটক শকাব্দ ১৭৭৪ (ইং ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত। অনেকের মতে ইহা বাংলা ভাষায় ইংরেজি আদর্শে গঠিত সর্ব্বপ্রথম নাটক। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার যে মূল সংস্করণ রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ অপূর্ব্ব নাটকের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার পরিচয়পত্র বা title-page এইরূপ:

ভদ্রার্জুন | অর্থাৎ | অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ। | শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্তৃক প্রণীত। "মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা | সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা" ॥ | কলিকাতা | চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। | শকাব্দা ১৭৭৪। | —পুস্তকের আকার ৭"×৪"।

ইহার পর ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে নাট্যকার এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার ভাষা-প্রয়োগ, রচনাপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং দীর্ঘ হইলেও ইহার সমস্তটাই (পত্রাঙ্ক সহিত) এইখানে উদ্ধৃত হইল।

[১] বিজ্ঞাপন

"মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান জ্ঞান করেন; কাহারও বা অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাগুক্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্যসমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও মানস চন্দ্রমা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয়; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, [২] অবশ্যই তাহার একপ্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

"আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দ্দিন পরে কতিপয় বিজ্ঞবর বিদ্বান্ বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাঁহারা সকলেই ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্ত্তাকে কোনক্রমেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ জ্ঞরাব্যক্তি* যে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন তাহা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠক মহাশয়দিগের আদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিতি করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, যাহা দশজন মহোদয় পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

[৩] "কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্ব্বমনোরঞ্জক কোন পদার্থ এই জগন্মণ্ডলে অদ্যাপি জন্মে নাই। অধিক কি কহিব, যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যথানিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই বিশ্বপিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি অকিঞ্চিৎকর এই পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব? বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কারপরিহীনা, এবং তাঁহার দারিদ্রাবস্থাও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছা আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার চিত্তাকর্ষণী শক্তি জন্মে এমন নহে; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থ সৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্জ্বল্যমান করাই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।

[৪] "বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ

* ব্যক্তিরা। এইরূপ ছাপার ভুল আছে।

করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহার দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমত নহে; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্ত্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

[৫] "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপথন, যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত [৬] হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরোপীয়েরদিগের স্বতন্ত্র

নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

"বিজ্ঞবর মহোদয়গণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে প্রণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়া দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।

শকাব্দ ১৭৭৪।১০ আশ্বিন। শ্রীতারাচরণ শীকদার।"

ইহার পরে পয়ারচ্ছন্দে রচিত "আভাস" শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা (পৃঃ ৭-৯) আছে। ইহা নটনটীর উক্তি নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং ছন্দোবন্ধে সামান্যভাবে গল্পাংশের সূচনা করিতেছেন। প্রথমে নাটক-রচনার প্রশংসা, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৈরিভাব বর্ণনা, পঞ্চ পাণ্ডবের পাঞ্চাল নগরী গমন, পার্থের লক্ষ্যভেদ, জননীর আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপুরী নির্ম্মাণ ও যথাবিধি রাজ্যশাসন,—

"যথাবিধি রাজকার্য্যে ত্রুটি নাহি তায়।
নারদ আসিয়া মধ্যে ঘটাইলা দায়॥
যাজ্ঞসেনী সহবাসে নিয়ম স্থাপিয়া।
সুরপুরে দেবঋষি গেলেন চলিয়া॥
নারদের নিয়মেতে দেখ কিবা গুণ।
তীর্থযাত্রা করি ভদ্রা হরিলা অর্জ্জুন॥" (পৃ ৯)

ইহার পরে রীতিমত নাটকের আরম্ভ। নাটকখানি ১-১৪২ পৃষ্ঠায় ৫ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমেই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা, যথা (কোন পৃষ্ঠাঙ্ক নাই)—

নাটকসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

ধৃতরাষ্ট্র	হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা
যুধিষ্ঠির	অধিপতি
ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব	} যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ

দুর্য্যোধন	ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ
দুঃশাসন	ঐ
ভীষ্ম	শান্তনুর তনয়
কর্ণ	দুর্য্যোধনের সখা
বসুদেব	যুধিষ্ঠিরের মাতুল
কৃষ্ণ	বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র
বলদেব	বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নারদ	দেবঋষি
দারুক	সারথী

সত্যভামা	কৃষ্ণের প্রধান মহিষী
রুক্মিণী	কৃষ্ণের দ্বিতীয়া মহিষী
দ্রৌপদী	পাণ্ডবগণের স্ত্রী
সুভদ্রা	কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী
সহচরী	
প্রতিবাসিনী	
অন্যান্য কুলকামিণীগণ	

দূত, দ্বারী, প্রহরী, এক মদ্যপ, বাতুল ও পথিকগণ ইত্যাদি।"

প্রথম অঙ্ক (পৃঃ ১-১৯)

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ১-১০) ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহিত আসীন। নারদ বীণা-যন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। এইখানে একটি গান দিয়া নাটকের সূচনা। তারপর নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; অন্যান্য পাণ্ডবগণ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা কোন কথাবার্ত্তা করেন নাই। পাঁচ ভাইএর এক স্ত্রী বলিয়া নারদের ভয় হইয়াছে যে, পাছে এই ব্যাপার লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন: "আপনি একি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পঞ্চ মধ্যে বিরোধাঙ্কুর উৎপত্তির বীজ কোথায়।" (পৃঃ ৪)। নারদ কহিলেন—"ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।" বলিয়া সুন্দ উপসুন্দের কথা পয়ারছন্দে বর্ণনা করিলেন (পৃঃ ৬-৯)। এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের উপায়স্বরূপ পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে কৃষ্ণাসহবাসের অঙ্গ

এক নিয়ম স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। "তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ তীর্থপর্য্যটন করিতে হইবেক ; নতুবা সে পাপধ্বংস হইবেক না।" (পৃঃ ১০)। তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১১-১৫)। রাজপুরীর সিংহদ্বার। দস্যুগণ কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ; তিনি আসিয়া অর্জ্জুনের শরণাগত। অর্জ্জুন বলিলেন—"প্রভো, ক্ষণেক বিলম্ব কর।" মহারাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন; অস্ত্রাদি সেই গৃহেই আছে ; কিন্তু তিনি তথায় প্রবেশ করিতে অক্ষম। ব্রাহ্মণ এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন অগত্যা পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর হইলেন। এই দৃশ্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগই অধিক ; সর্ব্বত্র পয়ার, কেবল অর্জ্জুন যেখানে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন (পৃঃ ১৪-১৫), সেখানে দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দৃশ্যের শেষভাগে এইরূপ নাট্যসঙ্কেত বা Stage-direction আছে—

"[এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জুনকে আশীরাশি প্রদান করতঃ স্বগৃহে গমন করিলেন।]"

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১৫-১৯)। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে অর্জ্জুন প্রবেশ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ও বিশেষতঃ দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে অনেক নিবারণ করিলেন, ভীম আসিয়া সেই অনুরোধে যোগদান করিলেন ; কিন্তু অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে অশক্ত। "অর্জুন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।" (পৃঃ ১৯)। এই দৃশ্যে গদ্য পদ্য (পয়ার) দুই ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পয়ার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

"দ্রৌপ। অর্জুন কি বলিতেছে।

যুধি। তীর্থেতে যাইবে।

দ্রোণ। কিরূপ সম্বন্ধে ইহা।

অর্জ্জু। অন্যথা নহিবে।

দ্রোণ। কি কারণে হেন উক্তি।

অর্জ্জু। সন্ধি লঙ্ঘিয়াছি।

দ্রোণ। লঙ্ঘিয়াছ তাহাতে কি।

অর্জ্জু। দোষী হইয়াছি।

দ্রোণ। কিসে সন্ধি ভঙ্গ হলো।

অর্জ্জু। তোমার গৃহেতে।
যবে তুমি ছিলে ধর্ম্মরাজের সনেতে।" ইত্যাদি (পৃঃ ১৬-১৭)।

দ্বিতীয় অঙ্ক (পৃঃ ১৯-৪০)

প্রথম সংযোগস্থল, দ্বারকা, বসুদেবের শয়নাগার। বসুদেব আসীন, দেবকী ও রোহিণীর প্রবেশ। সুভদ্রাকে যৌবনস্থা ও বিবাহযোগ্যা দেখিয়া দেবকী ও রোহিণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। আইবুড়ো মেয়ে বড় হইলে মায়ের মনে উদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত স্বামীকে তাহার বিবাহের জন্য তাগাদা, এই বাঙ্গালী গৃহের অনুরূপ চিরপরিচিত গার্হস্থ্য চিত্রটি মন্দ হয় নাই। ইহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"দেব। তুমি ত হে সংসারের কিছুই জান না।

বসু। সংসার করিতে হয় কি রূপে বল না॥

দেব। দুই সন্ধ্যা চতুর্ব্বিধ রসেতে ভোজন।
রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন॥
ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়।
মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয়।

বসু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।
ও কথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি॥

দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।
পরিবারাদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া॥

রোহি। দিদী, কি বলিতেছ ?

দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার নিদ্রাহার দূর হইয়াছে।

রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তামূলে শয়ন করিয়াছি। হা!—বসুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে করেন না।

বসু। তোমরা দুইজনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি দুরবস্থায় রাখিয়াছি?

দেব। সুভদ্রার উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণের ভাবনা নাই, পরিধেয় বস্ত্রেরও ভাবনা নাই; রত্নালঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—। (বলিতে ২ মৌনাবলম্বন করিলেন)

বসু। এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।

রোহি। তুমি যেন একথার কিছুই জান না॥

বসু। আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।

রোহি। রহস্যে নাহিক কায যাও মেনে চল॥

বসু। কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের।

রোহি। তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ফের॥

বসু। ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড়ি কহ করি স্পষ্ট।

রোহি। সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট॥

বসু। সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে।

রোহি। তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে॥

বসু। আমি এই রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই।
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই॥
(গমনোদ্যোগ করিলেন)

দেব। কটু বাক্য কহে নাই কেন কর ক্রোধ।
অবোধ হইলে তুমি কেবা দিবে বোধ॥
(বসুদেবের হস্ত ধরিলেন)
বসো ২ কোথা যাও কথাগুলা শুন।
বুঝিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ॥

বসু। দেখহে দেবকি আমি না জানি শঠতা।
আমার সহিত কেন কর কপটতা॥
স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয়।
মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সয়॥

রোহি। করি নাই আমি নাথ তোমারে রহস্য।
তোমার কাছেতে কিবা আছে অপ্রকাশ্য ॥
সুভদ্রারে ঘেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন।
হৃদয়েতে সরোরুহ কলিকা দর্শন ॥
এমন যুবতী কন্যা যাহার আগারে।
নিশ্চিন্ত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে ॥
অনূঢ়া তনয়া ঘরে বড়ই বালাই।
কখন কি হয় আমি সদা ভাবি তাই ॥" (পৃঃ ২০-২৩)

বসুদেব তখন আশ্বাস দিলেন যে, কাল সকালে কৃষ্ণ বলদেবকে ডাকাইয়া ঘটকাদি আনাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। এখন রাত্রি অধিক, "নিদ্রায় নয়ন ভারি আর না জাগিতে পারি জাগিতে কি প্রয়োজন আর। ভাবনা ত্যজিয়া দূরে চল যাই শয্যাপুরে কল্য প্রাতে হবে প্রতিকার।" (পৃঃ ২৪)

"(অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই আপন আপন শয্যাগারে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।)"

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ২৫-৩০), বসুদেবের উপবেশনাগার। বসুদেব বলদেবকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। "তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন"। বলদেব বলিলেন—উপযুক্ত পাত্রের অভাব কি? দুর্য্যোধন রহিয়াছেন। তবে কৃষ্ণকে এ কথা জানান হইবে না; কারণ, দুর্য্যোধন তাঁহার মনোনীত হইবে না। বসুদেব ইহাতে আপত্তি করিলেন; কৃষ্ণকে না জানাইলে প্রমাদ ঘটিতে পারে। বলদেব বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি সমস্ত ঠিক করিবেন, কোনও গোলযোগ হইবে না। বসুদেব তাহাতে উত্তর করিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই সমস্ত ভার। তবে এমন কার্য্য কর, যাহাতে কৃষ্ণের সহিত কলহ না হয়। প্রথমাংশে গদ্য থাকিলেও শেষটা সমস্ত পয়ার।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৩১-৪০), যদুপুরীর অন্তঃপুর। "দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী প্রবেশ করিল।" রোহিণী শুনিয়াছেন যে, দুর্য্যোধনের সহিত সুভদ্রার সম্বন্ধ ঠিক হইতেছে। ইহাতে দেবকীর আপত্তি। কারণ, দুর্য্যোধন দুশ্চরিত্র ও তাঁহার বাপ ধৃতরাষ্ট্র কাণা।

"দেব। ওমা, সে কি, একটা কাণা বেয়াই হইবে। একে দুর্য্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে। ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি?

দেব। কাণা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে? তাতে কুটুম্বিতার সুখ হবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে আজি পর্য্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধুর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি খাট দুঃখের কথা?

রোহি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কি যে সে কাণা কাণা বলিতে পারে? ধৃতরাষ্ট্র কাণা বটেন। কিন্তু তাহাতে দুর্য্যোধন ত অন্ধ হইবে না। আর গান্ধারী মনোদুঃখে চক্ষুরোধ করিয়াছেন, এ হেতু সুভদ্রাকে ত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব ইহাতে দোষ কি?

সহ। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা, অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে, তুমিই বিবেচনা কর দেখি? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্র ত সে দোষে দোষী হয় না।

প্রতি। হাঁ গো বোন্, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী রোহিণী, উহারা ত সেদিনকার মেয়ে। আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।

সহ। ভাল ওঁর বেয়াই কাণা, তাতে ওঁর কি আটক খাবে। বেয়াএর সঙ্গে ত ওঁদের কাহারো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি এত খেদিত হইতেছেন কেন?

প্রতি। হাঁ তাইত বটে, বেস বলেছিস্, সুভদ্রার বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেই ভাল। তার বাপ কাণাই হউক, বা খোঁড়াই হউক—তাহাতে ওঁদের ত কিছু বাধিবে না।

সহ। ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর দেখি। উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হেয় জ্ঞান করিতেছেন।

প্রতি। হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে তামাসার সম্পর্ক। কাণা হইলে ত সেটি হবে না।

দেব। তোমরা রহস্য করিতেছ, কর। আমি এ শ্লেষোক্তির মধ্যে নাই আমার কৌতুক করিবার সময় নহে।

প্রতি। ভাল গো, কথায় কথা একটা কহিলেই কি রাগ করিতে হয়। তোমাদের মেয়ের বিয়া, তোমরা যাহা করিবে তাহাই হবে। যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। এ স্থলে আমার থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি এখন ঘরে চলিলাম। (প্রতিবাসিনী গমন করিল)" ইত্যাদি। পৃঃ ৩২-৩৪।

তারপর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সুভদ্রার যেখানে ভবিতব্য, সেইখানেই হইবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ যাহা তাহা কে অন্যথা করিবে?

এ দৃশ্য সমস্তটাই উদ্ধৃত হইবার যোগ্য, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। ভদ্রার্জ্জুন নামক নাটকে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ;—প্রথম, ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। মহাভারতীয় গুরু-গম্ভীর কথা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহার ভাষা সরল ও অনাড়ম্বর, কিন্তু কোথাও খেলো হয় নাই। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও কঠিন বা "সাধু" ভাষা প্রয়োগেচ্ছার উদাহরণ দু-এক স্থল ভিন্ন বিরল।* উপরোক্ত নাট্যকারের বিজ্ঞাপনেও তিনি তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, ইহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব। যদিও বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার সর্ব্বদা জীবনের ও মানব-চরিত্রের স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে দেবকী, রোহিণী ও তাঁহাদের সখীবৃন্দের কথোপ-কথন বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে বিবাহের "ঘোঁট" যেরূপ হয়, সেরূপ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাষা ও চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ যথাসম্ভব প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

অঙ্ক। (পৃঃ ৪০-৪৩)

প্রথম সংযোগস্থল, প্রভাস তীর্থ। অর্জ্জুনের আগমন। দারুক, প্রহরী ও একজন সেনা অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাওন। সমস্ত কথোপকথন গদ্যে।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল, (পৃঃ ৪৩-৪৫) কৃষ্ণের সভা। দারুক প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ রথ আনিতে ও সমস্ত

* অবশ্য অনেক স্থলে কাব্যোৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে কবি অস্বাভাবিক ও উৎকট বাক্য-কণ্টকিত ভাষাবিন্যাস করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনায়, নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনায়। উদাহরণ পশ্চাৎ দেওয়া গেল।

পুরজনকে অর্জ্জুনের অভ্যর্থনার্থে রৈবত পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত গদ্যে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৫-৪৭)। প্রভাস তীর্থে, কৃষ্ণ ও দারুক কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা। সমস্তটা গদ্যে রচিত।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৭-৫৩), পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। সত্যভামা সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের কথা বলিতেছেন ও পূর্ব্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রৈবতকে মহোৎসবের বর্ণনা। প্রায় সমস্তটা পদ্যে (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী) রচিত। শেষভাগে গদ্য (এক পৃষ্ঠা) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ কয়টি দৃশ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ৫৩-৬১), রাজবর্ত্ম। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন (নেপথ্যে) রথে আসিতেছেন; এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী, পথিক ও প্রহরীর কথোপকথনচ্ছলে তাহার বর্ণনা। বিদূষক বর্জ্জন করিয়া নাট্যকার এইরূপ হাস্যাস্পদ প্রসঙ্গ (comic element) আনিয়াছেন। এই দৃশ্যের প্রথম হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল।

রাজবর্ত্ম।

এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে।

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ধিমা তেতালা।

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।
সুধাহ্রদে ডুবি যেন এ প্রাণ হারাই॥
চষকে চষকে পুরি, আর পিতে নাহি পারি,
মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুষ্ট হয়ে খাই॥

বাতু। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্?

মদ্য। ওরে শ্যালা যার নাম গাইতেছি।

বাতু। তুই শ্যালা মদ খাইয়াছিস্। উঃ—শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্য। আমি মদ খাইয়াছি তোর কি? আজ বড় খুসি আছি, দেখ শ্যালা, কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জুন আছে।

বাতু। কৈরে ব্যাটা অর্জুন কোথা,—তুই বেটা কয় পাত্র খাইয়াছিস।*

মত্ত। কয় পাত্র,—ওরে শ্যালা অগুন্তি—অগুন্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, অর্জুনকে দেখে আবার খাব। আজ বড় আমোদ, তুই কি জান্‌বি। তোর বুদ্ধি আছে, না জ্ঞান আছে।

(ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার গান আরম্ভ করিল)

ঐ আস্‌তেছে অর্জুন।
আমি মদের জন্য হব খুন॥
যখন অর্জুন আসবে কাছে
তার কাছে ভিক্ষা চাব,
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে,
তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।
ঐ আস্‌তেছে অর্জুন॥

১ম পথি। ঐ দেখ ভাই, একজন মাতাল নৃত্যগীত করিতেছে। চল নিকটে গিয়া দেখি।

২য় পথি। না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত নহে। মাতালের কি জ্ঞান থাকে? সে কি বলিতে কি বলিবে। লোকে বলে, দন্তি, শৃঙ্গি, ও মত্ত ইহাদের নিকট যাইবে না।

৩য় পথি। চল না, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তেমন করে, তাতে ভয় কি, প্রহরী আছে।

(সকলেই দ্রুতগতিতে মাতালের নিকট গেল)

বাতু। তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ।

মত্ত। শ্যালা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন? আমি তোর কি ধার ধারি। শ্যালা তুই বেটা, তোর বাপ বেটা।

বাতু। বেটাকে এমন ধাক্কা দিব ঐ খানায় গুঁজড়িয়া রাখিব।

মত্ত। কৈ আয় শ্যালা মার দেখি।

(দুই জনে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল)" পৃঃ ৫৩-৫৫।

তৎপরে প্রহরীর প্রবেশ ও দুই জনের মল্লযুদ্ধ নিবারণ। অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন। কেহ বলিল, রথে

* বাতুল ঠিক বাতুলের মত কথা কহিতেছে না।

দুই কৃষ্ণ—অর্জ্জুন কোথা। কেহ বলিল, একজন কৃষ্ণ, অন্য জন উদ্ধব। ইহা লইয়া মণ্ডপ, বাতুল প্রভৃতির পরস্পর কলহের মধ্যে দৃশ্যের শেষ। এ অংশটা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ৬১-৭৩)। "অট্টালিকোপরি" সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জ্জুনের আগমন দর্শন করিতেছেন। অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য সুভদ্রার অত্যন্ত কৌতূহল এবং অর্জ্জুনকে দেখিবামাত্র ভদ্রার চিত্তচাঞ্চল্য। এইখানে একটু দীর্ঘচ্ছন্দ, হাহুতাশ, ও থিয়েটারী ঢঙ আছে; তাও আবার পয়ারে গ্রথিত। ভদ্রার "সখি ধর-ধর" অবস্থা। "বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়। অর্জ্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়।" ইত্যাদি ৬৩ পৃঃ হইতে ৭৩ পৃঃ পর্য্যন্ত। ভদ্রা কর্ত্তৃক ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অর্জ্জুনের রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক। ইহার খানিকটা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল "নারায়ণ" পত্রিকায় (১৩২১-২২) পৃঃ ৪৯৯ তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এখানে আর তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভদ্রাকে এইরূপ অধৈর্য্য ও প্রগল্‌ভা দেখিয়া সত্যভামা তাহাকে নির্লজ্জা ব্যাপিকা বলিয়া তিরস্কার করিলেন। তাহাতে ভদ্রা প্রবোধ মানিল না; তখন সত্যভামা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অর্জ্জুনকে মিলাইয়া দিবেন। "বিদ্যাসুন্দরী" নায়িকার ধরণে এইখানে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। সত্যভামা বলিলেন: "আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত। অবশ্য অর্জুন সহ হবে তোর প্রীত॥" কিন্তু ভদ্রা একেবারে উতলা—"এখনো রজনী সখি বহুক্ষণ আছে। ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে॥ তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল। কি হবে আহুতি দিলে নিভিলে অনল॥" শেষে সত্যভামার পায়ে ধরিয়া কান্না— "(সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন) বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার। কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার।"

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৩-৭৭)। অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ। কৃষ্ণের নিকট সত্যভামা কর্ত্তৃক সুভদ্রার আরজির নিবেদন। কৃষ্ণের সম্মতি আছে; কিন্তু ভয়—পাছে অর্জ্জুন স্বীকার না করে। সত্যভামাকে বলিলেন: "তুমি গিয়া অর্জুনে কহিয়া যথোচিত। সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত॥" প্রথম কয় পংক্তি গদ্যে; অবশিষ্টাংশ পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদীতে।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৭-৮২)। অর্জ্জুনের শয়নাগার। গভীর নিশীথে সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া ঘটকালী করিতে আসিয়াছেন। এই

দৃশ্যের সমস্ত অংশ আধুনিক রুচিসম্মত নহে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। এই নাটকে প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণনা অনেকটা মামুলী কাব্যগত আদর্শানুযায়ী ও প্রাণহীন।

"অর্জু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্ত্তমানেও কন্দর্পদর্পহারিণী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামিনীর রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্ব্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণ নষ্ট করিতেছেন, সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্রভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জুন। সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশয় স্নিগ্ধ করিলে! কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষ্ণাই তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সৌদামিনীরূপে ত্বদীয় কান্তিরূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর।" (পৃঃ ৭৮-৭৯) ইত্যাদি।

অর্জ্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া একেবারে প্রেমসাগরে হাবুডুবু ও সুভদ্রার হাত ধরিয়া টানাটানি। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী তখন বলিলেন যে, কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে "ভদ্রার অঙ্গস্পর্শও করিব না"। সত্যভামা কৃষ্ণের অনুমতি জানাইলেন, ও উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে সুভদ্রা গমন করিলেন।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮২-৮৪)। রৈবত পর্ব্বত, বলদেবের সভা।—সংক্ষিপ্ত। নারদ আসিয়া বলদেবকে উস্কাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভদ্রাকে অর্জ্জুনের হস্তে অর্পণ করিবেন। গদ্য ও পদ্যে রচিত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৫-৮৮)। হস্তিনা, ধৃতরাষ্ট্রের সভা। নারদ বলদেবের দূতরূপে আসিয়া ভদ্রার সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন প্রভৃতির দ্বারকা যাত্রার উদ্যোগ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ। আমূল গদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৮-৯২)। ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। দূত আসিয়া বরপক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র দান করিল। যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। তৎপরে ভীম, নকুল ইত্যাদির প্রবেশ। ভীম নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বলিলেন যে, অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, এ আবার কি নূতন কথা। তর্ক-বিতর্কের পর যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দ্বারকায় যাইতে রাজী হইলেন এবং যাহাতে দুর্য্যোধনের সহিত কলহ না হয়, তাহা ধর্ম্মরাজের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমাংশ গদ্য, ভীমাদির কথোপকথন পয়ারে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯২-৯৫)। হস্তিনার রাজবর্ত্ম। "বরবেশি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বরযাত্রিদিগের সম্মুখে ভীম আগমন করিলেন।" ইহা দেখিয়া কৌরবগণের আনন্দপ্রকাশ। ভীম পরিহাস করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন দ্বারকা অনেক দূর, দুর্য্যোধনের বরসজ্জায় যাওয়া উচিত নহে; কারণ, বিবাহের এখন কি হয়, বলা যায় না, "নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল হয়"। দুর্য্যোধন ইত্যাদি রাগ করিয়া বলিল যে, ভীম চিরকাল হিংসুক, কৌরবের ভাল কখনই দেখিতে পারে না। ভীম উত্তর করিলেন, আমি ভালই বলিয়াছি। দুর্য্যোধন বরবেশে মুখে কালী মাখিয়া আসিলেই চৈতন্য হইবে। সমস্তটা গদ্য।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৫—৯৭)। রৈবত পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। ভয়কাতরা সত্যভামা আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহারই উদ্যোগে ভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিয়া এখন বলদেব ও দুর্য্যোধনের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত। "বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ। আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ॥" (পৃঃ ৯৬)। কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন ও উপায় করিবেন বলিলেন। অধিকাংশ গদ্য, কেবল সত্যভামার বক্তৃতাটা পদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৮-১০০)। রৈবত পর্ব্বত। অর্জ্জুনের শয়নাগার। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তালিম করিতে আসিয়াছেন। কুলাঙ্গনাগণ যখন সুভদ্রাকে হরিদ্রা লেপন করিবেন, সেই সময় অর্জ্জুনকে সুভদ্রাহরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমস্তটা গদ্যে বিরচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১০০-১০১)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বলদেবের সভা। দুর্য্যোধনের অগ্রদূত আসিয়া কল্য প্রাতে তাহার আগমনবার্ত্তা দিল।

বলদেবের কুলাঙ্গনাগণকে কুলাচারাদি করিতে প্রহরীর মুখে আদেশদান। সমস্ত গদ্য।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০১-১০৮)। অন্তঃপুর। দুর্য্যোধনের সহিত বিবাহের কথা পুনর্ব্বার শুনিয়া সুভদ্রা কাঁদিয়া আকুল। "কালকূট দাও সখি আমি করি পান। নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান।" সুভদ্রার চরিত্র অত্যন্ত ভাবগদ্‌গদ প্যান্‌পেনে নায়িকার মত হইয়াছে, এবং যাত্রাধরণের এই সব লম্বা লম্বা পয়ারে বক্তৃতা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক হইয়াছে। খেদ করিতে করিতে "ভদ্রা ধরায় পতিতা হইলেন।" তারপর পদ্য হইতে গদ্যে লম্বা বক্তৃতা।

"সত্য। (হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) সুভদ্রে গা তোল। এত খেদের প্রয়োজন কি? কোন চিন্তা নাই। কল্য প্রভাতে অর্জুনসহ স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে।

সুভ। ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্পণ কর? সখি, আমার ললাটে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে? কৃতান্তাধিক শত্রুর হস্তে পতিতপ্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার কি উপায় আছে।

সত্য। ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে রবিসুত ত্রাসান্বিত হয়, ও যাঁহার নামোচ্চারণে তাঁহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তিভঞ্জন ভগবান্ তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে?" ইত্যাদি (পৃঃ ১০৫-৬)।

এ সকল স্থলে নাট্যকার তাঁহার ভাষার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জলতা ত্যাগ করিয়া অর্থগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত বাগাড়ম্বর করিয়াছেন।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৮-১০৯)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "কৃষ্ণের সভা। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট দারুক আগমন করিল।" দারুক অর্জ্জুনের নিকট রথ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা পাইয়া, কৃষ্ণের অনুমতি লইতেছে। এ দৃশ্যের কোনও তাৎপর্য্য নাই বলিয়া বোধ হয়। সমস্তটা গদ্য।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৯-১১১)। অন্তঃপুর। সত্যভামা, রুক্মিণী, সহচরী, প্রতিবাসিনী ও কুলকামিনীগণ শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বলদেবের আদেশানুসারে সুভদ্রার গাত্রে হরিদ্রালেপন করিতে যাইতেছেন। গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১২-১১৫)। বাপীতট। সুভদ্রাহরণ দৃশ্য সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচায়ক। বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, অল্প কথায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি বেশ ফুটান হইয়াছে। সমস্তটা গদ্যে। অর্জ্জুন ও দারুকের রথারোহণে প্রবেশ ও দারুককে কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্জ্জুনের স্থানকালোপযোগী উপদেশ দান। তৎপরে সত্যভামা প্রভৃতি সুভদ্রাকে লইয়া স্নান করাইতে প্রবেশ। অর্জ্জুনকে দেখিয়া সত্যভামা ও সুভদ্রার হর্ষ। তৎপরে—

"(অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন)

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথে আরোহণ কর।

অর্জুন। এসো প্রিয়তমে (ভদ্রার হস্ত ধরিয়া রথারোহণে গমন করিলেন।")
(পৃঃ ১১৪)। তার পর কুলনারীগণের হাহুতাশ ও পুরমধ্যে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১৬-১৩০)। অধিকাংশ পদ্য ও স্থানে স্থানে গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃশ্য—রাজবর্ত্ম। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীষ্ম ইত্যাদি বরযাত্রিগণের নিকট দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দান ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা। এই বর্ণনাটি (পৃঃ ১১৭) মন্দ নয়। অপমানিত দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের কটূক্তি ও ভীমের ক্রোধ। বৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন যে, বলদেব তাঁহাদিগকে আসিতে বলিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ, আস্ফালন, খেদ, হাহুতাশ ও কটুবাক্যের পর মানে মানে স্বদেশে প্রত্যাগমনই স্থিরীকৃত হইল।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩০-১৩৬)। গদ্য ও পদ্য উভয়ই দৃষ্ট হইবে। স্থান—বলদেবের সভা। দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দিল। বলদেবের ক্রোধ ও অর্জ্জুনকে শাস্তি দিবার জন্য সসজ্জ হইবার উদ্যোগ।[১] কিন্তু দূত বলিল, তাঁহার এ চেষ্টা বৃথা। কারণ, অর্জ্জুন অসাধারণ যুদ্ধে সমস্ত যদুকুলকে পরাস্ত করিয়াছেন। "ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন।

---

১ কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অষ্টম সংযোগস্থলে দূতমুখে শুনিতে পাই যে, বলদেব যুদ্ধে গিয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। "বলদেব আপনি লাঙ্গল স্কন্ধে করি। এসেছেন ফিরিয়া সংগ্রাম পরিহরি।" (পৃঃ ১১৮)। নাট্যকারের অনবধানবশতঃ বোধ হয় এই দুই রকম বৃত্তান্ত শুনিতে পাই।

প্রভো রথের আশ্চর্য্য গতির কথা কি কহিব, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য। কখন ভূমিতে, কখন বা শূন্যে; কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই।… অর্জুন ইন্দ্রজিতের ন্যায় নীরদমণ্ডলীতে আবৃত থাকিয়া বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। বৃথা কেন অর্জুনের বিপক্ষে গমন করিবেন? তিনি কোনখানে আছেন, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর হইবে।" (পৃঃ ১৩৫)। ইহা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বলদেব নিরস্ত হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই কৃষ্ণের চক্রান্ত।

দশম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩৬-১৪২)। প্রথমাংশ গদ্য, তৎপরে বিশেষতঃ বলদেবের বক্তৃতা পদ্যে (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী)। স্থান—বসুদেবের গৃহ। অভিমানী বলদেব বাপ মার নিকট আসিয়া মানের কান্না কাঁদিতেছেন। এ সমস্তই চক্রীর চক্রান্ত—যদুগণ সকলেই একপরামর্শী হইয়া বলদেবকে অপমানিত করিয়াছেন। "এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,—আজি অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কল্প, অতএব সকলে আমার আশা পরিত্যাগ কর।" (পৃঃ ১৩৮)। দেবকী, রোহিণী, বসুদেব অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বলদেব কিছুতেই বুঝেন না। রাগ—কৃষ্ণের উপর। তিনি পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্যে আপন মনের খেদ ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন,—

এত অপমান যার জীবনে কি সুখ তার
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
আছিল যতেক সুখ লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ
হলধরে করেছে বর্জ্জন॥
এমন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার॥" (পৃঃ ১৪২)

এইখানেই নাটক সমাপ্ত।

এই নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও, চরিত্রের বিকাশ বিশেষ দেখান হয় নাই। নাট্যসম্মত চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা, কাব্যোক্ত

গল্পটি কথোপকথনচ্ছলে বিবৃতি করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য আখ্যানবস্তু বা Plot নির্ম্মাণে নিপুণ কৌশল দেখা যায় না। প্রথম অঙ্কটি নাটকের মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন, বাদ দিলেও ক্ষতি হইত না। মদ্যপ-বাতুলের দৃশ্যটা নূতন হইলেও, সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ। এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজী আদর্শে প্রথম নাটক হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট। গ্রন্থকারের স্বভাবাঙ্কণশক্তি ও জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, অঙ্কিত দৃশ্যের স্পষ্টানুভূতি ও তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাংলা সাহিত্যে এই সজীবাঙ্কণক্ষমতা নূতন বটে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাট্যকলা বা প্রতিভার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত; এই দুষ্প্রাপ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানই ইহার সামান্য উদ্দেশ্য।

হরচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী

জেনরেল এসেমব্লি ইনষ্টিটিউশনের গণিত-শিক্ষক তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটককে ইংরেজী আদর্শে রচিত সর্ব্বপ্রথম বাংলা নাটক বলিয়া ধরা হয়। ইহার প্রকাশকাল শকাব্দ ১৭৭৪ (খ্রীঃ অঃ ১৮৫২)। ইহার পর হরচন্দ্র ঘোষের আধুনা-দুষ্প্রাপ্য নাটকগুলিই উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম রচনা। ইহার প্রথম নাটক 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ) অর্থাৎ ভদ্রার্জ্জুনের এক বৎসর পরে মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু ভূমিকার তারিখ হইতে বুঝা যায় যে, উভয় নাটক এক সময়ে রচিত। হরচন্দ্রের 'চারুমুখ-চিত্তহরা' ও 'কৌরব-বিয়োগ' নামক দুইখানি নাটক বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে আমার হস্তগত হইয়াছিল, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি 'বাসন্তিকা' পত্রিকায় (ঢাকা, ১৩৩০, পৃঃ ১৪-১৮) প্রকাশ করিয়াছি। এখন হরচন্দ্র ঘোষের সমস্ত নাটক এবং তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থাবলীও আমার হস্তগত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হরচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ও তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

হরচন্দ্র ঘোষের জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি নাই। তবে তাঁহার বংশধরগণ এখনও (১৩৩৩ সাল) বর্ত্তমান আছেন, এবং আশা করা যায়, তাঁহাদের সুযোগ্য পূর্ব্বপুরুষের জীবনেতিহাস সাধারণের গোচর করিবেন। হরচন্দ্র খ্রীঃ অঃ ১৮১৭ সালে হুগলী বাবুগঞ্জে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা হলধর ঘোষ হুগলী কালেক্টরেটে হেড ক্লার্ক বা প্রধান সেরেস্তাদারের কর্ম্ম করিতেন। ইহাদের আদি বাসস্থান বোধ হয় খানাকুল কৃষ্ণনগর। হরচন্দ্র হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া মালদহে আবকারী-বিভাগের অধ্যক্ষ (Excise Superintendent) হন এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠে বুঝা যায়, ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল; কিন্তু সে কালের ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকদিগের মত ইংরেজী সাহিত্যের দিকেই তাঁহার ঝোঁক বেশী ছিল, এবং তাঁহার প্রথম দুইখানি নাটক সেক্সপীয়রের দুইখানি প্রসিদ্ধ নাটক অবলম্বনে রচিত। কিন্তু 'কৌরব-বিয়োগে'র নাট্যবস্তু মহাভারতের উপাখ্যান হইতে গৃহীত এবং তাঁহার 'রাজতপস্বিনী' কাব্য মহাভারতের প্রসিদ্ধ কাশীরাজকন্যা অম্বার উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি

প্রাচীন বাঙ্গালার কবিগণের রচনার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ দেখা যায়। 'ভানুমতী-চিত্তবিলাসে'র শেষভাগে তিনি বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন-বর্ণনার অনুরূপ নায়ক-নায়িকার মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। যতদূর জানা যায়, তাঁহার শেষগ্রন্থ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

কলিকাতায় প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থাবলীর ক্রমানুযায়ী তালিকা এইরূপ :—

(১) ভানুমতী-চিত্তবিলাস—১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ

(২) কৌরব-বিয়োগ—১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ

(৩) চারুমুখ-চিত্তহরা—১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ

(৪) বারুণীবারণ বা সুরার সঙ্গদোষ (Two Lectures on the Prevention of Drunkenness) ১৮৬৪ খ্রীঃ অঃ

(৫) রজতগিরিনন্দিনী নাটক—১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ

(৬) রাজতপস্বিনী কাব্য—১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ

(৭) সপত্নী সরো (বোধ হয়, উপন্যাস)—১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ

(৮) শিবাজীর জীবনী হইতে উপদেশ সঙ্কলন (এই পুস্তকের ভাষা ইংরেজী কি বাঙ্গলা তাহা জানা যায় নাই)—১৮৮০ খ্রীঃ অঃ।

১। ভানুমতী-চিত্তবিলাস

হরচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' সেক্‌স্‌পীয়রের 'Merchant of Venice' অবলম্বনে লিখিত। ইহার পরিচয়পত্র (Title-page) এইরূপ :—

ভানুমতীচিত্তবিলাস/ নাটক/ হুগলী বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব ছাত্র/ ইদানীং/ মালদহের আব্‌কারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট/ শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ/ কর্ত্তৃক রচিত।/ কালকাতা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।/ সন ১৮৫৩। শকাব্দ ১৭৭৫।/

ইহার প্রথমেই দুইটি ভূমিকা আছে; একটি বাঙ্গালায় ও অপরটি ইংরাজীতে লিখিত। নিম্নে উভয় ভূমিকাই প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে গ্রন্থকারের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

"এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি "সেক্‌স্‌পিয়র" নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনামপ্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে "মরচেণ্ট-অফ-ভিনিস" ইত্যভিধেয় অপূর্ব্ব কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ

কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্ মহাশয় উল্লিখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম্মমাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুসারে এই "ভানুমতী চিত্তবিলাস" নাটক গদ্যপদ্যে রচনা করিলাম। যদ্যপিও ইহাতে উল্লিখিত ইংরাজী কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা স্বদ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশকালে পাঠামোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজের মনোনীত হয়, তবে আমি প্রকৃষ্টরূপে কৃত স্বীয় পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং সুধীবরেম্বিতি।

হুগলী
ভাদ্র। ১৭৭৪ শকাব্দ

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ

PREFACE

In presenting this piece of dramatic composition to my indulgent readers, I would observe, that at the suggestion of an European friend of native education, I had originally undertaken the translation of Shakespeare's Merchant of Venice—a play, which, though inferior in some respects to *Macbeth*, *Hamlet*, *Lear* and *Othello* or perhaps to the First and Second parts of *Henry VI*, was considered the best for the purpose for which the translation was avowedly undertaken by me. But the plan was abandoned before I had distanced the flight of *Jessica*, some of my learned friends having surmised that my performance was not likely to be popular, unless the mode in which it was done were altered. I took their advice and undertook to write it in the shape of a Bengali *Natuck* or Drama, taking only the plot and underplots of the Merchant of Venice, with considerable additions and alterations to suit the native taste; but at the same time losing no opportunity to convey to my countrymen

who have no means of getting themselves acquainted with Shakespeare, save through the medium of their own language, the beauty of the author's sentiments as expressed in the best passages in the play in question. The sort of reception my *Natuck* is to meet with from the public, I can by no means divine or guess at, the work being of a novel character,* professing, as it does, to be a Bengali *Natuck*, though written much after the manner of an English play. But should my work meet with their approbation, I would deem my labours amply rewarded, and, if thus encouraged, endeavour to devote my leisure hours to writing other works of a similar nature.

Hooghly, 20th October, 1852 — Hurro Chunder Ghose"

নাটকের প্রারম্ভে নান্দী, প্রথমতঃ ত্রিপদী ছন্দে সরস্বতীবন্দনা, যথা,—

"সারদে বরদে বাণি নারায়ণি বীণাপাণি।
তার মাগো সর্ব্বপ্রাণি, ভবভয়ভঞ্জিনী॥"

—ইত্যাদি।

তারপর সংস্কৃত নাটকানুযায়ী সূত্রধার ও নর্ত্তকীর পয়ার ছন্দে আলাপ এবং নর্ত্তকীর গান।

নাটকখানি ১—১৯৮ পৃষ্ঠায় পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। এই অঙ্কবিভাগ ইংরেজী Actএর অনুরূপ। ইংরেজী Sceneএর অনুযায়ী প্রত্যেক অঙ্ক আবার অঙ্কে বিভক্ত। বিভাগ এইরূপ: ১ম অঙ্ক—৬; ২য়—১০; ৩য়—৮; ৪র্থ—৯; ৫ম—৩।

সেক্‌স্‌পীয়রের মূল নাটকের তালিকার সহিত নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের তালিকার মিল রহিয়াছে; তবে তাহাদের নাম ও উপাধি বিভিন্ন এবং দুই একটি ছোটখাট চরিত্র গ্রন্থকারের নিজের সৃষ্টি; যথা,—কালুরায় জ্যোতির্ব্বেত্তা নাপিত ও তাহার মুখরা পত্নী মালতী, উজ্জয়িনী-দেশীয় ভাট ও রাজদূত গঙ্গানায়ক, সদানন্দ ভাঁড় ও তাহার স্ত্রী বিলাস ইত্যাদি।

---

* হরচন্দ্র নিজের রচনাকে প্রথম বাংলা নাটক বলিতেছেন; তাহাতে বোধ হয়, তিনি 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক দেখেন নাই। 'কৌরববিয়োগে'র ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, 'ভানুমতীচিত্ত-বিলাস' কখনও কোন নাট্যশালায় অভিনীত হয় নাই।

নাট্যবর্ণিত প্রধান ব্যক্তির নাম ও উপাধি এইরূপ দেওয়া হইয়াছে,—

Duke of Venice	বীরবর, উজ্জয়িনী দেশের রাজা।
Prince of Morocco } Suitors to Portia	কন্দর্পকেতু, কাশীরাজপুত্র } ভানুমতী-লাভার্থী।
Prince of Arragon } Suitors to Portia	বিজয়কেতু, কলিঙ্গরাজপুত্র } ভানুমতী-লাভার্থী।
Antonio	চারুদত্ত, গুজরাটদেশীয় পোতবণিক্।
Bassanio	চিত্তবিলাস, চারুদত্তের মিত্র ও ভানুমতীলাভার্থী।
Salanio } Friends to Antonio	চিত্রসেন } চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অমাত্য।
Salarino } Friends to Antonio	জয়দেব } চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অমাত্য।
Gratiano } Friends to Antonio	সহদেব } চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অমাত্য।
Lorenzo	চন্দ্রসেন, চারুদত্ত ও চিত্তবিলাসের অন্তরঙ্গ ও শশিমুখীকন্যার্থী।
Shylock	লক্ষপতি রায়, গুজরাটদেশীয় উৎকট কুসীদগ্রাহী কৃপণ মহাজন।
Tubal	গণপতি রায়, উক্ত মহাজনের কুটুম্ব ও অনুগত।
Lancelot Gobbo	দুলালদাস, লক্ষপতির কৃষাণ ভৃত্য।
Old Gobbo	নন্দলাল, দুলালের অতিবৃদ্ধ পিতা।
Portia	ভানুমতী, রাজকন্যা (অনূঢ়া)।
Nerissa	সুশীলা, মন্ত্রি-পুত্রী ও রাজকন্যার সহচরী।
Jessica	শশিমুখী, লক্ষপতির কন্যা।
No corresponding character in Shakespeare	চন্দ্রাবলী, রাজমহিষী। সুলোচনা, রাজকন্যার সহচরী। সাবিত্রী, লক্ষপতির ভার্য্যা। সেবিকা, সাবিত্রীর দাসী।

"নাট্যাগার কদা উজ্জয়িনী কদাচিত্বা গুজরাট দেশে হইবেক।"

প্রথম অঙ্ক ১-২৪ পৃষ্ঠা)—

প্রথম অঙ্ক (১-৩ পৃঃ)। উজ্জয়িনী রাজবাটী। নান্দী, সরস্বতীবন্দনা, সূত্রধার ও নর্ত্তকীর কথোপকথন। সমস্তই প্রায় পয়ার ছন্দে।

দ্বিতীয় অঙ্ক (৩-৬ পৃঃ)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। রাণী চন্দ্রাবলী তাঁহার কন্যা ভানুমতীর বিবাহের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা; রাজা বীরবরের সহিত আলোচনার পর রাজমন্ত্রী "সম্পুট" (casket) স্থাপনের পরামর্শ দিলেন।

তৃতীয় অঙ্ক (৭-১৪ পৃঃ)। দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। ভানুমতী ও সুলোচনা পূর্ব্বোক্ত সর্ত্তের কথা শুনিয়াছেন। চিত্তবিলাসের প্রতি ভানুমতীর অনুরাগ স্বীকার। সুশীলা পরামর্শ দিলেন যে, গুজরাট নগরে ভাট পাঠান হউক; কিন্তু সুলোচনা এ বিষয়ে মত দিলেন না। তাহার পর সদানন্দের স্ত্রী বিলাসের ফুল, পান ও গন্ধদ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ। এই শেষ অংশ গদ্যে, কিন্তু পূর্ব্বভাগ পদ্যে। বিলাসের প্রসঙ্গের কোনও সার্থকতা নাই, কিছু অনাবশ্যক ভাঁড়ামি আছে।

চতুর্থ অঙ্ক (১৫-১৭ পৃঃ)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর বহিঃপ্রকোষ্ঠ। রাজা এবং তৎপারিষদবর্গ বিবাহের লগ্ন স্থির করিলেন। গঙ্গানায়ক ভাটের প্রবেশ, এবং বিজয়কেতু ও কন্দর্পকেতু নামক 'ভানুমতীলাভার্থি'-দ্বয়ের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন। সমস্তটাই গদ্যে, কেবল ভাট-কর্ত্তৃক রাজকুমারদ্বয়ের বর্ণনা পদ্যে, ভারতচন্দ্রের অনুকরণে, পয়ার ছন্দে।

পঞ্চম অঙ্ক (১৭-১৯ পৃঃ)। উজ্জয়িনী নগর, সদানন্দ ভাঁড়ের বাটী। সদানন্দ ও তাহার রসিকা স্ত্রী বিলাসের কথোপকথন; সমস্তটাই গদ্যে, কিন্তু ভাষা অত্যন্ত আড়ষ্ট। এই দৃশ্যের কোনও আবশ্যকতা বুঝা যায় না।

ষষ্ঠ অঙ্ক (২০-২৪ পৃঃ)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। সুলোচনাকর্ত্তৃক ভানুমতীর পাণিপ্রার্থী বিভিন্ন দেশের রাজকুমারদের বর্ণনা। কিন্তু ভানুমতীর কাহাকেও মনোনীত হইতেছে না। অঙ্গ, বঙ্গ, কাঞ্চী, কান্যকুব্জ, মগধ, মথুরা ও মিথিলা, প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান প্রদেশ হইতে রাজকুমারেরা আসিয়াছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক (২৪-৬৫ পৃঃ)—

প্রথম অঙ্ক (২৪-২৭ পৃঃ)। গুজরাট নগর, চারুদত্ত বণিকের বাটী। চিত্তবিলাস ভানুমতীর প্রেমে পড়িয়াছেন এবং মিলনের জন্য কাতর। চারুদত্ত চন্দ্রসেনকে লক্ষপতির নিকট হইতে টাকা ধার করিবার জন্য পাঠাইলেন। রঙ্গভূমি হইতে অন্য সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলে লক্ষপতি ও তাঁহার কন্যা শশিমুখীর বিষয়ে চন্দ্রসেনের নিভৃত চিন্তা ও স্বগতোক্তি। সমস্তটাই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে।

দ্বিতীয় অঙ্ক (২৮-৩১ পৃঃ)। গুজরাট নগরে চন্দ্রসেনের বাটী। চন্দ্রসেন লক্ষপতির নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এবং তাঁহার ভৃত্যকে ক্ষৌরকার্য্যের জন্য নাপিত ডাকিতে আদেশ করিলেন। জ্যোতির্বিদ্ নাপিত-কর্ত্তৃক ক্ষৌরকার্য্যের বিধিনিষেধ লইয়া কৌতুক ও নিজের পুরাণ ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় প্রদান। এই দৃশ্যটী সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। গদ্য।

তৃতীয় অঙ্ক (৩১-৩৩ পৃঃ)। গুজরাট নগরের রাজপথ। চন্দ্রসেনের ভৃত্যের সহিত কালুরায় নাপিতের সাক্ষাৎ এবং মুখরা মালতীর প্রবেশ ও রঙ্গকৌতুক। সমস্তটা গদ্যে, কিন্তু নিরর্থক।

চতুর্থ অঙ্ক (৩৪-৪০ পৃঃ)। গুজরাট নগর, লক্ষপতি মহাজনের বাটী। চন্দ্রসেন চারুদত্তের প্রার্থনা লক্ষপতিকে জানাইলেন; পরে চারুদত্তের প্রবেশ। সমস্তটাই মূলের প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের অনুবাদ। শেষ ভাগের দুইটী পয়ার ছাড়া সমস্তটাই গদ্যে।

পঞ্চম অঙ্ক (৪০-৪৫ পৃঃ)। লক্ষপতির বাটীর অন্তঃপুর। লক্ষপতির নৃশংসতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গ্রন্থকার লক্ষপতির ভার্য্যা সাবিত্রীর চরিত্রটি অতিরিক্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দৃশ্যে শশিমুখী সাবিত্রীর দাসী সেবিকার নিকট নিজের এবং মাতার দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন। সেবিকা চন্দ্রসেনের কথা বলিল এবং দুলাল চাকরকে দিয়া তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য উপদেশ দিল। দুলাল লক্ষপতির নিকট চাকরী করিতে নারাজ এবং চিত্তবিলাসের নিকট চাকরীর উমেদার। তাহার হাতে একখানি চিঠি চন্দ্রসেনের নিকট পাঠান হইল।

ষষ্ঠ অঙ্ক (৪৭-৫২ পৃঃ)। গুজরাট নগর, রাজপথ। দুলাল এবং তাহার বৃদ্ধ পিতা নন্দলালের সাক্ষাৎ। প্রথমে পদ্য, কিন্তু পিতাপুত্রের কথোপকথন গদ্যে। চিত্তবিলাসের প্রবেশ এবং দুলালকে ভৃত্যরূপে নিয়োগ। চিত্রসেন সুশীলার সহিত প্রেমে পড়িয়াছেন এবং দীর্ঘ পয়ার ছন্দে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। পরে দুই বন্ধু একত্র উজ্জয়িনী যাইবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। এই অংশটি পদ্যে (মূলের ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্যের মোটামুটি অনুবাদ)।

সপ্তম অঙ্ক (৫২-৫৪ পৃঃ)। গুজরাট নগর, চন্দ্রসেনের বাটী। দুলাল শশিমুখীর চিঠি চন্দ্রসেনকে দিল। লক্ষপতি চিত্তবিলাসের বাড়ীতে রাত্রে আহার করিতে যাইবেন; সেই সময় চন্দ্রসেন শশিমুখীকে লইয়া পলায়ন করিবেন, এই মন্ত্রণা দুলাল চন্দ্রসেনকে জানাইল। সমস্তটা পদ্যে।

অষ্টম অঙ্ক (৫৪-৬২)। লক্ষপতির বাটী। সাবিত্রী স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে গৃহলক্ষ্মী তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। লক্ষপতি সাবিত্রীকে তাহার পিত্রালয় গমনের অনুমতি দিলেন। সমস্ত পদ্যে। পরে দুলালের প্রবেশ এবং লক্ষপতিকে চিত্তবিলাসের নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান। এই অংশ গদ্যে। (মূলের ২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য)।

নবম অঙ্ক (৬২-৬৪)। লক্ষপতির বাটির সম্মুখে রাজপথ। শশিমুখীর পুরুষবেশে প্রবেশ ও চন্দ্রসেনের সহিত পলায়ন। (মূলের ২য় অঙ্ক ৬ষ্ঠ দৃশ্যের অনুবাদ)।

দশম অঙ্ক (৬৪-৬৬)। গুজরাটনগর পথ। চারুদত্ত চিত্রসেনকে চিত্ত-বিলাসের সহিত নৌকায় যাইতে বলিলেন। অন্তে দুলালের গান।

তৃতীয় অঙ্ক (৬৬-১১৬ পৃঃ)—

প্রথম অঙ্ক (৬৬-৬৯)। "গুজরাটনগরৈকরাজপথে" সহদেব ও জয়দেব-কর্তৃক চিত্তবিলাসের উজ্জয়িনীযাত্রার সংবাদ প্রদান ও লক্ষপতির দুঃখ বর্ণন।

দ্বিতীয় অঙ্ক (৬৯-৭০)। উজ্জয়িনীনগর রাজবাটী। বীরবর ও গঙ্গানায়ক ভাট ভানুমতীর পাণিপ্রার্থী কাশী ও কলিঙ্গের রাজপুত্রদ্বয়ের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

তৃতীয় অঙ্ক (৭০-৭৭ পৃঃ)। "উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর মধ্যে সম্পুট গৃহে"। মূলের ২য় অঙ্ক ৭ম দৃশ্যের 'Casket-Scene'এর অনুবাদ। ভানুমতী বাহিরে, কিন্তু সুলোচনা ও সুশীলা যবনিকার অন্তরালে।

চতুর্থ অঙ্ক (৭৮-৮৪) গুজরাটনগর রাজপথ। (মূলের ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য)। গদ্যে।

পঞ্চম অঙ্ক (৮৫-৯৬)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। সম্পুটগৃহে চিত্তবিলাসের পরীক্ষা। মূলের প্রসিদ্ধ casket-scene (৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য) এর অনুবাদ, বেশীর ভাগ পদ্য।

ষষ্ঠ অঙ্ক (৯৬-১০৩)। উজ্জয়িনীনগর, কুঞ্জবন সরোবরতট। সুশীলা ও চিত্রসেনের সাক্ষাৎ; পরে চিত্তবিলাস ও দুলালের প্রবেশ।

সপ্তম অঙ্ক (১০৩-১১০) ভানুমতী, চন্দ্রাবলী, সুলোচনা, ও সুশীলা। পরে রাজা বীরবরের ভাট পরিষদগণ প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ ও চিত্তবিলাসকে কন্যাদান। সেই সঙ্গে চিত্রসেনেরও সুশীলা লাভ।

অষ্টম অঙ্গ (১১০-১১৬)। উজ্জয়িনীর রাজবাটীর অন্তঃপুর। নবপরিণীত বর ও বধূর কৌতুক ও আমোদপ্রমোদ। ইতিমধ্যে বিলাসের প্রবেশ ও রঙ্গকৌতুক।

চতুর্থ অঙ্ক (১১৭-১৮২)—

প্রথম অঙ্গ (১১৭-১১৯)। গুজরাটনগর বিচারালয়। শক্তিধর-ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট লক্ষপতির অভিযোগ। গদ্য।

দ্বিতীয় অঙ্গ (১১৯-১২৫)। গুজরাটনগর কারাগার সম্মুখস্থ রাজপথ। কোটাল ও দণ্ডনায়ক কর্ত্তৃক চারুদত্তের গ্রেপ্তার; সহদেবের হস্তে চিত্তবিলাসকে চারুদত্তের পত্র প্রদান। গদ্য।

তৃতীয় অঙ্গ (১২৫-১৩০)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। রাজা ও রাণী তীর্থযাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করিতেছেন। পদ্য। এই দৃশ্যের প্রয়োজন এই যে রাজা ও রাণী তীর্থযাত্রা না করিলে ভানুমতী স্বাধীনা হইতে পারে না।

চতুর্থ অঙ্গ (১৩০-১৩৩ পৃঃ)। উজ্জয়িনীনগর রাজপথ। চন্দ্রসেন ও শশিমুখী, কিয়ৎ দূরে দুলাল, সদানন্দ ভাঁড় ও বিলাস। গদ্য।

পঞ্চম অঙ্গ (১৩৩-১৪২ পৃঃ)। উজ্জয়িনী রাজবাটীর অন্তঃপুর। শশিমুখী, চন্দ্রসেন ও দুলাল আসিয়া ভানুমতী চিত্তবিলাস প্রভৃতির সহিত যোগদান করিলেন। পরে সহদেব আসিয়া চারুদত্তের চিঠি চিত্তবিলাসকে দিলেন, এবং চিত্তবিলাস গুজরাটযাত্রার সঙ্কল্প করিলেন। গদ্য।

ষষ্ঠ অঙ্গ (১৪২-১৪৭ পৃঃ)। দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। ভানুমতী ও সুশীলার গুজরাট যাত্রা ও বিচারালয়ে চারুদত্তের পক্ষসমর্থনের সঙ্কল্প। অল্পাংশ গদ্য।

সপ্তম অঙ্গ (১৪৭-১৫০ পৃঃ)। উজ্জয়িনীনগর কুসুমকানন। শশিমুখী ও চন্দ্রসেন, চিত্তবিলাস ও ভানুমতীর অনুপস্থিতিতে, উজ্জয়িনী রাজবাটীর সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণের ভার পাইয়াছেন। এই দৃশ্যটি অনাবশ্যক।

অষ্টম অঙ্গ (১৫০-১৭৯ পৃঃ)। গুজরাটনগর, বিচারালয়। মূলের প্রসিদ্ধ Court Scene (৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)এর অনুবাদ। ভানুমতী বিদ্যাধর শাস্ত্রী (Dr. Bellario) সাজিয়া চারুদত্তের তরফে ওকালতী করিতে আসিয়াছেন ও সঙ্গে মুহুরীবেশে সুশীলা। বেশীর ভাগ গদ্যে।

নবম অঙ্গ (১৭৯-১৮২ পৃঃ)। গুজরাটনগর, রাজপথ। ছদ্মবেশে ভানুমতী ও সুশীলা এবং পরে চিত্রসেনের অঙ্গুরীয় লইয়া প্রবেশ। (মূলের ৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্যের অনুবাদ)।

পঞ্চম অঙ্ক (১৮২-১৯৮ পৃঃ)—

প্রথম অঙ্ক (১৮২-১৯১ পৃঃ)। উজ্জয়িনীর রাজবাটীসমীপস্থ উপবন। ভানুমতী ও সুশীলার উজ্জয়িনী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। প্রায় সমস্তটাই পদ্যে, পয়ার ভিন্ন মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দে।

দ্বিতীয় অঙ্ক (১৯১-১৯৪ পৃঃ)। উজ্জয়িনী রাজবাটির অন্তঃপুর। চিত্তবিলাস ও চিত্রসেনের প্রত্যাবর্ত্তন এবং ভানুমতী ও সুশীলার সহিত মিলন (মূলের ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্যের অনুবাদ)। এই অঙ্কে পয়ার ভিন্ন একাবলী, দ্বিপদী, ভঙ্গপয়ার প্রভৃতি অনেক ছন্দের নৈপুণ্য দেখাইতে গ্রন্থকার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু এইখানেই মূলের ন্যায় নাটকের সমাপ্তি নয়।

তৃতীয় অঙ্ক (১৯৫-১৯৮) দৃশ্য পূর্ব্ববৎ। দুলালের সহিত বিলাসের ভগ্নীর বিবাহ। এটি গ্রন্থকারের কল্পনাপ্রসূত।

'ভানুমতী-চিত্তবিলাসে'র উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, যদিও ইহা সেক্‌স্‌পীয়রের ইংরেজী নাটকের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ নয়, তথাপি গ্রন্থকার সেক্‌স্‌পীয়রের আখ্যানের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই জন্য ইহাতে মৌলিকতা বিশেষ নাই। তবে ইনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বাঙ্গালা নাটকখানিকে দেশ, কাল ও পাত্রের অনুযায়ী করিবার জন্য ইংরেজী নাটকের বহু স্থলে "নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনাদি" করিয়াছেন। এই "নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন" প্রধানতঃ কতকগুলি নূতন চরিত্র ও দৃশ্যের অবতারণায় দৃষ্ট হইবে। কিন্তু যে সকল নূতন চরিত্র বা দৃশ্য তিনি তাঁহার নাটকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষ কোনও সার্থকতা দেখা যায় না; কারণ, সেগুলি বেশীর ভাগই অপ্রধান ও অপ্রাসঙ্গিক। সদানন্দ ভাঁড় এবং তাহার স্ত্রী রসিকা, বিদূষকবর্জ্জিত এই নাটকের হাস্যাস্পদ প্রসঙ্গের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে সকল দৃশ্যে তাহাদের অবতারণা করা হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। কালুরায় জ্যোতির্ব্বেত্তা নাপিত ও তাহার মুখরা পত্নী মালতী সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। চন্দ্রসেনের ক্ষৌরকার্য্যের দৃশ্যটি মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধবিহীন এবং ইহা বাদ দিলেও ক্ষতি নাই। গ্রন্থকার মূলগ্রন্থের শাইলকের চরিত্র যে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। তাহা হইলে তিনি শাইলকের এক ভার্য্যার সৃষ্টি করিতেন না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বোধ হয় এইরূপ ছিল যে, শাইলককে যত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়,

ততই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং সেইজন্য তাহার উপর স্ত্রীনির্য্যাতনের দোষও চাপাইয়াছেন। কিন্তু শাইলক যে মানুষ এবং নিষ্ঠুরতার সহিত তাহার দুই একটি সদ্‌গুণও যে থাকিতে পারে, তাহা গ্রন্থকার ধরিতে পারেন নাই। মূলগ্রন্থে শাইলকের অপত্য-বাৎসল্যের কল্পনা বোধ হয় এই জন্য। হরচন্দ্রের লক্ষপতি "গুজরাট দেশীয় উৎকট কুসীদগ্রাহী কৃপণ মহাজন" হইতে পারেন, কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়রের শাইলক নহেন। সেইজন্য শাইলকের যে বাক্যাবলী লক্ষপতির মুখে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকারের নাট্যকলা ও প্রতিভার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। কিন্তু এই দুষ্প্রাপ্য নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলে এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হয়।

ভানুমতী-চিত্তবিলাসে ভদ্রার্জ্জুন নাটকের ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখা যায় না। ইহার ভাষা মোটেই সরল বা নাটকোপযোগী নহে। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহার ও কাব্যোৎকর্ষবিধানের জন্য কৃত্রিমতাপূর্ণ সাধুভাষা প্রয়োগের ইচ্ছা (বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনা ও নায়ক-নায়িকার রূপবর্ণনা প্রভৃতির স্থলে) ইহার ভাষাকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও উৎকট করিয়াছে। নাট্যকারের উপজীব্য মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা গ্রন্থকারের যে বিশেষ আছে তাহা বোধ হয় না, এবং সেই জন্য ভাষা ও চরিত্রচিত্রাঙ্কন জীবনের আদর্শের কাছাকাছি পৌঁছায় নাই। চরিত্রগুলিও সজীব হয় নাই, ভাষাও আড়ষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তিরও একান্ত অভাব দেখা যায়। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অনুবাদের জন্য যেরূপ কবিত্বশক্তির প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। অবশ্য তিনি পয়ারাদি ছন্দে পদ্য রচনা করিতে পারিতেন এবং এই নাটকের শেষভাগে বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে নায়ক-নায়িকার মিলন-বর্ণনার বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। কিন্তু কোনও উৎসর্পিণী কবিকল্পনা বা তদুপযোগী ভাষা ও ছন্দ তাঁহার আয়ত্ত নহে। একটি উদাহরণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। পোর্সিয়ার সুপ্রসিদ্ধ দয়ামাহাত্ম্য-বর্ণন আমাদের গ্রন্থকার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"দয়ার শুনহ গুণ লক্ষপতি রায়।
দয়ার গুণের কথা বর্ণন না যায়॥
অসীম দয়ার গুণ জগতে প্রচার।
গগন অম্বুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তার॥

গগনাম্বু ক্ষিতি যেন স্নিগ্ধমতি করে।
দয়াধর্ম্ম সেইরূপ শুভ করে নরে॥
দুই মতে শুভকরী দয়ারে জানিবে।
দাতা গ্রহীতার সেই কল্যাণ করিবে।
দয়াবান্ হয় সুখী দয়া প্রকাশিয়া।
গ্রহীতা কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া॥"

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

গদ্যের ভাষাতেও যে বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখা যায় তাহা নয়। নিম্নে বিচারালয়ের দৃশ্য হইতে একাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"চিত্র. লক্ষরায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার কারণ কি?

লক্ষ. (তর্জ্জনপূর্ব্বক) ইহার কারণ যে বেটাদের শাণ নাই সেই বেটাদিগকে আরও শাণ করিব। এই জন্য ছুরিতে শাণ দিতেছি।

চিত্র. লক্ষরায় ঐ ছুরিকা তোমার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ঘর্ষণ কর না তাহাতে বিলক্ষণ শাণ হইবে, কেননা করুণবাক্য প্রায় হৃদয় বিদ্ধিতে সমর্থ হয় না। ধাতুময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রেই তোমার কি প্রয়োজন, তোমার লোভ দ্বেষ ও পৈশুন্যরূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহা এত তীক্ষ্ণ যে ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষ্ণতর।

লক্ষ. যদি শূলে না যাও তবে শূলের অগ্রভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাক।

চিত্র. এই নরাধম লক্ষপতি হিংস্রক পশ্বাদির ন্যায় অতি নিষ্ঠুর। ইহাকে দেখিয়া আমার এমন মনে হইতেছে যে কোন হিংস্রক ব্যাঘ্রের বধকালে তাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্য দেহে আবির্ভাব হইয়া থাকিবেক। যেহেতু এই নরাধমের দুরাশা রাক্ষসীরূপা অতি ভয়ঙ্করী শোণিতার্থিনী ক্ষুধার্ত্তা ও সর্ব্বগ্রাসিকা।

লক্ষ. তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস্। আগে ভাবিয়া দেখ আমার ঋণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। আমি বিচারার্থ দণ্ডায়মান আছি।"

২। কৌরব-বিয়োগ

হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব-বিয়োগ' অনুবাদ নহে, গ্রন্থকারের নিজের রচনা। এই নাটকের নাম ও বর্ণনা ইহার পরিচয়-পত্রে এইরূপ দেওয়া আছে:

—"কৌরববিয়োগ / নাটক। / এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু / ভঙ্গাবধি অন্ধরাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত / মহাভারতীয় অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ / গদ্যে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যচ্ছন্দে / শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া / শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। /

এই পুস্তকের দুইটি ভূমিকা আছে,—একটি ইংরাজীতে লিখিত, অপরটি বাংলায়। ইংরেজী ভূমিকায় (তারিখ, হুগলী ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার পূর্ব্বলিখিত ভানুমতী-চিত্তবিলাসের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"In 1852, I published my vernacular drama of the "Merchant of Venice" which was written at the suggestion of an European friend of native education."

বাংলা ভূমিকায় গ্রন্থকার স্বীয় নাটকের উদ্দেশ্য বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ইহার গোড়া হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ লোকেরই অবগতি আছে যে, প্রচররূপে প্রচলিত "মহাভারত" ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ, এবং গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য ও রাজধর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ ও যোগধর্ম্মাদি নানাবিষয়ের উপদেষ্টা বিধায় সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা প্রকৃষ্টরূপে সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক অধ্যাপক ও অধ্যাপিতেরদের পদ্যরচিত গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। এ কারণ সুরচিত "মহাভারত"ও একাল পর্য্যন্ত কষ্টশ্রষ্টে অস্মদাদির কলেজ ও পাঠশালা প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে প্রাপ্তাভীষ্ট হন নাই। এবঞ্চ নবরচিত পদ্যগ্রন্থেও বিদ্যালয়ের বিরতি দেখা যায়। যেহেতুক তাহার অধিকাংশই প্রায়ই সুশ্রাব্য কাব্যরসঘটিত; এই হেতু ইত্যগ্রে কিয়দংশে পদ্যে বিরচিত "ভানুমতীচিত্তবিলাস" ইত্যভিধেয় যে নাটক খানি প্রস্তুতপূর্ব্বক হুগলীর কালেজে কৃপালু প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় বিদ্যাদানার্থ কৌন্সেলে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা মহানুবভব (?) সভ্য মহাশয়েরা সুরচিত বোধ করিলেও অদ্যাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই; অথবা বর্ণিত মহামহিমেরা তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা মদীয় দুর্জ্জেয়। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক "সেক্‌স্‌পিয়র"কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের (অর্থাৎ মর্চ্যাণ্ট-অফ-বেনিসের) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা সেক্‌স্‌পিয়র সাহেবকৃত স্বনামপ্রসিদ্ধ মহানাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে, ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানারসঘটিত ও স্থানে স্থানে এতদ্রূপ সরস আদিরস-

রচিত যে নীতিজ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যোগ্য করিলে "ভারতচন্দ্রে" স্থান নির্য্যাপন করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ হয়।"

এই জন্য গ্রন্থকার আদিরসাত্মক বিজাতীয় নাট্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া "সুমার্জ্জিত সাধুভাষা"য় মহাভারত হইতে দেশীয় আখ্যানভাগ লইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অবলম্বন প্রধানতঃ কাশীরাম দাস, এ কথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন :—

"কাশীদাসের কিয়ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করিলাম।"

এই নাটক পাঁচটি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রত্যেক অঙ্কে এইরূপ "অঙ্গ" (বা দৃশ্য) বিভাগ আছে: ১ম অঙ্ক—৫; ২য়—৬; ৩য়—৪; ৪র্থ—৫; ৫ম—৭। প্রথমেই সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে, কিন্তু বহুল বাগাড়ম্বরের সহিত, নান্দী। এই নান্দীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; তাহা হইতে এই নাটকের ভাষার কিছু নমুনা পাওয়া যাইবে।

"হে মাতর্বাগ্বাদিনী, পরমপরাৎপর পরমেশ্বরপ্রচারিত স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদিস্থ সুরাসুর নাগনরাদি যাবৎ প্রাণীর প্রাণরূপ বায়ু যে তুমি তোমার সুরমানসলম্বিত শ্রীপাদপদ্মযুগল হৃদয়ে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া সৃজন ও পালন ও সংহারের কর্ত্তা হরিহরবিরিঞ্চ্যাদি দেবগণ সৃজনাদিরূপ ভূরীভার সম্পাদন করিতেছেন, এবং তোমার কৃপাকটাক্ষে সহস্রাক্ষ সুকৌশলাৎ ও সদ্‌যুক্তিমত্তায় ভীষণ সুরবৈরিবৃন্দ নিসূদন করিয়া সুরলোকে আধিপত্য করিতেছেন। অপিচ, হে পঙ্কজনেত্রে, তোমার অপাঙ্গদৃষ্টিপ্রসাদে তোমার পাদপদ্মের ধ্যানপরায়ণ হইয়া ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কবীশেরা জগজ্জনানুরঞ্জন সুরসিক সৎকাব্যকর্ত্তা হইয়া তোমার মহতী মহিমার জ্যোতিকে দেদীপ্যমান করিতেছেন।" ইত্যাদি।

এইরূপ সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী ভাষায় প্রায় সমস্ত নাটকখানিই লিখিত। নাটক হিসাবেও ইহা খুব উঁচুদরের রচনা নয়; বরঞ্চ এই আড়ষ্ট ভাষার চাপে পড়িয়া ইহার সমস্ত কথোপকথন ও নাট্যকৌশল ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। চতুর্থ অঙ্ক (পৃঃ ৪২-৪৩) হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী ইত্যাদির কথোপকথন হইতে ইহার কিছু নমুনা দিতেছি :—

"শ্রীকৃষ্ণ। হে পঞ্চালসুতে, বিলাপ সম্বরণ কর। কর্ম্মবশতঃ এই কর্ম্মভূমিতে লোকের ভূয়ঃ ভূয়ঃ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এবং জন্মিলেই মরণের নিশ্চয়তা আছে, কেবল ক্ষীণবুদ্ধি জনেরাই ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া শোকগ্রস্ত

হয়েন। দেখ, সম্পূর্ণ অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া সৈন্তনিকরে সংহার করতঃ পাঞ্চালেরা মৃত্যুকর্ত্তৃক পরাজিত হইল। অতএব বিধির যে নির্ব্বন্ধ তাহা অনিবার্য্য, হে নৃপজায়ে, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আর এই মত বহু বীরবাহুরা ত্রিভুবন বিজয় করিয়া পরিশেষে আপনারা লীলাসম্বরণ করিয়াছেন। অতএব ইতরের ন্যায় ঈদৃশবিলাপপর হওয়া জ্ঞানবতীর কর্ত্তব্য নহে।

দ্রৌপদী। দেব, সংহৃত সৈন্যাদির শোণিতে শিবির মগ্ন, আর অশ্বত্থামার নৈষ্ঠুর্য্যও অনির্ব্বচনীয়। আমি ইহা কিমতে সহ্য করিব।

ভীম। প্রিয়ে, কোন্ উপায়ের দ্বারা তোমার বর্ত্তমান শোক ও দুঃখের শমতা হইতে পারে তাহা আমাকে কহ।

দ্রৌপদী। হে পতে, অরণ্যে ও বিরাটভবনে জয়দ্রথ ও কীচকের সমুচিত শাস্তির বিধান করিয়া আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ। যদি সম্প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই আততায়ি অশ্বত্থামার শিরোমণি আমাকে আনিয়া দেহ।

ভীম। প্রিয়ে, যদি ইহাতে তোমার প্রীতি জন্মে, তবে আমরা অবশ্য ইহার উপায় করিব।

দ্রৌপদী। তোমার অমরবিজয়ি শূরতা শ্লাঘ্য, আর তোমার সৌহৃদ্য আজীবন স্মরণীয়। তোমার কৃত আশ্বাসে আমি কৃতার্থা হইলাম।

যুধি। তথাচ হে ভ্রাতঃ, ব্রাহ্মণ ও বন্ধু আততায়ি হইলেও বধের যোগ্য নহে। ইহাদের মস্তক মুণ্ডন ও দ্রবিণ সংচ্ছেদন ও স্থান হইতে নির্য্যাপন করাই বধতুল্য নচেৎ ইহাদের দৈহিক দণ্ড নাই, ইহা মনে কর।"

স্থানে স্থানে বর্ণনার ঘটা মন্দ নহে; কিন্তু এই সকল বর্ণনা প্রায়ই পদ্যে লিখিত। যথা পৃঃ ১০৮-১২ হস্তিনাপুরবর্ণনা (পয়ার ছন্দে), যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নরকবর্ণনা পৃঃ ১২২-২৩ (পয়ার ছন্দে), ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি পৃঃ ১৩০-১৩১ ইত্যাদি। কিন্তু পদ্যের সংখ্যা বেশি নয়। নমুনা যথা (পৃঃ ৫১)—

বিদুর। উঠহ মহারাজ সকল বিধির কাজ
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার সেই দিন মৃত্যু তার
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি॥

৩। চারুমুখ-চিত্তহরা

হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটকখানির নাম "চারুমুখ-চিত্তহরা"। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৫। ইহার পরিচয় পত্র এইরূপ দেওয়া আছে :—

চারুমুখচিত্তহরা / নাটক। / এতদ্দেশীয় সরল সাধুভাষায় গদ্য পদ্য প্রবন্ধে / (হুগলির) শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক / রচিত। / কলিকাতা / বহুবাজার ষ্ট্রীটের ৫৩ সংখ্যক ভবনস্থ কেনিংযন্ত্রে / মুদ্রাঙ্কিত। / ইং ১৮৬৪ সাল। /

এই নাটক উক্ত দুইখানি নাটকের অনেক পরে রচিত, এবং ইহার ভাষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন :—

"এই গ্রন্থ অতিশয় অলঙ্কৃত সুমার্জ্জিত সাধুভাষায় না লিখিয়া সামান্যতঃ কথিত কোমল সরল বাক্যে রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৌতূহলজন্য এতন্নাটিকা নেপথ্যের উপযোগিনী করা যায়।"

ইংরজী ভূমিকায় (তারিখ কলিকাতা, ১৮৬৩) গ্রন্থকার স্বীয় উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

Some time ago, I was desired by a learned friend of mine, who is now no more "to show 'Romeo and Juliet' in an oriental dress"—"rich, not gaudy." It was also suggested that it should be rendered in the simplicity and elegance of colloquial language with the view to adapt the same more to the stage * than to the study. The character of the present work which I am about to lay before the public, will, therefore, be found to differ, in some respects, from that of my other dramatic writings; and the slight additions and alterations which have been advisedly made in it are adapted to suit the taste of all classes of natives of this country.

এই নাটকের বর্ণনীয় ঘটনার স্থল কর্ণাট দেশ। ভোজবংশের রাজা মহীশূরের পুত্র চারুমুখ এবং সিন্ধুবংশের রাজা অংশুমানের কন্যা চিত্তহরা মূল নাটকের

* কিন্তু ইহা এবং হরচন্দ্রের অন্যান্য নাটক কখনও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই।

রোমিও ও জুলিয়েতের স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথমেই নান্দী ও সূত্রধার কর্ত্তৃক প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনায় দুই বংশের রেষারেষি ও নায়ক নায়িকার প্রণয়-কাহিনীর সূচনা করা হইয়াছে। ইহার ভাষা খুবই সরল; কিন্তু অনেক জায়গায় তাহাতে কিছু গাম্ভীর্য্যের হানি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নাটকের সংস্কৃত-কণ্টকিত ভাষার চেয়েও এখানে যথেষ্ট চলিত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়।

"সূত্রধার। প্রিয়ে সে কথাটি কি?

নর্ত্তকী। তা আমি তোমাকে বলবো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি যে মেয়ে মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ মানুষ হয়েও একটি কথা পেটে রাখতে পার না।

সূত্রধার। প্রিয়ে! তুমি এইবার খালি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখবো। আমার দিব্বি, যদি না বল। দেখ, আমি তোমা বই আর কারু নই।

নর্ত্তকী। তোমার সঙ্গে যখন যার ভাব হয়, তাকেই তো ওই কথা বল যে, প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমারি। তোর বই আর কারু নই। কিন্তু তুমি যে কার, তা তোমার বিধাতাই জানেন।" ইত্যাদি।

গম্ভীর বিষয়ের অবতারণার সময় গ্রন্থকার আবার তাঁহার পুরাতন কৃত্রিম ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু 'কৌরব-বিয়োগে'র মত আগাগোড়া কটমট ভাষাতে লিখেন নাই। ইহার একটি নমুনাই যথেষ্ট হইবে:—

"প্রেমের তো পদ্ধতিই এই; তাতে আবার তুমি খেদ করে কেন আমার দেহ ছেদ কর। প্রেমাসক্তের অন্তর হইতে যে দীর্ঘনিশ্বাস বহে, সেই ধূমকেই প্রেম বলিলে হয়। তাহা পরিচ্ছন্ন হইলেই তাহাদের নয়নে প্রেমানল দীপ্তমান (?) দেখ; আর সেই ধূম নিষ্পীড়িত হইলে নয়নে বারি সৃজন করিয়া অশ্রুরূপে সাগরের পুষ্টিবৃদ্ধি করে। ইহার দ্বিতীয়ার্থ এই যে প্রেম ক্ষিপ্ততাবিশেষ, অথচ বিবেচনাবিশিষ্ট। কটুতায় বুঝি কালকূটের সমান হইবে, অথচ মিষ্টতায় প্রাণ রক্ষা করে।"

যদিও হরচন্দ্র এই নাটকে অনেকটা সরল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তবুও তাহা যে সংস্কৃতানুযায়ী, কৃত্রিম ও নাটকের অনুপযোগী, তাহা বলা বাহুল্য। যেখানে লঘুভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাহা অনেক সময় যে নিতান্ত খেলো হইয়া যায় নাই, তাহাও বলা যায় না। হরচন্দ্রের প্রথম

নাটক মাইকেল ও রামনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, বাকী দুইখানি নাটক সমসাময়িক বা কিছু পরে রচিত। এমন কি, "চারুমুখ-চিত্তহরা" নীলদর্পণের অনেক পরে প্রকাশিত। কিন্তু তখনকার নাটকে (যথা কালীপ্রসন্ন সিংহের নাটকাবলীতে) অধিকাংশ কৃতবিদ্য লেখক সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর ভাষা ব্যবহার করিতেন। এমন কি নীলদর্পণেও তাহার অভাব নাই।

হরচন্দ্রের নাট্যকলা সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। কারণ, নাট্যকার হিসাবে সমসাময়িক রামনারায়ণ, মাইকেল বা দীনবন্ধুর ছায়াও তিনি স্পর্শ করিতে পারেন নাই। এই রচনাগুলি আকৃতিতে নাটক হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। "কৌরব-বিয়োগে"র চরিত্রসমূহ অমানুষ বীর্য্য বা অন্য গুণগ্রামে ভূষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা যে রক্তমাংসের জীব, তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয় নাটক "চারুমুখ-চিত্তহরা"র কাহিনী হইয়াছে মামুলী প্রথাগত কাব্যের নায়ক-নায়িকার গল্পের মত বৈচিত্র্য-বর্জ্জিত ও অস্বাভাবিক; গ্রন্থকার জীবনের চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই, পুস্তকগত আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাকে সেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদ বলিয়া ধরাই ধৃষ্টতা; কারণ, সেক্‌স্‌পীয়রের কবিত্ব বা নাট্যপ্রতিভার কণামাত্রও ইহাতে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউএর কোন সমালোচক (১৮৫৯ Misc. Notices, p. xvii) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ—"There is nothing striking or original in the whole concern. We have not met with a single original image or thought. Many of our native friends are fond of appearing in the world as poets; but we would remind them of the ancient saying; *poeta nascitur non fit.*"

৪। রজতগিরিনন্দিনী

'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত; ইহার পূর্ব্বে 'ভদ্রার্জ্জুন' ভিন্ন, বোধ হয়, অন্য কোনও বাঙ্গালা নাটক ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই পুস্তকখানির যথেষ্ট মূল্য আছে। 'কৌরব-বিয়োগ' (১৮৫৮) এবং 'চারুমুখ-চিত্তহরা' (১৮৬৪) এই দুইখানি নাটক, কালীপ্রসন্ন সিংহের তিনখানি নাটক* ও রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-

* বিক্রমোর্ব্বশী (১৮৫৭), সাবিত্রীসত্যবান্ (১৮৫৮), মালতীমাধব (১৮৫৯)।

কুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪), 'বেণীসংহার' (১৮৫৬) ও 'রত্নাবলী'র (১৮৫৮) সমসাময়িক। সুতরাং এই দুইখানি নাটক রচনাতেও হরচন্দ্রের যথেষ্ট মৌলিকতার দাবী রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার তৃতীয় নাটক 'রজতগিরিনন্দিনী' ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের, মাইকেলের ও দীনবন্ধুর রচনার অনেক পরবর্ত্তী। এই হিসাবে ইহাতে নূতনত্ব এবং রচনার পরিপক্কতা যতটা আশা করা যায়, তাহা একেবারেই নাই; সুতরাং এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এই গ্রন্থের পরিচয়পত্র এইরূপ:—

"রজতগিরিনন্দিনী / নাটক। / শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত /, এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত। /, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক / ভবনে ষ্টান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। / সন ১২৮১ সাল।/ (= ১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ)।

প্রারম্ভে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে। তাহা এইরূপ:—

"পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশালা না থাকায় সুরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রায় অন্তঃপটে থাকিত। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিদ্বান্ লোকেরই অনুরাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত সর্ব্বজনসাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দূর হওয়াতে নাটক রচনার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইয়াছে।

অতএব এই সুসঙ্গতিহেতু ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনয় নাটকগুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন আর কোন স্বার্থ নাই। হুগলী, বঙ্গাব্দা ১২৮১ বৈশাখ।"

ব্রহ্মদেশীয় কোন্ কাব্য অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নামের একখানি নাটক আছে এবং দুইখানি নাটকের আখ্যান-ভাগের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'কিন্নরী' নাটকও এই উপাখ্যান লইয়াই রচিত। গল্পটি অতি সামান্য এবং নাটকের চেয়ে কাব্যেরই অধিকতর উপযোগী। গল্পটি এই।—পিঙ্গলদেশের যুবরাজ পরীরাজকন্যা ক্ষণপ্রভাকে স্বপ্নে দেখিয়া, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। ক্ষণপ্রভা রজতগিরি নামক পরীরাজ্যের রাজার কন্যা। প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধন্বা নামক ব্যাধ রাজানুগ্রহলাভের আশায় কোনও কৌশলে

রাজকন্যাকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য পরীরাজ্যের দিকে যাইতে যাইতে পিঙ্গলনগরের নিকবর্ত্তী কমলসাগর নামক হ্রদের নিকট পৌছিল। সেই হ্রদের নিকটে এক ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া সুধন্বাকে একটি মায়াপাশ দান করিয়া বলিলেন যে ইহাতেই তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। ইত্যবসরে ক্ষণপ্রভা ও তাহার দুই ভগিনী কমলসাগরে স্নান করিতে আসিয়াছেন। সুধন্বা মায়াপাশের কৌশলে ক্ষণপ্রভাকে বন্দী করিয়া আনিয়া রাজপুত্রকে উপহার দিলেন। ক্ষণপ্রভা প্রথমে অনেক কান্নাকাটি করিলেন, কিন্তু পরে রাজপুত্রকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। এ দিকে তাহার দুই ভগ্নী পরীরাজ্যে ফিরিয়া গিয়া পরীরাজকে সমস্ত কথা বলিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিঙ্গলরাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী রাজাদিগকে পিঙ্গলরাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। মস্ত যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল; যুবরাজ তাঁহার অন্তর্বত্নী পত্নী ক্ষণপ্রভাকে রাজধানীতে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। দেশে অনেক অমঙ্গল ও উৎপাতের লক্ষণ দেখা গেল এবং বৃদ্ধ রাজা যৌবনাশ্ব দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। রাজপুত্রের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ রাজধানীর কোনও 'অনাগতবাদী' আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে রাজপুত্রবধূ ক্ষণপ্রভা অমঙ্গল-রূপিণী এবং তাঁহারই জন্য রাজ্যে নানারূপ অশুভসঙ্ঘটন হইতেছে। রাজা ক্ষণপ্রভাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহার নবপ্রসূত সন্তানটি রাখিয়া ক্ষণপ্রভা কমলসাগরের নিকটবর্ত্তী সেই বনে ব্রহ্মচারীর আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর উপদেশে শূন্যমার্গ অবলম্বন করিয়া পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু স্বামী প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে দিবার জন্য সন্ন্যাসীর নিকট বিঘ্নপ্রতিষেধক একটি অঙ্গুরী রাখিয়া গেলেন। রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, বৃদ্ধ রাজা কুপরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া যে অনর্থ করিয়া বসিয়াছেন, তাহা অবগত হইলেন। পরে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত অঙ্গুরী এবং 'গন্ধর্ব্বধূপে'র প্রভাবে একটি নিশাচরীকে বধ করিয়া, একটি অতিকায় সর্পের অধিকৃত অগ্নি-নদ উত্তীর্ণ হইয়া, রাকপক্ষীর পৃষ্ঠারোহণে রজতগিরিরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পরে কথাসরিৎসাগরের একটি আখ্যায়িকাভাগ অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে যে রজতগিরিনন্দিনীর একজন পরিচারিকা কলস লইয়া একটি পুষ্করিণীতে জল লইতে আসিলে রাজকুমার তাহার পরিচয় অবগত হইয়া কৌশলে তাহার কলসের মধ্যে অঙ্গুরীটি ফেলিয়া দেন। রাজকুমারী অঙ্গুরীটি চিনিলেন এবং তাঁহার স্বামীও রাজসমীপে আনীত হইল। পরে শত্রুধ্বংসে

গুণপ্রদান এবং সাতটি রাজকন্যার সঙ্গে যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত পরীরাজকন্যার একটি অঙ্গুলি পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এইরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পুনরায় রাজনন্দিনীকে লাভ করিলেন। এই মিলনান্ত গল্পের শেষে একটিমাত্র বিসদৃশ শোকাবহ চিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে—সেটি অনাগতবাদীকে বিচারমণ্ডপে আনয়নের সময় উত্তেজিত জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাহার বিনাশসাধন।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, উপকথা হইতে গৃহীত ইহার আখ্যানবস্তু কল্পনাবহুল হইলেও নাটকের বিশেষ উপযোগী নহে। বরং আখ্যায়িকা বা কাব্যেরই উপাদান হইতে পারে। সেই জন্য এই নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া, তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। সেই জন্য তাঁহার চরিত্রাঙ্কনে বা আখ্যানবস্তু-গ্রথনে নিপুণতা দেখা যায় না। যুবরাজের চরিত্রটি উপকথার রাজপুত্রের ন্যায় সম্পূর্ণ মামুলি রকমের। তাহাতে কোনও ব্যক্তিত্বের বিকাশ নাই, বরং প্রকৃত পৌরুষের অভাবই দেখা যায়। রাজাকেও এত অশক্ত ও বিকলমতি করা হইয়াছে যে, অনেক সময়ে তাঁহার সিংহাসনে বসিবার যোগ্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। বিনা কারণে নিরপরাধা পুত্রবধূকে যে কেন তিনি বাজে লোকের কথায় নির্ব্বাসিত করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। স্ত্রীচরিত্রগুলিও বৈচিত্র্যবর্জ্জিত। তিন ভগ্নী ক্ষণপ্রভা, লীলা ও প্রমীলার চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। রজতগিরিরাজের অন্তঃপুরের প্রধান পরিচারিকা দমনিকার চরিত্রটি হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা হইয়াছে; তাহাতে নাট্যকারের চেষ্টাটাই হাস্যাস্পদ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ সুধন্বা ব্যাধ ও তাহার স্ত্রী কাঞ্চনী, অথবা অনাগতবাদী ও বামাবৈষ্ণবীর প্রসঙ্গেও হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। হরচন্দ্রের হাস্যরসসৃষ্টির শক্তি বিশেষ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আখ্যায়িকাটিতে যেরূপ কল্পনা ও কবিত্বশক্তির প্রয়োজন, হরচন্দ্রের তাহাও ছিল না। ভাষার মধ্যেও প্রাঞ্জলতা ও স্বচ্ছন্দভাবের একান্ত অভাব দেখা যায়। প্রমীলার যাত্রার ধরনে হাহুতাশ হইতে একটু নমুনা দেওয়া গেল :

"প্রমীলা। বসন্তে ফুলধনু বিষম জ্বালা দেয়। তায় অবলার ক্ষীণ তনু ডরে সর্ব্বদাই সিউরে উঠে। আর শীতল জীবনে কখনই তাদের প্রাণ শীতল

হয় না। জলে যেন কেবল অনল জলে, ছুঁলেই অবলা বিকল হয়। এই যে ফাগুন মাস, এতে কেবল আগুন জলছে। অনিলে অনলে কিছু ভেদ নাই। আর দাবানল দেখে হরিণী যেমন চঞ্চলা হয়, বসন্তের মলয়ানলও বিরহিণীর পক্ষে তেমনি জানবে। নিশাকরের শীতল জল যেন হুতাশন লাগে। আর বসনভূষণে কেবল বিষধর দংশন করচে। লোকে বলে চন্দনে অঙ্গ শীতল হয়, কিন্তু সে কেবল কুলালের পণের ন্যায় উপরে শীতল, কিন্তু অন্তরে অনল জলচে।" (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, পৃষ্ঠা ১৩)।

দুইটি গানেরও নমুনা দেওয়া গেল। পূর্ব্বেকার নাটকে গান নাই; বোধ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে। প্রথমটি মালঝাঁপ ছন্দে (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)—

"চলিল সুধন্বা ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ লইয়া।
লম্ফে ঝম্পে মহী কম্পে শিবনাম কহিয়া॥
কুরুসৈন্য মাঝে যেন বৃহন্নলা হইয়া।
দ্বীপি-চর্ম্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে তূণ লইয়া॥
হুলস্থূল পশুকুল সর্ব্ব বন ব্যাপিয়া।
বেগে ধায় নাহি চায় যায় বন ত্যজিয়া॥"

দ্বিতীয়টি রাগিণী বাগেশ্বরী, আড়া তালে গেয়।

"এত দিনে কিরাতিনী মনোরমা হইল।
কন্দর্পের ফাঁস লয়ে বনমাঝে রহিল॥
বসন্তে প্রফুল্ল ফুল লোভে ধায় অলিকুল
গন্ধে আমোদিত বন মুনিমন টলিল॥"

৫। রাজতপস্বিনী কাব্য

হরচন্দ্রের রাজতপস্বিনী কাব্য আমাদের আলোচনার বহির্ভূত হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "কলিকাতা রিভিউ"এ কোনও সমালোচক হরচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহার নাটকগুলি যেমন তেমন হইলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনা না করিলেই ভাল হইত। অবশ্য এই কাব্যখানি মাইকেলের অনুকরণে লিখিত এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, কিন্তু গ্রন্থকার অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি মোটেই ধরিতে পারে নাই এবং কবিত্বশক্তিও যথেষ্ট ছিল না বলিয়া কাব্যখানিও চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

রাজতপস্বিনীর পরিচয়পত্র এইরূপ :—

রাজতপস্বিনী / (কাব্য)। / প্রথম খণ্ড।* / শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত। / "হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে / তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ॥" † / শকুন্তলা।/ কলিকাতা ; / জি, পি, রায়, এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত / ২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট। / সন ১২৮৩ সাল। / মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। /

মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বের অম্বার উপাখ্যান ও তন্নিমিত্ত ভীষ্ম ও পরশুরামের যুদ্ধের বিবরণ পল্লবিত করিয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। গল্পটি সুপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং পুনরুক্তি অনাবশ্যক। কিন্তু গ্রন্থকার যে ভাবে সাজাইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

স্বয়ংবর-সভায় ভীষ্মের আগমনে কাশীরাজকন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা ভগিনীত্রয় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন ; কারণ, ভীষ্মের উদ্দেশ্য এই যে মাতা সত্যবতীর আদেশে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের জন্য তিনি তিন ভগিনীকে অপহরণ করিবেন (১ম সর্গ)। স্বয়ংবরযুদ্ধে বিজয়ী ভীষ্ম তাঁহাদিগকে রথে স্থাপনপূর্ব্বক হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; অম্বা 'অন্যপূর্ব্বা' এবং শাল্বের নিকট বাগ্‌দত্তা, ভীষ্মকে ইহা জানাইয়া হস্তিনাপুর গমনে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলে ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি মাতার আদেশ ব্যতিরেকে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অক্ষম (২য় সঃ)। ভগিনীত্রয় সমভিব্যাহারে ভীষ্মের হস্তিনাপুর আগমন, সত্যবতীর সহিত সাক্ষাৎ এবং অম্বাকে শাল্বের নিকট প্রেরণ (৩য় সঃ)। শাল্বকৃত অম্বাপ্রত্যাখান এবং ভীষ্ম ও শাল্বের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের জন্য শোকাকুলা অম্বার তপস্যার নিমিত্ত বনগমন (৪র্থ সঃ)। বনে কোনও মুনির আশ্রমে স্বীয় মাতামহ হোত্রবাহনের সহিত সাক্ষাৎ ; ইত্যবসরে তথায় পরশুরাম শিষ্য অকৃতব্রণের আগমন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত পরশুরামকে অবগত করার সঙ্কল্প (৫ম সঃ)। পরে পরশুরামের তথায় আগমন এবং অম্বাকে সান্ত্বনাপ্রদান ; ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে পরশুরামের ইচ্ছা, বিচিত্রবীর্য্য কর্ত্তৃক অম্বাকে পরিগ্রহ করিবার জন্য ভীষ্মকে অনুরোধ করা (৬ষ্ঠ সঃ)। ভীষ্মের অসম্মতি, গঙ্গার উপদেশ সত্ত্বেও উভয়ের

---

* উপরোক্ত প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারে নাই। প্রথম খণ্ড আমি বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের নিকট পাইয়াছি।

† শকুন্তলায় কিন্তু এই শ্লোকটি নাই।

যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্র যাত্রা (৭ম সঃ)। প্রথম যুদ্ধে পরশুরামের জয়লাভ না হওয়াতে অম্বা কর্ত্তৃক শিবের সাহায্য প্রার্থনা এবং শিব কর্ত্তৃক নন্দীকে প্রেরণ এবং তজ্জন্য ভীষ্মের সাময়িক পরাজয় (৮ম সঃ)। অষ্ট বসুগণ ভীষ্মকে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া কৈলাসে শিবের ক্রোধ। হরগৌরীর পরামর্শ। শাম্বকে অম্বাপ্রত্যাখ্যান-রূপ পাপের জন্য নরকদর্শন করাইতে শিব নন্দীকে আদেশ করিলেন এবং তজ্জন্য নন্দীর নিদ্রিত শাম্বকে প্রাসাদ হইতে অপহরণ। ভীষ্ম ও পরশুরামের তৃতীয় যুদ্ধ (৯ম সঃ)। শাম্বের নরকদর্শন (১০ম সঃ)। চতুর্থ যুদ্ধ; অষ্ট বসু ও গঙ্গা কর্ত্তৃক ভীষ্মের সাহায্য (১১শ সঃ)। নরক হইতে শাম্বকে লইয়া নন্দীর প্রত্যাবর্ত্তন এবং পথে অম্বাপ্রত্যাখ্যান-রূপ পাপের জন্য শাম্বকে সদুপদেশ (১২শ সঃ)। ভীষ্ম ও পরশুরামের যুদ্ধ চলিতেছে; গঙ্গা ও নারদ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়া উভয়কে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অম্বা ভগ্নমনোরথ হইয়া শিবানুগ্রহ লাভের জন্য তপস্যার সঙ্কল্প করিয়া বনে গমন করিলেন (১৩শ সঃ)। অম্বার তপস্যা; শিবের বরদান; যমুনাতীরে অগ্নিকুণ্ডে অম্বার দেহত্যাগ (১৪শ সঃ)।

আখ্যানবস্তু-গ্রথনে ও বর্ণনায় হরচন্দ্রের ক্ষমতা থাকিলেও কবিত্বশক্তির অভাবে কাব্যখানি সুপাঠ্য হয় নাই; পুরাতন কাহিনীকে নূতন করিয়া বলিবার অথবা তাহাকে সরস করিবার শক্তি তিনি দেখাইতে পারেন নাই। আখ্যায়িকা-বিন্যাসেও যথেষ্ট দোষ দেখা যায়। প্রথম কয়েক সর্গে তিনি অম্বার অপহরণ ও প্রত্যাখ্যানের বৃত্তান্তের বহুবার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। নরকদর্শন সর্গটি অবশ্য মাইকেলের অনুকরণে লিখিত, কিন্তু বিশেষত্ববর্জ্জিত। দেবতাদিগের চরিত্রও গাম্ভীর্য্যশূন্য এবং হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। যথা—গৌরী পরশুরামের সাহায্য করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে শিব তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন,—"এ নহে তোমার দেবি! অধিকার-চর্চ্চা" (৯ম সঃ, পৃঃ ৯৬)।

অমিত্রাক্ষরছন্দের প্রকৃতি তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার অমিত্রাক্ষর রচনা অধিকাংশ স্থলে মিলবর্জ্জিত পয়ার ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইতেছে:—

স্বয়ম্বর-যুদ্ধের বর্ণনা

তবে ভীষ্ম চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করি,
লইলা কার্ম্মুক তুলি হাতে বিভীষণ।

প্রোজ্জ্বল অঙ্গের আভা যেন শক্রধনু,
টঙ্কারিতে রাজগণ সশঙ্ক হইলা।
ত্যজিলা বিষম-বাণ প্রসবে অনল
শ্রাবণের ধারে যথা বৃষ্টি হুতাশন।
ব্যোমদেশ ভয়ঙ্কর ব্যাপিল অনল
রথ রথী পুড়ি কত হইল ছারখার।
আয়াসে নির্ব্বাণ করি অনল বিপুল,
ত্যাজিলা বরুণবাণ ক্রোধে রাজগণ।
ভাসিল ভীষ্মের রথ উচ্চ মহাকায়
অর্ণবপোতের ন্যায় করে টলমল্
মহাবাতে যেন নীল সাগর উপরে,
দুস্তর তরঙ্গ বাড়ে ধরণী [র] মাঝে।
দেখিয়া হইল ক্রুদ্ধ ভীষ্ম শরায়ুধ
সুশিক্ষিত গাঙ্গেয় দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ,
মুহূর্ত্তে শোষক শরে সাগর শুষিয়া
সন্ধানিলা তীক্ষ্ণ অস্ত্র সহস্র শতেক
খণ্ড খণ্ড কাটি মুণ্ড গড়ায় ভূতলে।
রথধ্বজা কাটে হয় হস্তী অগণন
সারথি পড়িল কত বিমান অচল। (২য় সর্গ, ১৪-১৫ পৃঃ)

কলিকাতা রিভিউয়ের সমালোচক হরচন্দ্রকে কাব্যরচনা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহা গ্রহণ করিলেই ভাল হইত।

নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ

বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগেছিয়া উদ্যান-বাটীতে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা যেরূপ সুপরিচিত, তৎকালীন অন্যান্য রঙ্গমঞ্চ সেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ইংরেজী ৩১শে জুলাই, শনিবার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের দ্বারা বেলগেছিয়া নাট্যশালার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং ২৯শে মার্চ্চ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই রঙ্গমঞ্চ অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকোস্থ বাটীতে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনে একটি রঙ্গমঞ্চ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এইস্থলে ১১ই এপ্রিল ১৮৫৭ সালে রামায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' প্রথম অভিনীত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং এই নাট্যমঞ্চের জন্য তিনখানি অধুনা-বিস্মৃত নাটক রচনা করেন। বেলগেছিয়া নাট্যশালার মত এই রঙ্গমঞ্চও এককালে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং বাংলা নাট্যাভিনয়ে নবযুগ-প্রবর্ত্তনে ইহার প্রভাব কোন অংশে ন্যূন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ইহারই দৃষ্টান্তে এক বৎসর পরে বেলগেছিয়া নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল। যদিও এই দুইটি অনুষ্ঠানের কোনটিও স্থায়ী বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয় নাই, তথাপি যাঁহারা প্রথম বাংলা নাটক রচনা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচনাগুলি এই সকল রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। যোগীন্দ্রনাথ বসু তৎরচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে বেলগেছিয়া নাট্যশালার বিবরণ দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে (১৩৩৮ সাল) বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ও সেই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত কালীপ্রসন্ন সিংহের নাটকগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের অনুকরণে নূতন ধরণের নাটক রচনা ও অভিনয়ের বাসনা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তখনও বাংলায় সাধারণ বা স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং নাট্যশালার সাহায্যে নাট্যসাহিত্য গঠিত হইবার সময়ও আসে নাই। পূর্ব্বোক্ত রঙ্গমঞ্চ দুইটি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে নাটকাভিনয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা

স্বল্পকালমাত্র-স্থায়ী আমোদে পর্য্যবসিত হওয়াতে বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজারের বাটীতে মহাসমারোহে ও বহুল অর্থব্যয়ে কোন অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই প্রথম বাংলা নাটকাভিনয়ের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার 'সন্দর্ভসংগ্রহে' (১৮৯৭, পৃঃ ৬-১০) তৎকালীন 'হিন্দু পাইওনীয়ার' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্র হইতে (২২শে অক্টোবর, ১৮৩৫) এই নাটকের দ্বিতীয় (?) অভিনয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলে এই অভিনয়ের কিরূপ আয়োজন হইয়াছিল তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন :

The private theatre got up about two years ago * is still supported by Babu Nobin Chunder Bose. It is situated in the residence of the propietor at Shambazar where four or five plays† are acted during the year. These are native performances by people entirely Hindus, after the English fashion, in the vernacular language of their country; and, what elates us with joy, as it should do all the friends of Indian improvement, is that the fair sex of Bengal is always seen on the stage, as the female parts are almost exclusively performed by Hindu women. We had the pleasure of attending at a play during the last full moon, and we must acknowledge that we were highly delighted. That house was crowded by upwards of a thousand visitors of all sorts......The play commenced a little before 12 o'clock and continued the next day till half past six in the morning ......The subject of performance was Bidya-Sunder......It commenced with the music of the orchestra which was very pleasing. The native musical instruments, such as the *sitar*, the *saranghi*, the *pakhowaj* and others, were played.......Before the curtain was drawn a prayer was sung to the Almighty...... The scenery was generally imperfect; the perspective

* মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি অনুমান করেন যে, এই তারিখে ভুল আছে; তাঁহার মতে 'বিদ্যাসুন্দরে'র প্রথম অভিনয় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে (১২৩৮ বঙ্গাব্দে) হইয়াছিল।

† অপর কি কি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না।

of the pictures, the clouds, the water were all failures...... The part of Sunder, the hero of the poem, was played by a young lad, Shamachurn Bannerji of Barranagore, who in spite of his praiseworthy efforts did not do entire justice to his performance......Young Shamachurn tried occasionally to vary the expression of his feelings, but his gestures seemed to be studied, and his motions stiff. The parts of the Raja and others were performed to the satisfaction of the whole audience. The female characters in particular were excellent. The part of Bidya...... played by Radhamoni (generally called Moni), a girl of nearly sixteen years of age, was ably sustained; her graceful motions, her sweet voice and her love-tricks with Sunder filled the minds of the audience with rapture and delight. She never failed as long as she was on the stage......The other female characters were equally well performed, and amongst the rest, we must not omit to mention that the part of Rani, the wife of Raja Bir Singha, and that of Malini......were acted by an elderly woman Joy Durga who did justice to both characters in the twofold capacity......and another woman Raj Cumari, usually called Raju, played the part of a maid-servant to Bidya, if not in a superior manner, yet as ably as Joy Durga.

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে যে, নবীনচন্দ্র বসুর স্বভবনস্থিত রঙ্গমঞ্চ প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল, কিন্তু এক বিদ্যাসুন্দর ছাড়া আর কোনও নাটকের অভিনয় বোধ হয় তেমন সফল হয় নাই। এই অভিনয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষের দ্বারা অভিনীত হয় নাই। কিন্তু যাত্রার প্রভাব বোধ হয় একেবারে যায় নাই, এবং আধুনিক রীতি ও রুচি অনুসারে বিচার করিলে ইহার যাহা ত্রুটি ছিল, তাহা নব্য শিক্ষিত সমাজের সম্পূর্ণ মনঃপূত হয় নাই।*

* হেরাসিম লেবেডেফের থিয়েটার (১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) ও তাঁহার ইংরেজী হইতে অনূদিত দুইখানি বাংলা নাটকের এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা দেশীয় লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ ছিল না। এতৎসম্বন্ধে মল্লিখিত বিবরণ Calcutta Review 1923 p. 84 এবং Indian Historical Quarterly, 1925-এ পাওয়া যাইবে।

এ সময়ে স্বরচিত বাংলা নাটকেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' * ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' † প্রকাশিত হইলেও এই দুইটির একটিও অভিনয়-উপযোগী নাটক হয় নাই। 'ভদ্রার্জ্জুন' কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই এবং হরচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব-বিয়োগ' (১৮৫৮)এর ভূমিকা হইতে বোধ হয় যে, 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই।

'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ের পর, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে'র অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নাটক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও প্রকাশিত। প্রথম ১৮৫৭ সালের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা নূতন বাজারে জয়রাম বসাকের বাটীতে ও পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় গদাধর শেঠের ভবনে ও চুঁচুড়ায় শ্রীনাথ পালের বাটীতে এই নাটক অভিনীত হয়; কিন্তু এই সকল অভিনয়ের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সেই বৎসর (১৮৫৭) ৩০শে জানুয়ারী আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর) সিমুলিয়া বাসভবনে নন্দকুমার রায় প্রণীত 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। কথিত আছে, আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎকুমার ঘোষ শকুন্তলার ভূমিকা, এবং প্রিয়মাধব মল্লিক ও আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে দুষ্মন্ত ও দুর্ব্বাসার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে এই নাটকের যে মুদ্রিত সংস্করণ রহিয়াছে, তাহার তারিখ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থ হিসাবে ইহার রচনা ছিল অত্যন্ত অপরিপুষ্ট। হিন্দু পেট্রিয়ট (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭) ও সংবাদ প্রভাকরে (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭) ইহার অভিনয়ের প্রশংসা দেখা যায়, কিন্তু কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন: "it was a failure".‡ শকুন্তলা-অভিনয়ের মাস ছয় পরে ছাতু বাবুর বাড়ীতে 'মহাশ্বেতা' নামক আর একটি নাটক অভিনীত হয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে সেই বৎসরই (১৮৫৭) এপ্রিল মাসের ১১ই তারিখে রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' ও নভেম্বর মাসে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশী' অভিনয়ের সহিত নিয়মিত নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার সূত্রপাত হইল।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪ পৃঃ ৪২।

† বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩ পৃঃ ১৪১।

‡ Calcutta Review, 1873, p. 252.

কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম (১৮৪০-১৮৭০) বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার অকাল মৃত্যু হয়; কিন্তু একদিকে মহাভারতের অনুবাদ ও অন্য দিকে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।* বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার কার্য্যে সাহায্য, মাইকেলের সংবর্দ্ধনা, হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরিচালনা, 'নীলদর্পণে'র অনুবাদের জন্য আদালতে লং সাহেবের অর্থদণ্ড দাখিল করা প্রভৃতি সেই সময়ের অনেক সৎকার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। নিজ যত্ন ও উৎসাহে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গমঞ্চের জন্যও তিনি তিনখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। এই রঙ্গমঞ্চ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ই এপ্রিল, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' নাটকের প্রথম অভিনয়ের সহিত কালীপ্রসন্নের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উন্মোচিত হয়। কালীপ্রসন্নের স্বলিখিত যে তিনখানি নাটক এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তাহাদের নাম যথাক্রমে (১) বিক্রমোর্ব্বশী —১৮৫৭, (২) সাবিত্রী-সত্যবান—১৮৫৮ এবং (৩) মালতী-মাধব—১৮৫৯। ইহার মধ্যে প্রথম ও শেষ গ্রন্থ স্বনামপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, কিন্তু দ্বিতীয়খানি তাঁহার নিজস্ব রচনা। ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৩ সালে (?) তিনি 'বাবু' নামক নাটক প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহাই বোধ হয় তাঁহার প্রথম রচনা।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটক বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা বর্দ্ধমানের মহারাজা মহতাপচাঁদকে উৎসর্গ করা হইয়াছে; এই ইংরেজী উৎসর্গ পত্রের তারিখ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭।† নাটকের নাম ও বর্ণনা ইহার ইংরেজী ও ও বাংলা টাইটেল পেজ বা আখ্যা-পত্রে এইরূপ দেওয়া আছে:

* কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বল্পায়ু জীবনের বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ ইংরেজীতে ও বাংলায় বিবৃত করিয়াছেন। কালীপ্রসন্নের অধুনা দুষ্প্রাপ্য নাটকগুলি আমরা তাঁহার নিকটই পাইয়াছি।

† এই উৎসর্গ পত্রটি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩২২) গ্রন্থে (পৃঃ ২০) সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' (৪র্থ পর্ব্ব, ৪২ সংখ্যা) হইতে জানা যায় যে, কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশী'র কিয়দংশ প্রথম 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; পরে উক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য সমুদয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা হইয়াছিল।

Vikramorvasi of Kalidasa. Translated into Bengali by Kali Prosonno Sing. Calcutta: Printed by Anund Chunder Vedantuvagees at the Tuttobodhinee Press for Vidyot Sahinee Shova. 1857.

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক। মহাকবি কালীদাস (!) বিরচিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ। তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা মুদ্রিত। ১৭৭৯ শক।

নাটকখানি পঞ্চাঙ্কে সমাপ্ত এবং ইহার পত্র সংখ্যা ৵৹+৴৹+৮৫। ১৮৫৭ সালের ২৪শে নভেম্বর ইহার প্রথম অভিনয় হয়। ইহার নাতিদীর্ঘ 'বিজ্ঞাপনে' অনুবাদক বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গমঞ্চের উল্লেখ করিয়া স্বীয় নাটক-রচনার উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন:

"বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পূর্ব্বকালে মহাকবি কালিদাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ হইত, পরে প্রায় দুই তিন শত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি প্রায় এককালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান্ ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে সেক্‌স্‌পিয়ার ও অন্যান্য ইংরাজী নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণ সংস্কৃত ও বাংলা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা করেন। উইল্‌সন্ সাহেব লেখেন প্রায় অশীতি বর্ষ হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে, চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তি হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিবার কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।

"এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসিগণ পুনরায় বাংলা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গ-ভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গালা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতা বিবেচনা করিবেন। ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়মক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

"পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের অনুরোধ বশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ কারণেই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরূপ যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।"

বিক্রমোর্ব্বশীর অভিনয় তৎকালে যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে পুরূরবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন*, এবং দর্শকবৃন্দের মধ্যে কলিকাতার প্রায় সকল গণ্য ও মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইহার অভিনয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন:

There was a large gathering of native and European gentlemen who were unanimous in praising the performance. Among the latter, Mr., afterwards Sir, Cecil Beadon, the Secretary to the Government of India, expressed to us his unfeigned pleasure at the admirable way in which the principal characters sustained their parts.

কিন্তু অভিনয় সমাদৃত হইলেও রচনা হিসাবে কালীপ্রসন্নের এই অনূদিত নাটকের প্রশংসা করিতে পারা যায় না। মনে রাখিতে হইবে, এই সময় অনুবাদকের বয়স মাত্র সতেরো বৎসর, এবং এই নাটক তাঁহার অন্যতম প্রথম সাহিত্যিক রচনা। গ্রন্থকার মূলের অবিকল অনুবাদ করিতে গিয়া নাটকের ভাষা ও ভঙ্গীকে সরস করিতে পারেন নাই এবং পয়ারাদি ছন্দে মূলের বিচিত্র ও দীর্ঘচ্ছন্দী শ্লোকগুলির মর্য্যাদা রক্ষা হয় নাই। বিবিধার্থ-সংগ্রহের সমালোচক 'বিক্রমোর্ব্বশী' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "ইহাতে নস্যের গন্ধ মাত্র বোধ হয় না"; কিন্তু পণ্ডিতী ভাষা না হইলেও, ইহার ভাষা সংস্কৃতগন্ধী ও কৃত্রিম। চতুর্থ অঙ্কে পুরূরবার উন্মাদ-দৃশ্যের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার রচনার নমুনা পাওয়া যাইবে:

"রাজা (ঊর্দ্ধে—দৃষ্টিপাত করিয়া) কে আমায় অনুশাসন করেন, (দেখিয়া) এ কি পিতামহ শশলাঞ্ছন, ভগবান তারাপতি, এই অনুশাসনে আমাকে নিতান্ত অনুগ্রহ করিলেন। (মণি লইয়া) অহে সঙ্গমমণে!

* তাঁহার অভিনয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়টে প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

যদি আমি তব বলে প্রিয়তমা পাই।
শিরোধার্য্য হবে তুমি বলিলাম তাই॥
অতএব কর যত্ন শীঘ্র সঙ্গমনে।
কৃতার্থ হইব আমি তবে এ ভুবনে॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) কেন হে এই লতা কুসুমবিহীনা হইলেও ইহার দর্শনে আমার অনুরাগ জন্মিতেছে। তথা হি।

তনুতরা মেঘজলে আর্দ্রকিশলয়া।
ধৌতাধরা যেন অশ্রুবেগে অল্পরয়া॥
স্বকালবিগমে তথা পুষ্পোদ্‌গমহীনা।
আভরণশূন্যা যথা মানিনী অঙ্গনা॥
মধুকর শব্দ বিনা রহিয়াছে স্থিরা।
চিন্তামৌন ধরিয়াছে যেন নারী ধীরা॥
বোধ হয় প্রিয়তমা ত্যজি পদানত।
দাসজন লতাভাবে আছে প্রকুপিত॥

যা হউক এই প্রিয়ানুকারিণী লতাকে একবার আলিঙ্গন করি। (নিকটে গিয়া লতালিঙ্গন) (অনন্তর সেই স্থান হইতে উর্ব্বশীর প্রবেশ) (নিমীলিত নয়নে স্পর্শ নাটন করিয়া) অয়ে! উর্ব্বশীগাত্রস্পর্শবশতই যেন আমার অন্তরিন্দ্রিয় পুলকিত হইতেছে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না, যেহেতু প্রথমতঃ

এই প্রিয়া এই প্রিয়া হইতেছে বোধ।
ক্ষণমাত্রে পরিবর্ত্তে হয় জ্ঞানরোধ॥
অতএব বিলোচন বিনিদ্র করণ।
অতি ভয়ঙ্কর হয় যেন হে মরণ॥

(চক্ষু উন্মীলন করিয়া সহর্ষে) এই সত্যই উর্ব্বশী যে। (মোহপ্রাপ্তি) (কিঞ্চিৎ পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া) প্রিয়ে অদ্য জীবন পাইলাম,

ত্বদীয় বিরহসিন্ধু পরপারে গত।
অদ্য সংজ্ঞা পাইলাম প্রাণ যথামৃত॥

উর্ব্বশী। মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি কোপবশা হইয়া আপনাকে নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছি।

রাজা। প্রিয়ে! আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে না, তোমার দর্শনেই আমার অন্তরাত্মা সুতরাং প্রসন্ন হইয়াছে। এক্ষণে বল, কি প্রকারে

বিরহিতা হইয়াছিলে, তোমার অন্বেষণার্থে আমি ময়ূর পরভৃৎ হংস রথাঙ্গ গজ পর্ব্বত সরিৎ কুরঙ্গ প্রভৃতি সকলকেই রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" (পৃঃ ৬৬-৬৮)।

কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বিতীয় অনূদিত নাটক 'মালতী-মাধবের' প্রথমেই ইংরেজী আখ্যা-পত্র বা টাইটেল পেজ এইরূপঃ

Malatee Mudhaba. A Comedy of Bhubabhootee. Translated into Bengalee from the original Sanscrit by Kali Prusno Sing, M. R. A. S. Calcutta: Printed for the Beedut Shaheenee Shova, by G. P. Roy & Co, No. 67 Emaumbrry Lane, Cossitollah. 1859.

এই পৃষ্ঠার উল্টা দিকে উৎসর্গ পত্র: **This translation is most respectfully Dedicated to all Lovers of the Hindu Theater, by the Translater** (*sic*).

পর পৃষ্ঠায় বাংলা টাইটেল পেজ এইরূপ:

মালতী মাধব নাটক। মহাকবি ভবভূতি বিরচিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা। জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৮০। বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং।

নাটকটি চার কাণ্ডে ও বারটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই কাণ্ড ও অঙ্ক বিভাগ ইংরেজী নাটকের Act ও Scene অনুযায়ী। পত্র সংখ্যা ।৵+৯১।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে মূলের অবিকল অনুবাদ করিতে গিয়া ভাষার যে কৃত্রিমতা ও লালিত্যহানি হইয়াছে, কালীপ্রসন্ন তাঁহার দ্বিতীয় অনুবাদে এই দোষ পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার মালতী-মাধবের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন:

"বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল লালিত্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা নিরর্থক, কারণ অবিকল অনুবাদিত গ্রন্থ সহজেই পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রত্যেক পদের বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানুকরণে যথার্থ ভাব সংরক্ষণ করা কাহারও সাধ্য নহে। ইহার প্রথম উদ্যম স্বরূপে মহাকবি কালিদাস, প্রণীত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকেই সম্পূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত এবার তাহা হইতে সতন্ত্রিত (!) হইতে হইয়াছে।......মদ্রচিত, মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য অন্য নাটক হইতে মালতীমাধবের ভাষারও প্রভেদ

হইয়াছে, কারণ অভিনয়ার্হ নাটক সকল ইদানিন্তন (!) যে ভাষায় লিখিত হইতেছে আমিও সেইরূপ অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ করণ মানসে সচেষ্ট ছিলাম।"

মালতী-মাধবের ভাষা ও রচনা অনেক পরিমাণে প্রাঞ্জল হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। মূলের শ্লোকগুলি ছন্দে অনুবাদ না করিয়া তাহার ভাবার্থ গদ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রণালী রামনারায়ণ তর্করত্নও অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, সংস্কৃত নাটকের শ্লোকগুলি ও তাহার ধ্বনিবৈচিত্র্যই তাহার নাট্য-সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ। মালতীকে দেখিয়া মাধবের পূর্ব্বরাগ ও বিরহাবস্থা তাহার সখা মকরন্দের নিকট এইরূপ বিবৃত করা হইয়াছে:

(তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ১৩)

"মকরন্দ। বয়স্য! এ তুমি কেমন বল্লে, একবার দর্শন কল্লেই এতাদৃশ প্রণয় হয়। না না তোমাদিগের আন্তরিক কোন কথা আছে, প্রকাশ কচ্চো না, পদ্মফুল কি চন্দ্রকিরণে বিকশিত হয়।

মাধব। বয়স্য! আমি তোমার নিকট কিছুই গোপন করি নাই, তবে শোনো সবিশেষ বর্ণনা করি, যখন সুন্দরী সখীগণে বেষ্টিত হইয়া আমাকে দর্শন কল্লেন, তখন পরস্পরের মুখাবলোকন করে, সকলে হাস্য কত্তে লাগ্‌লেন। সখে! এই সকল দর্শন করে আমার অনুভব হলো যে আমি ঐ কামিনীগণের নিকট পরিচিত আছি।

মকরন্দ। (স্বগত) সখার হৃদয়াকাশে প্রেমেন্দু উদয় হয়েছে।

কলহংস। (স্বগত) কোন রমণীর বিষয় লয়ে কথোপকথন হচ্ছে।

মকরন্দ। সখে! এক্ষণে চল আবাসে গমন করি।

মাধব। না প্রিয়তম! আমি এক্ষণে কোন ক্রমেই উদ্যান পরিত্যাগ কত্তে পারব না, চন্দ্রবদনীর রূপ লাবণ্য দর্শনে আমি জ্ঞানশূন্যচিত্ত হয়েছি, কি প্রকারে তা বলো গমন করি। কোন ক্রমেই যে মন প্রবোধ মান্‌বে না, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ ভাবিনীর ভাবদর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হলো, তাঁহার অন্তরে কামদেবের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আমি কিছুমাত্র শঙ্কেত (!) করি নাই, কেবল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চেয়েছিলাম, মধ্যে মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়ে হৃৎকম্প হয়েছিল,

আমি এই অবস্থায় অবস্থান কচ্চি, এমত সময়ে কতকগুলি অস্ত্রধারি দ্বারপাল এবং এক বৃদ্ধা, কামিনীগণকে হস্তির উপর বসাইয়া নগরাভিমুখে গমন করিল। আহা প্রিয়তম! চন্দ্রবদনী গমনকালে পুনঃ পুনঃ মদনোদ্যানের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ কত্তে লাগ্‌লেন, দূর হতে বোধ হলো, যেন প্রস্ফুটিত পদ্মফুল সমীরণে সঞ্চালিত হচ্চে, সখে! মৃগনয়নার অদর্শনে আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছি তা বর্ণনা করা যায় না, কারণ সংসারে তাহার দৃষ্টান্ত বিরহ (বিরল ?), কখন বা কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে অন্তর্দাহ কত্তে লাগলো, মধ্যে মধ্যে অচৈতন্যও হয়েছিলাম, যখন চৈতন্য প্রাপ্ত হই তখন কি প্রকার চিত্ত সুস্থির কর্ব্বো কিছুই স্থির কত্তে পারি নাই।"

এই স্থলে তুলনার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতী-মাধব' হইতে অনুরূপ অংশ উদ্ধৃত হইল; কিন্তু রামনারায়ণের অনুবাদ নয় বৎসর পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।—

"মকরন্দ। সখা তুমি দেখ্‌চি দর্শন করেই তাঁর আশাপথের পথিক হয়েছ, কিন্তু তাঁর মনের ভাব কিছু জাস্তে পেরেছ? তোমার প্রতি তাঁর ভাব-ভঙ্গি কিছু হয়েছিল?……

মাধব। সখা, সে কথাও তোমাকে আনুপূর্ব্বিক বলি শোন। ওদিগে লোকের অত্যন্ত জনতা, ভারি কোলাহল, আমি এই স্থানটিতে বসে উৎসব দেখচি, আর এই বকুল গাছ থেকে ফুল পড়চে, তাই নিয়ে যদৃচ্ছাক্রমে একছড়া মালা গাঁথচি, এমন সময় উৎসব সমাজের মধ্যে হতে সেই নবীনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কএকজন সখী সঙ্গে (অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ) এই দিগের পুষ্প চয়ন কত্তে এসে এই বৃক্ষতলে দাঁড়ালো; দাঁড়ালে একটি সখী অমনি বলে উঠলো 'সেই তিনি লো তিনি' এই কথা শুনে তারা সকলেই আমার প্রতি চেয়ে দেখলে।

মকরন্দ। তবে বোধ হয় পূর্ব্বে তারা তোমাকে কোথাও দেখে থাকবে, এ নূতন দেখা নয়।

মাধব। হঁ্যা ভাই, সেইরূপ বোধ হলো, কিন্তু আমি ভাই তাদের কখন দেখি নাই।

মকরন্দ। তা হবে, তারপর।

মাধব। তারপর আর একটি সখী আমা প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সেই নবীনাকে বল্যে "কেমন প্রিয়সখী, বলি চিস্তে পার" এই কথা বলে

সে হাসতে লাগলো, তাতে সেই নবীনা যেন লজ্জা পেয়ে তেমনি অধোবদন হলেন। অধোবদন হলেন সত্য, কিন্তু তাও বলি, আমার প্রতি তার দৃষ্টির বিরতি হলো না, কখন সেই মোহন নয়নযুগল বিকশিত ইন্দীবরের ন্যায় প্রকটিত মাধুর্য্য-লাবণ্য প্রকাশ কত্তে লাগলো, কখন ভ্রূরূপ লতাকুঞ্জ মুকুলিত কুসুমের ন্যায় বক্রভাবে মুগ্ধ কত্তে লাগলো। আর কখন বা আমার নয়নগোচর হলে, তড়িতের ন্যায় চমকিত হয়ে নেত্রাচ্ছদের আশ্রয় অবলম্বন কত্ত্যে লাগলো। সখা সে মনোহর ভাবটি এখনো আমার অন্তঃকরণে জাগরিত রয়েছে, সে স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মধুর মূর্ত্তি আমি কখনই বিস্মৃত হতে পারবো না। সে যা হোক্, আমাকে দেখেই তাঁদের পুষ্প চয়ন গেলো, অন্য আলাপ গেলো, নূপুর ধ্বনি বিরত হলো, সকলে অমনি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে কানাকানি কত্ত্যে লাগলো, তাই ভাই আমার যেন কিছু লজ্জা হলো, আমি যেন কত অন্যমনে আছি, মালা গাঁথা যেন আমার বড়ই প্রয়োজন, না হলেই যেন নয়, আমি এমনি ভাবটি প্রকাশ করবার চেষ্টা কত্ত্যে লাগলাম, কিন্তু তা কল্যে কি হবে? মন কি আমার আছে যে আমি তাকে বশীভূত করে রাখবো? আর মনই যখন পরবশ হলো তখন নয়ন আর আমার অনুগত থাকবে কেন? নয়নও মনের সঙ্গে সেই সুরূপার রূপামৃত-সাগরে সন্তরণ দিতে লাগলো, ফলতঃ ইন্দ্রিয়গণকে আর আমি আয়ত্ত কত্ত্যে পারলেম না, অমনি হতচৈতন্য হয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় রৈলেম।……

মকরন্দ। কন্যাটি কতক্ষণ সেখানে ছিল?

মাধব। তা বড় অধিক ক্ষণ নয়। কিঞ্চিৎ পরে পরিজনের অনুরোধে একটি সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করে সেই গজেন্দ্রগামিনী কিঙ্করী সহচরীগণ লয়ে গমন করলেন। গমনকালে সেই সুলোচনা, যেমন মৃণালের উপর প্রফুল্লপদ্ম পবনহিল্লোলে এক একবার বিবর্ত্তিতভাবে দোলায়মান হয় সেইরূপ, আমার প্রতি মুখকমল ফিরিয়ে সুধাধিক স্নিগ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে করতে জনতা মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন আর আমি দেখতে পেলেম না। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) (পৃঃ ১৭-২০)।"

কালীপ্রসন্নের অনুবাদ আক্ষরিক না হইলেও আনুপূর্ব্বিক।† অনুবাদে

† এই স্থলে অনুবাদের দুইটি ভুল উল্লেখযোগ্য। প্রথম অঙ্কে (পৃঃ ৮) বলা হইয়াছে যে, মাধবের চিত্রপট মন্দারিকার অঙ্কিত কিন্তু পরে তৃতীয় অঙ্কে (পৃঃ ১৭) মালতী স্বয়ং এই চিত্র

রামনারায়ণ তর্করত্ন আরও অধিক পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন এবং মূলের ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন ও নূতন বাক্যের বিস্তার করিয়াছেন; কিন্তু যথাসম্ভব মূলের অবিকল অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি ভাষা তখনও সজীব ও স্বাভাবিক হয় নাই। ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলেও, যাত্রার ধরণটি তখনও একেবারে দূর হয় নাই। যথা, ভাবগদ্‌গদ মালতীর সহিত লবঙ্গিকার কথোপকথন (চতুর্থ অঙ্ক পৃঃ ২২-২৩):

"মালতী। হাঁ তারপর?

লবঙ্গিকা। তারপর এই মালাটি চাইলে তিনি অম্‌নি গলা থেকে খুলে আমাকে দিলেন।

মালতী। (পুষ্পমালা নিরীক্ষণ করিয়া) সখি! এ মালা ছড়াটির অন্যদিকের মত এ দিকটি ভাল করে গাঁথা হয়নি।

লবঙ্গিকা। প্রিয়সখি! এ বিষয়ে তোমারই সম্পূর্ণ দোষ।

মালতী। কেন সখি আমি কিসে অপরাধি হলেম।

লবঙ্গিকা। সখি! তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও অপাঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি এমন মোহিত হয়েছিলেন যে মালার শেষভাগটি ভাল করে গাঁত্তেও পাল্লেন না।

মালতী। প্রিয়সখি! তুমি এরূপ প্রিয়বাক্যে কেবল আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্চো।

লবঙ্গিকা। না সখি! আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা কচ্চি নে।

মালতী। (লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি! সেই চিত্তচোরের ইহা স্বাভাবিক বিলাষ (!) তাই আমাকে দেখে অমন করে রৈলেন।

লবঙ্গিকা। (ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া) তবে তুমিও তাঁকে দেখে স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করেছিলে।"

এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, কৃত্রিম সাধুভাষা পরিত্যাগ করিয়া অনুবাদক চলিত ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন। নবম অঙ্কে (পৃঃ ৫৭) বিবাহ-রাত্রের হাস্যোদ্দীপক-প্রসঙ্গে বুদ্ধরক্ষিতার স্বগতোক্তি ইহার একটি উদাহরণ:

অঙ্কিত করিয়াছে এইরূপ বলা হইয়াছে। রামনারায়ণের অনুবাদে এরূপ ভুল নাই। পুনরায় ষষ্ঠ অঙ্কে—

দূত। আজ্ঞা রাজমহিষী আপনাকে মালতীকে লয়ে যেতে বল্লেন।

কামন্দকী। বাছা চল তোমার মা ডাকছেন।

"বুদ্ধরক্ষিতা। (সহাস্যে) ওমা ! কোথা যাবো কি লজ্জার কথা ; আ মলো তাই নয় একটু স্তায়না হ, ওমা তাও নয়, পোড়ারমুখো বুড়ো যেন মুখ্‌য়ে ছিল, মকরন্দ মালতীর বেশে তার ঘরে গিয়েছিল, মিন্সে তার কিছুই জাস্তে পারে না গা, মিন্সে কি কানা গোঁফজোড়াও কি দেখতে পেলে না। (উচ্চহাস্যে) খুব করেছে, লবঙ্গিকা বল্‌ছিলো যে ফুলশয্যার রাত্তিরে বুড়ো যেমন আলিঙ্গন কত্তে যাবে অম্‌নি মকরন্দ নাকি গোব্যাড়ান পিটোবে, তা যা হোক এই ব্যালা মকরন্দের সঙ্গে মদয়স্তিকার বে দিতে হবে, তা যাই দেখিগে কোথাকার জল কোথায় যায়।"

এখানে চলিত ভাষা উপযোগী হইলেও, এই ধরণের ভাষায় সর্ব্বত্র যে মূলের গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ইহার উপর, অনেক স্থলে কৃত্রিম ভাষায় ও ভঙ্গীতে, দীর্ঘ বর্ণনা বক্তৃতা বা স্বগতোক্তি প্রভৃতি অভিনয়ের উপযোগী হয় নাই। মূল অনুসরণ করিয়া সপ্তম অঙ্কে মাধবের মুখে শ্মশানের এইরূপ একটি বর্ণনা আছে : (পৃঃ ৪১-৪২)

"মাধব। কি ভয়ানক রাত্রি, উঃ কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, শ্মশান স্থান কি ভয়ঙ্কর, চারিদিকে শিবাগণের শব্দে পেচককুলের অমঙ্গল দূষিত ধ্বনিতে, অদূরে জলন্ত চিতার মধ্যস্থ দগ্ধ কাষ্ঠফলকের শব্দে, বৈষয়িক ব্যক্তিরও বৈরাগ্যোদয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এক্ষণে মন ! কেন আর অন্য বিষয় দর্শনে প্রতিজ্ঞাপালনে বিরত হও ? হে নেত্রযুগল ! তোমরা আর কি প্রিয়ার দর্শন পেয়ে চরিতার্থ হতে পারবে ? হে কর্ণদ্বয় ! তোমরা আর কি সেই সুকোমল কথা শুনে জুড়াতে পাবে ? হে হস্তদ্বয়। কেন আর বিলম্ব কর, তোমরা মনেও ভেবো না যে আর সেই সৌন্দর্য্যশালিনীকে আলিঙ্গন কত্তে পাবে। হে চরণদ্বয়, তোমরা কেন গমনে ক্ষান্ত হয়েছ ?"

এইরূপ তিন পৃষ্ঠাব্যাপী স্বগতোক্তি, একটি গান বা স্তব দিয়া শেষ করা হইয়াছে।

এই নাটকের প্রারম্ভে অনুবাদকের স্বরচিত একটি প্রস্তাবনা আছে এবং তাহাতে দুইটি গান দেওয়া হইয়াছে। মূলের শ্লোকগুলির ছন্দোনুবাদ বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই নাটকে বারটি গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।*

---

* বাংলা নাটকে গান-সংযোগের রীতি এই প্রথম নয়। রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'তে (১৮৫৮) দশটি গান আছে। সেগুলি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ও সে-সময়ের উৎকৃষ্ট সঙ্গীতরচয়িতা বলিয়া খ্যাত গুরুদয়াল চৌধুরী রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। রামনারায়ণের 'মালতী-মাধবে'ও

এই গানগুলি প্রধানতঃ বৈতালিক, মালতী অথবা মাধবের দ্বারা গেয়
গানগুলির ধরণ অনেকটা নিধুবাবুর টপ্পার মত ; যথা—

রাগিণী বাঁরোয়া—তাল ঠুংরি

তাহে মজো নারে মন।
যাতে হবে পরে জ্বালাতন ॥
দুর্লভ বস্তুর তরে, মন কি যতন করে,
পরে অনুরাগ করে, হবে পর কি আপন।
পরের প্রণয় তরে, লাজ ভয় ত্যাগ করে,
কুলে জলাঞ্জলি করে, কর কুপথে গমন ॥
পরে প্রেমবশ হয়ে, পরেরে আপন করে,
বিরহ যাতনা সয়ে, কর পরেরে যতন ॥

সাবিত্রী-সত্যবান কালীপ্রসন্ন সিংহের নিজস্ব রচনা। নাটকের নামেই ইহার কথাবস্তুর পরিচয়। ইহার আখ্যানভাগ প্রধানতঃ মহাভারতের বন-পর্ব্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে, এ কথা গ্রন্থকার তাঁহার বিজ্ঞাপনে স্বীকার করিয়াছেন। টাইটেল পেজ এইরূপ :

Shabitree Shotyoban. A Comedy by Kali Prosono Sing Member of the Asiatic and Agricultural and Horticultural Societies of India, and of the British Indian Association and President of Bidyoth Shahine Shobha of Calcutta etc. etc. etc. Calcutta: Printed by G. P. Roy & Co., for Bidyoth Shahine Shobha, No. 67 Emaumbarry Lane, Cossitollah. 1858.

সাবিত্রী সত্যবান নাটক। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত। কলিকাতা। জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ মুদ্রিত, কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন ৬৭। শকাব্দা ১৭৮০। বিনামূল্যেন বিতরিতব্যং। (পত্র সংখ্যা ।৵০ + ৯৮)।

(১৮৬৭) এইরূপ কতকগুলি গান দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি বনোয়ারীলাল রায় নামক কোন ব্যক্তি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কালীপ্রসন্নের সঙ্গীত-অনুরাগের পরিচয়, দ্বিতীয় বর্ষের 'পুণ্য' পত্রিকায় (পৌষ-মাঘ ১৩০৫) হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নাটকখানি পাঁচ কাণ্ডে বিভক্ত এবং প্রত্যেক কাণ্ডে অঙ্ক বিভাগ এইরূপ : প্রথম কাণ্ড—তিন অঙ্ক; দ্বিতীয়—তিন; তৃতীয়—তিন; চতুর্থ—এক (অসম্পূর্ণ)। ইংরেজী নাটকের প্রণালীতে এইরূপ কাণ্ড ও অঙ্ক বিভাগ হইলেও সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চে নট ও নটীর কথোপকথন দ্বারা নাট্যবস্তুর অবতারণা করা হইয়াছে, এবং ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের প্রণালী মিশ্রিত করিয়া নাট্যসঙ্কেত বা stage direction গুলি দেওয়া হইয়াছে : যথা পটোত্তোলনান্তর প্রবেশ, পটক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।*

কথাবস্তু চিত্তাকর্ষক ভাবে গ্রথিত হইলেও নাটকখানি খুব উঁচুদরের রচনা নয়। দৃশ্যগুলি স্বল্পায়তন, ক্ষিপ্রগতি ও অবান্তর বিষয়ের বাহুল্য-বর্জ্জিত; কিন্তু চরিত্রাঙ্কন বেশ স্পষ্ট বা পরিস্ফুট হয় নাই। গ্রন্থকার পুস্তকগত নায়ক-নায়িকার আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন, জীবন্ত চিত্র আঁকিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা খুব সফল হয় নাই। এই নাটকের বিদূষক, সংস্কৃত নাটকের মামুলীপ্রথাগত, উদর-পরায়ণ ও বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত বিদূষকের ছায়ামাত্র। ভবভূতির অনুকরণে, প্রথম কাণ্ড তৃতীয় অঙ্কে দুইটি শিশুর যে প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে হাস্যোদ্দীপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব গ্রন্থকার বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য বর্ণনা বা ভাবপ্রবণতার আতিশয্য নাট্যবস্তুর অবাধগতিকে অনেকস্থলে ব্যাহত করিয়াছে। 'মালতী-মাধবে' মকরন্দের গলা জড়াইয়া মাধবের আট-দশ পৃষ্ঠাব্যাপী মামুলী ধরণের হাহুতাশ ও বিলাপোক্তি যেরূপ ক্লান্তিজনক হইয়াছে, সেরূপ সত্যবানের পূর্ব্বরাগ ও বিরহাবস্থা, তদুপলক্ষ্যে তাহার বন্ধু শ্বেতগর্ভের সহিত কথোপকথন, সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে কৃত্রিম, ভাবগদ্‌গদ ও বাগাড়ম্বরবহুল হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে সত্যবান ও সাবিত্রীর সাক্ষাৎ শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের কথা মনে করাইয়া দেয়। শ্বশুরগৃহ গমনের সময় সাবিত্রীর প্রতি তৎসখী সাগরিকার উপদেশ, মহর্ষি কণ্বের উপদেশের স্পষ্ট অনুকরণ।

একটি দোষ কালীপ্রসন্ন সিংহের সমস্ত নাটকে দেখা যায়; সেটি এই যে, গুরুগম্ভীর সাধুভাষা ও অত্যন্ত লঘু চলিত ভাষা পাশাপাশি থাকিয়া

* এইরূপ হরচন্দ্র ঘোষের 'চারুমুখ-চিত্তহরায় (১৮৬৪) 'সর্ব্বেষাং প্রস্থানম্' ইত্যাদি নাট্যসঙ্কেত রহিয়াছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের চক্ষুদান প্রহসনে, প্রত্যেক অঙ্কের শেষে 'পট-প্রক্ষেপণং। সমবেতবাদনম্।' আছে।

অনেকস্থলে হাস্যাস্পদ হইয়াছে। সাবিত্রী-সত্যবানেও এই দোষ অল্প পরিমাণে রহিয়াছে। যথা, একদিকে—

সাবিত্রী। এই জগন্মণ্ডলে মানবগণ লোভপরবশ হইয়া বিবিধ দুষ্কর্ম্মে অবিরত অভিরত থাকে, শাস্ত্রেও কথিত আছে লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়; লোভ হইতে অভিলাষ জন্মে, লোভ হইতে মোহ জন্মে, সেই হেতু লোভই সকল পাপের মূল কারণ।

অথবা—

সত্যবান। সখে! ক্রমশঃ আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস হইতেছে, মন কি দিবা কি রজনী সকল সময়ে চঞ্চল, গুরুজনসেবা এবং সাবকাশ সময়ে বন্ধুগণ সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কালযাপনও প্রিয়কর হইতেছে না, বোধ করি অনতিকাল মধ্যেই কামশরে কালকরে পতিত হইতে হইবে।

অন্যদিকে—

তরলিকা। এখন বের কথায় পোড়াস্‌নে, পোড়াস্‌নে, এর পর ভাতার ভাতার করে আমাদের পোড়াবি। ......ইত্যাদি।

'মালতী মাধবের' মত এই নাটকেও কতকগুলি রাগ-তাল-যুক্ত গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু গানগুলি প্রায় ধর্ম্ম-বিষয়ক।

আষাঢ়, ১৩৩৮

নাটুকে রামনারায়ণ

আধুনিক সাহিত্যের প্রথম যুগে যাঁহারা বাংলা নাটক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'নাটুকে রামনারাণ' বলিয়া তৎকালে প্রখ্যাত রামনারায়ণ তর্করত্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে, নীলমণি পাল 'রত্নাবলী নাটিকা' (১৮৪৯), তারাচরণ শীকদার 'ভদ্রার্জ্জুন' (১৮৫২) ও হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস'[২] (১৮৫৩) লিখিয়াছিলেন, তথাপি এই তিনটি অধুনা-বিস্মৃত নাটক কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই। রামনারায়ণের প্রথম নাটক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও মুদ্রিত, এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার বাসভবনে স্থাপিত রঙ্গমঞ্চে, কোন অজ্ঞাতনামা লেখক কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত একমাত্র 'বিদ্যাসুন্দর'-এর[৩] অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চ স্থায়ী হয় নাই, এবং নাটকখানি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের রীতি ও রুচি অনুযায়ী না হওয়াতে ফলপ্রদ হয় নাই। ইহার পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে[৪] রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয়

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৪, পৃঃ ৪২-৫৮। নীলমণি পাল-রচিত 'রত্নাবলী নাটিকা' (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৬) শ্রীহর্ষের নাটিকা অবলম্বনে গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহার পরিচয়-পত্রে কলিকাতা ১৭৭১ শকাব্দ—এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। যতদূর অনুসন্ধানে জানা যায়, ইহাই প্রথম বাংলা নাটক। ইহার ভাষা কিন্তু পণ্ডিতী ধরণের, এবং পুস্তকেই উল্লিখিত রহিয়াছে যে, পণ্ডিত চন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ ইহা সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার এক খণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে ও ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে আছে।

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩৩৩, পৃঃ ১৪১-১৬২।

৩ প্রবাসী, ১৩৩৮, আষাঢ়, পৃঃ ৩০৮; শ্রাবণ, পৃঃ ৪৯১।

৪ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ দাস দত্ত নামক ইংরেজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য কোন ব্যক্তি 'অনুতাপিনী নবকামিনী' (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৪) নামক একখানি ষড়ঙ্ক নাটক গদ্যে রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই। ইহা Rowe প্রণীত Fair Penitent নামক ইংরেজী নাটকের অনুবাদ মাত্র। মূলের বিদেশী নাম ইত্যাদি রক্ষিত হইয়াছে; ভাষা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। ইহাতে ব্যভিচার, খুন, আত্মহত্যা প্রভৃতি যে লোমহর্ষণ ঘটনাবলী আছে, তাহাও ইংরেজী মূলের অনুযায়ী। হুগলী-জেলা-নিবাসী তারকচন্দ্র চূড়ামণির

কলিকাতা নূতন বাজারে, পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় যথাক্রমে কলিকাতা বাঁশতলায় ও চুঁচুড়ায় হইয়াছিল। যদিও নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'৫ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতা সিমলায় আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) ভবনে ৩০শে জানুয়ারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহার যে প্রথম অভিনয় (দ্বিতীয় অভিনয় ২২শে ফেব্রুয়ারী) হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার প্রায় দুইমাস পরে, ১১ই এপ্রিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকো বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীন রঙ্গমঞ্চ রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় দ্বারা আরব্ধ হয়। এই রঙ্গমঞ্চ ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয়। ইহাতে

বহু-বিবাহ বিষয়ক 'সপত্নী-নাটক' (প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪৮; দ্বিতীয় ভাগ, বোধ হয়, আর প্রকাশিত হয় নাই) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের একটি অক্ষম অনুকরণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ভাষা (পুরুষদের ভাষা যেমন সংস্কৃতবহুল, স্ত্রীলোকদের ভাষা তেমনি খেলো), চরিত্রবাহুল্য, শোকাবহ ঘটনার আতিশয্য, তিন চার পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্যে ও গদ্যে স্বগতোক্তি ও কথোপকথন প্রভৃতি দোষের জন্য এই নাটক মোটেই অভিনয়োপযোগী নয়, এবং কুত্রাপি ইহা অভিনীত হয় নাই। ইহার তিনটি অঙ্ক আছে, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে দৃশ্য-বিভাগ নাই। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটক ১৮৫৬ সালে রচিত। কিন্তু ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির উদ্যোগে, বড়বাজার সিঁদুরেপটী গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে। এই সময় আরও দুই একটি অধুনাবিস্মৃত বাঙ্গালা নাটক রচিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়-রচিত 'বিধবোদ্বাহ নাটক' (শক ১৭৭৮=খ্রী: অ: ১৮৫৬; পাঁচ অঙ্ক, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫২), নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি-রচিত 'কলিকৌতুক', অর্থাৎ 'কলির আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ' (চার অঙ্ক, পৃ:-সংখ্যা ১২৩; শ্রীরামপুর, ১৮৫৮ খ্রী: অ:; তৎকালীন হিন্দুসমাজের চিত্র) এবং উমাচরণ দে-রচিত 'নলদময়ন্তী' (কলিকাতা ১৮৫৯, পৃ:-সংখ্যা ৮+১৫০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ইহাদের অভিনয়ের কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

৫ ইহার ইংরেজী পরিচয়-পত্রে প্রদত্ত বর্ণনা কৌতুককর। The Oviguan Sakuntollah of Kalidass, translated into Bengalee from the original by Nundo Coomar Roy. Calcutta 1855 (pp. 176). ইহার বাংলা নাম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক'। নন্দকুমার 'ব্যাকরণদর্পণ' (১৮৫২) নামক পদ্যে একটি বাংলা

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্ব্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী-সত্যবান্' (১৮৫৮) ও 'মালতী-মাধব' (১৮৫৯) নাটকও অভিনীত হইয়াছিল। এই সমস্ত অভিনয় দর্শনে উৎসাহিত হইয়া, যখন পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহাদের বেলগাছিয়ার উদ্যানবাটীতে নূতন নাট্যশালা স্থাপনের উদ্যোগ করেন, তখন রামনারায়ণের 'রত্নাবলী', ৩১শে জুলাই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, এই নাট্যশালার সূত্রপাত করে। তারপর, দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ তাঁহাদের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি' স্থাপন করেন; ৫ই জানুয়ারী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহারও প্রথম অভিনীত নাটক রামনারায়ণের 'নবনাটক'। এইরূপ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা ভবনস্থ ১৮৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'মালতীমাধব', 'রুক্মিণী-হরণ' ও দুইটি প্রহসন ('চক্ষুদান' ও 'উভয় সঙ্কট') ১৮৬৯ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অভিনীত হয়। তখনও স্থায়ী বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় নাই; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে এইরূপ নাটকাভিনয় হইতেই আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যশালার উৎপত্তি। সে সময় এই সকল নাটক রচনার অগ্রণী ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। অন্ততঃ তৎকালীন তিনটি সুপ্রসিদ্ধ অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের সূত্রপাত হইয়াছিল তাঁহারই নাটকাভিনয়ের দ্বারা, এবং চতুর্থ রঙ্গমঞ্চটিতেও তাঁহার অনেকগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ খ্যাতি ছিল যে, তিনি সাধারণের নিকট 'নাটুকে রামনারাণ' এই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

চব্বিশ পরগণা হরিনাভি গ্রামে, ২৬শে ডিসেম্বর ১৮২২ খৃষ্টাব্দে (=১২২৯ বঙ্গাব্দে) রামধন ভট্টাচার্য্য শিরোমণি নামক কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঔরসে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হরিনাভি বাসভবনে প্রাপ্ত স্বলিখিত কাগজপত্রে তিনি নিজের সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'ভারতবর্ষে'[৬] প্রকাশিত

ব্যাকরণও লিখিয়াছিলেন। ছাতুবাবুর ভবনে ১৮৫৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর, 'মহাশ্বেতা' নামক নাটকও অভিনীত হইয়াছিল।

৬ ভারতবর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২৩, পৃঃ ৭১০-৭১২। ইহার তারিখগুলি নির্ভুল নয়। অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'শিল্পকুসুমাঞ্জলী' (সাল ১২৯২) পত্রিকায় রামনারায়ণের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায় যে, রামনারায়ণ প্রথম

করিয়াছেন। তাহাতে রামনারায়ণ লিখিয়াছেন, "আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ ও ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি।" পরে, পিতৃমাতৃহীন রামনারায়ণ, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের আশ্রয়ে থাকিয়া, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (=১২৫০ বঙ্গাব্দে) উক্ত কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, দুই বৎসর হিন্দু মেট্রোপলিটন্ কলেজে হেড-পণ্ডিতী করিয়া, ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুন তারিখে সংস্কৃত কলেজে কাব্য ও অলঙ্কারের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮২ সালে পেন্সন গ্রহণ করিয়া, ১৯শে জানুয়ারী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে (৭ই মাঘ, ১২৯২ সনে) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংরেজী ভাষা বা সাহিত্যে তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন না, কিন্তু 'নবনাটক' পাঠে বুঝা যায়, ইংরেজী ভাষাতেও তাঁহার কিছু দখল ছিল।

রামনারায়ণের প্রথম রচনা 'পতিব্রতোপাখ্যান'[৭] ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে (=১২৫৯ সনে) লিখিত, এবং পর বৎসর ২৩শে জানুয়ারী তারিখে শোভাবাজারে ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার দুই বৎসর পরে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' লিখিয়া তিনি প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে যশোলাভ করেন। এই রচনার ইতিহাস তিনি স্বয়ং উক্ত নাটকের 'বিজ্ঞাপনে' এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন:

মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন, পরে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন।

৭ ইহার দীর্ঘ পরিচয়-পত্র এইরূপ: নমো জগদীশ্বরায়। পতিব্রতোপাখ্যান। জিলা রঙ্গপুরান্তঃপাতি কুণ্ডীনিবাসি ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র রায় চতুর্ধুরি মহাশয়ের আদেশে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য রচিত। কলিকাতা শোভাবাজারীয় সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১২৫৯ সাল ১১ই মাঘ। ইংরেজী ১৮৫৩ সাল ২৩ জানুয়ারী। Printed by Shibe Krist Mitter.—পুস্তকটি ঠিক উপাখ্যান নয়; পতিব্রতা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ (পত্র-সংখ্যা ৯৪)। পতিব্রতার লক্ষণ, পতিব্রতা-মাহাত্ম্য, মৃতপতিকার ধর্ম্ম, আধুনিক সময়ে প্রচলিত কৌলীন্য ইত্যাদি প্রথার দোষ, পুরাণাদিপ্রোক্ত অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত চরিত-কীর্ত্তন ইত্যাদি এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই রচনার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য ইহার "ভূমিকা" হইতে প্রতীয়মান হইবে:—"জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি কুণ্ডীস্থানীয় ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চতুর্ধুরি মহাশয় ৫০ টাকা পারিতোষিক শিরোনামাঙ্কিত এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে লেখেন "পতিব্রতাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম পবিত্রতা চরিত্র চিহ্নাদি

"পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোল-কল্পিত কুল-মর্য্যাদার প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্থ হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম, তন্নিমিত্ত "পতিব্রতোপাখ্যানে" প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে, পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্ধুরীণ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে "বল্লাল সেনীয় কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাতে উক্ত গুণগ্রাহি দেশহিতৈষি মহোদয় তদ্দৃষ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া অঙ্গীকৃত ৫০ টাকা আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং অসামান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহানুভব আমার প্রার্থনানুসারে পুস্তকও আমাকে দেন, আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম॥"

এই নাটক ১৮৫৪ সালে রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়[৮]। উল্লিখিত আত্মকথায় রামনারায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "এই নাটক কলিকাতা নূতন-বাজারে, বাঁশতলার গলিতে ও চুঁচুড়াতে অভিনীত হয়।" নূতনবাজার বলিয়া

বিষয়ে 'পতিব্রতোপাখ্যান' নামে এক মনোনীত গ্রন্থ যিনি লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিবেন"। তাহা পাঠে অনেকে পতিব্রতোপাখ্যান লিখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার সভাপণ্ডিত মহাশয়েরা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া সংস্কৃত কলেজীয় সুপরীক্ষিত সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত এই গ্রন্থ মনোনীত করেন। পরে বাবুর অনুজ্ঞায় আদর্শ পুস্তক ভাস্কর যন্ত্রাগারে আসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ন্যূনাধিক ১৫০ দেড়শত টাকা ব্যয়ে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন। যে সকল স্ত্রীলোকেরা পাতিব্রত্যের অভিলাষ করেন এবং পুরুষগণ মধ্যে যাঁহারা পতিব্রতা-ধারীপরায়ণ হইতে অভিলাষী হয়েন তাঁহারা এই 'পতিব্রতোপাখ্যান' দর্শনীয় জ্ঞান করুন।"

৮ ইহার প্রথম সংস্করণের টাইটেল-পেজ বা পরিচয়-পত্র এইরূপ। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম প্রণীত। কলিকাতা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ ১৮৫ ইষ্টানহোপ্‌ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সম্বৎ ১৯১১। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬+১১৭।—তৃতীয় সংস্করণ কলিকাতা ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ (পৃঃ ২+২+১১৯); পঞ্চম সংস্করণ (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৮), কলিকাতা ১৮৭৯।

অভিনয়ের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার দ্বারা জোড়াসাঁকো চড়কডাঙ্গা (বর্ত্তমান টেগোর কাসল ষ্ট্রীট) জয়রাম বসাকের বাসভবন বুঝিতে হইবে[৯]। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথমভাগে এই স্থলে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। পরে ২২শে মার্চ্চ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঁশতলার গলিতে গদাধর শেঠের বাটীতে দ্বিতীয় অভিনয় হইয়াছিল। তৃতীয় অভিনয় হইয়াছিল কলিকাতায় গদাধর শেঠের রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে। চতুর্থ অভিনয় হইয়াছিল চুঁচুড়ায় শ্রীনাথ পালের বাড়িতে। রামনারায়ণের জীবদ্দশায় এই নাটকের পর পর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই নাটকের প্রথমেই সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিতে নান্দী, প্রস্তাবনা ইত্যাদি আছে, এবং নাটকের মধ্যে পটপরিবর্ত্তনাদি নাই। ইহার 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার কথাবস্তুর এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন:

"এই নাটক ষড়্‌ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা-গণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ির দোষদ্‌ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিদেবন। ষষ্ঠে, বিবাহনির্ব্বাহ ও গ্রন্থসমাপ্তি।"

কিন্তু নাটকের এই ছয়টি বিভিন্ন অংশ পরস্পরাপেক্ষী নয়, বরং পঞ্চমটি অপ্রাসঙ্গিক। সমস্ত নাটকের মধ্যে বাঁধুনীর অভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। কৌলীন্য-মর্য্যাদাভিমানী কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পরদিন অতিবৃদ্ধ কুলীনপাত্রে কন্যা-চতুষ্টয় সম্প্রদান করাই ইহার স্থূল তাৎপর্য্য; কিন্তু এই সামান্য আখ্যান-বস্তু নির্ম্মাণে কোন নিপুণ নাট্য-কৌশল দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা নাটক নয়; কথোপকথন ও রঙ্গচিত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া প্রবন্ধমাত্র রচনা করা হইয়াছে। বিবিধ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা, অনর্থক অভিমত প্রকাশ, ভাঁড়ামী, ব্যঙ্গোক্তি, বক্তৃতা এবং ত্রিপদী-পয়ারাদি ছন্দে দীর্ঘবর্ণনা[১০] ইত্যাদি ইহার নাট্যবস্তুর অবাধ

[৯] তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'বেণীসংহার' সম্বন্ধে রামনারায়ণ আরও স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, ইহার দ্বিতীয় অভিনয় "নূতন বাজারে জয়রাম বসাকের বাটীতে" হইয়াছিল। ইহা হইতে বোধ হয় যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয়ও এইস্থানে হইয়াছিল।

[১০] যথা, 'বিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু'চারি আদার কুচি' ইত্যাদি বর্ণনা। ভাষা প্রায় সরস ও প্রাঞ্জল, কিন্তু স্থানে স্থানে, বিশেষ বক্তৃতার ভাষায়, পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃতের মায়া

গতিকে ব্যাহত করিয়াছে। আখ্যান-বস্তুর সাহায্যে বা ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তোলা অপেক্ষা, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ চরিত্র লইয়া, সামাজিক চিত্র বা প্রসঙ্গের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। কোন dramatic action বা plot নাই বলিলেও চলে। কুলপালক, অনৃতাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র কৌতূহলজনক হইলেও, ইহাদের নামকরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, এগুলি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতীকরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। নাটকের অনেকগুলি প্রসঙ্গ মূল-বিষয়ের সহিত সম্পর্করহিত। তৃতীয় অঙ্কে দেবল ও রসিকার প্রসঙ্গ, অথবা চতুর্থ অঙ্কে মহিলা মাধুরীর কথোপকথন যে কেবল রুচি-বিগর্হিত তাহা নহে, এগুলি বাদ দিলেও নাটকের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হইত না। তেমনি সুমতি ও উদরপরায়ণের রহস্য উপাদেয় হইলেও, স্থূল ও অবান্তর। মোট কথা, এই রচনাটি একটি সামান্য কৃত্রিম মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া তৎকালীন সমাজবিশেষের চিত্রস্বরূপ সংলগ্ন বা অসংলগ্ন দৃশ্য ও প্রসঙ্গের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু সামাজিক বিষয় লইয়া বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম নাটক রচনার চেষ্টা; ইহা ঠিক নাটক না হইলেও, সামাজিক রঙ্গচিত্র হিসাবে একেবারে নগণ্য নয়।

প্রহসন ও পৌরাণিক নাটকগুলি ছাড়িয়া দিলে, রামনারায়ণের অন্যান্য অধিকাংশ নাটক সংস্কৃতের ভাবানুবাদ। অবিকল অনুবাদ করিলে অনুবাদকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, এবং রচনাও বাঙ্গালায় সুপাঠ্য বা অভিনয়োপযোগী হইত না। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে (১৮৫৭) অক্ষরানুযায়ী অনুবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই জন্য রামনারায়ণ সকল নাটকে যথেষ্ট স্বাধীনতা লইয়া অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি করিয়াছেন। 'বেণী-সংহার' নাটকের বিজ্ঞাপনে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, এ অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে, স্থান বিশেষে কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অনেক স্থলে নূতন দৃশ্যের বা চরিত্রের সমাবেশ এবং স্বকল্পিত বাক্যেরও প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে প্রায় কোথাও মূলের বিরুদ্ধ বা অসমঞ্জস ভাব ব্যক্ত হয় নাই। মূলের শ্লোকগুলি পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে অনুবাদ না করিয়া

একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী কোন নাটক এতটা সংস্কৃত-ঘেঁষা নয়। পুস্তকখানি আধুনিক সময়ে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে এবং দুষ্প্রাপ্য নয়; সেই জন্য এখানে নমুনা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

তাহাদের ভাবার্থ গদ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে সমস্ত শ্লোকটি অনুবাদ না করিয়া, নাট্যবস্তুর জন্য যেটুকুর প্রয়োজন, সেইটুকু মাত্র দেওয়া হইয়াছে। যথা 'বেণীসংহার' নাটকের "অন্যোন্যাস্ফালভিন্নদ্বিপরুধির" ইত্যাদি শ্লোকটির সমুদয় অনুবাদ না করিয়া, শুধু শেষপদের ভাবার্থ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে,—"যুদ্ধস্বরূপ সমুদ্র দুস্তর, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহা উত্তীর্ণ হইতে অত্যন্ত পণ্ডিত, তা ভয় নাই চল্‌নেম" ইত্যাদি। রসের পুষ্টির জন্য, সংস্কৃত নাটকের কাব্য-সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ ইহার শ্লোকাংশ অপরিহার্য্য; সুতরাং সর্ব্বত্র শ্লোকগুলির গদ্যে অনুবাদ করিয়া বা ভাবার্থ সঙ্কলন করিয়া মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। কিন্তু বাংলা পয়ারাদি ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বা উপযুক্ত নয়; তাহা ত্যাগ করিয়া অনুবাদক ভালই করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার পরবর্ত্তী 'মালতী-মাধব' (১৮৫৯) নাটকে এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে পয়ারে রোদন, ত্রিপদীতে রাগ বা মালঝাঁপ ছন্দে বীরত্ব প্রকাশ করিলে কিরূপ হাস্যাস্পদ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় নাটক 'বেণীসংহার', ভট্টনারায়ণের তন্নামধেয় সুবিদিত সংস্কৃত নাটকের এইরূপ ভাবানুবাদ। ইহা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, এবং সেই বৎসরই কলিকাতা সত্যার্ণব যন্ত্রে প্রথম মুদ্রিত[১১]। পর বৎসরে ৯ই এপ্রিল কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনয় উপলক্ষে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়[১২]। ইহার বিবরণ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী'-র 'বিজ্ঞাপনে' (১৮৫৭) দিয়াছেন।

এই নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত; কিন্তু মূলের প্রস্তাবনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের পত্রসংখ্যা (এক পৃষ্ঠা শুদ্ধিপত্র সমেত): ২৩+

---

১১ ইহার পরিচয়-পত্র এইরূপ: বেণীসংহার নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯১৩।—দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃঃ-সংখ্যা ১০৩), কলিকাতা সংবৎ ১৯৩০ = ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

১২ এই নাটকের সমালোচনা উপলক্ষে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' (ভাদ্র, ১৭৭৯ শক) এই অভিনয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে:—"কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের সাতিশয় প্রযত্নে প্রস্তাবিত অনুবাদ গ্রন্থের অভিনয় হইয়াছিল।" রামনারায়ণের উপাধি এই সমালোচনায় 'তর্কসিদ্ধান্ত' এইরূপ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পুস্তকে 'তর্করত্ন' আছে। তাঁহার 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি একমাত্র 'পতিব্রতোপাখ্যানে' পাওয়া যায়; অন্যত্র 'তর্করত্ন' উপাধিতে তিনি অভিহিত।

১৬; প্রথম ২৩ পৃষ্ঠায় উপক্রমণিকা স্বরূপ গদ্যে ইহার আখ্যান-ভাগের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদকের একটি সংক্ষিপ্ত 'বিজ্ঞাপন' আছে; তাহার তারিখ "কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়, ২৮ জ্যৈষ্ঠ সংবৎ ১৯১৩"। মৌলিকতা বা নূতনত্ব না থাকিলেও, নাটকটি সুলিখিত। ইহার ভাষা বীররসাশ্রিত গুরুগম্ভীর নাটকের উপযোগী; কিন্তু উৎকট নয়, প্রাঞ্জল। কেবল স্থানে স্থানে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মিশ্রণ হাস্যাস্পদ না হইলেও মনোরম হয় নাই। যাত্রার ধরণের আস্ফালন ও হাহুতাশ একেবারে যায় নাই, কিন্তু সমকালীন নাটকের অনর্থক বাগাড়ম্বর বেশী নাই। ইহার ভাষার ও ভঙ্গীর একটি নমুনা এখানে উদ্ধৃত হইল (প্রথম অঙ্ক, পৃঃ ৭)—

"সখী। শুনুন তবে, আজি দেবী কয়েক জন স্বতিনের (!) সঙ্গে গান্ধারীকে প্রণাম কত্যে গিছিলেন।

ভীম। হাঁ তারপর?

সখী। তার পর ফিরে আস্‌বের সময় ভানুমতীর সঙ্গে দেখা হলো।

ভীম। (আক্ষেপ পূর্ব্বক) আঃ শত্রুর স্ত্রীর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইল। তবেই তো ক্রোধ হইতেই পারে, তার পর?

সখী। তার পর সে দেবীকে দেখে হেসে হেসে অহংকারে আপনার সখীর প্রতি বল্যে।

ভীম। (সক্রোধে) আবার বিদ্রূপ করিল! আঁা, বল কি! কি বল্যে?

সখী। বল্যে, অলো দ্রৌপদি, শুন্তে পাচ্যি না কি, তোর ভাতারেরা পাঁচখানি গ্রাম চাচ্যে, তবে তোর চুল বেঁধে দেয় না কেন?

ভীম। সহদেব, শুনিলে?

সহ। হাঁ, শোনাই আছে, সেও তো দুর্য্যোধনের স্ত্রী, না হবে কেন, সর্ব্বদা একত্র থাকায় স্ত্রীর মন স্বামির মনেরি সদৃশ হয়, এ তো প্রসিদ্ধই আছে; মধুর লতা যদি বিষবৃক্ষ আশ্রয় করে তবে অবশ্যই তার মারাত্মক শক্তি জন্মে, তার সন্দেহ কি!

ভীম। (সখীর প্রতি) তা দেবী তাতে কি উত্তর করিলেন?

সখী। কেন, দেবী তার কথাতে উত্তর দিবেন কেন? আমরা কি সঙ্গে কেউ ছিলেম না?

ভীম। তুমি কি বলিলে?

সখী। আমি বললেম, বলি ভানুমতি, তোমাদের চুল না খোলা হলে আমাদের দেবীর চুল কেমন করে বাঁধা হয়?

ভীম। (সপরিতোষে) হাঁ উত্তম বলিয়াছ, ভাল উত্তরই হইয়াছে, না হবে কেন? আমাদের পরিবার কি না। (আসন হইতে উঠিয়া) প্রিয়ে আর মনোদুঃখ করিও না। আমার প্রতিজ্ঞা, এই প্রচণ্ড যমদণ্ডতুল্য গদার প্রহারে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে নিধন করে তাহারি রক্ত হাতে মেখে এসে তোমার এই কেশ বন্ধন করে দিব।

দ্রৌপ। নাথ, তুমি মনে কল্যে কি না হয়, এখন তোমার ভাইদের অনুগ্রহ হলে হয়।

সহ। হাঁ আমাদের তো অনুগ্রহ আছেই।

(নেপথ্যে মহাশব্দ। সকলের বিস্ময়।)

ভীম। একি? এমন দুন্দুভি বাদ্য হঠাৎ কেন হইল। সমুদ্র মন্থন সময়ে মন্দর পর্ব্বতের আঘাতে সমুদ্রের জলে যেরূপ শব্দ হয়, মহাপ্রলয় কালে মেঘসমূহ পরস্পর আঘাত পেলে যেরূপ শব্দ হয়, তাহার ন্যায় অতি গম্ভীর, বোধ হয়, দ্রৌপদীর ক্রোধের অগ্রদূতই এ, কিম্বা কুরুকুল নির্ম্মূল করিতে উৎপাত বাতই আসিল।"

রামনারায়ণের দ্বিতীয় অনূদিত নাটক 'রত্নাবলী', বেলগাছিয়া নাট্যশালার সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের সুপরিচিত। ইহা শ্রীহর্ষের তন্নামধেয় সংস্কৃত নাটিকা অবলম্বনে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। মার্চ্চ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে (=২৮শে ফাল্গুন, ১৯১৪ সংবতে) পাইকপাড়া রাজাদের আনুকূল্যে এই নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত[১৩] হইয়াছিল। সেই বৎসর (১৮৫৮) ৩১শে জুলাই তারিখে (=১৬ই শ্রাবণ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দে) ইহার প্রথম অভিনয়ের দ্বারা পাইকপাড়ার

১৩ ইহার প্রথম সংস্করণের পরিচয়-পত্র এইরূপঃ রত্নাবলী নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮৫ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। সম্বৎ ১৯১৪।—পত্রসংখ্যা ৷০+৯২। ইহার বিজ্ঞাপনের তারিখ যথাঃ—"কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়, ২৮ ফাল্গুন সম্বৎ ১৯১৪।" ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৯১৮ সংবতে (=১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে) ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে মূল নাটকের আরম্ভে যে যৌগন্ধরায়ণের প্রসঙ্গ আছে, তাহা বর্জ্জিত হইয়াছিল, এবং অন্যান্য পরিবর্ত্তনাদিও করা হইয়াছিল। ইহার তৃতীয় সংস্করণের তারিখ সংবৎ ১৯২৫ (কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত)=খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৯।

জমিদার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া উদ্যানবাটীতে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়; এবং গ্রন্থকার ইহার জন্য উক্ত রাজাদের নিকট ২০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:

"বিদ্যানুরাগি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে সমূহ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার অনুকূলতার কোন প্রসঙ্গ না করিলে অপরিসীম দোষে দূষিত হইতে হয়। অতএব তাঁহার নিকটে সমধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তজ্জন্য অনন্তকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম, এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া এই স্থলে বিরাম করা গেল।"

বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোগীরা সকলেই কৃতবিদ্য ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন; এবং যাহাতে অভিনীত নাটক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয়, তাহার জন্য তাঁহারা পরিশ্রম বা অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে জানা যায় যে, 'রত্নাবলী' উক্ত রঙ্গমঞ্চে ছয় সাতবার অভিনীত হয়, "তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানা স্থানে অভিনীত হইতেছে"। ইহার প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র 'কলিকাতা রিভিউ' (1873, p. 255) পত্রে প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন:

The corps of *dramatis personae* was trained by Babu Keshub Chunder Ganguli, a born actor......It was accompanied by a band newly organised by Kshetra Mohan Gossain. There was a distinguished audience present on the occasion, including Sir Frederick Halliday, the then Lieutenant-Governor of Bengal, the Judges and the Magistrates of Calcutta, and other high officials, as well non-officials. The performance was a great success.

রামনারায়ণের অন্যান্য অনূদিত নাটকের মত, 'রত্নাবলী'ও অবিকল অনুবাদ নয়। ইহার নাতিদীর্ঘ 'বিজ্ঞাপনে' রামনারাণ স্বীয় উদ্দেশ্য ও অনুবাদের রীতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

"......অশেষ আনন্দের বিষয় যে অধুনাতন লোকদিগের নাট্যব্যাপারে বিশিষ্ট অনুরাগ জন্মিতেছে। সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটকসমূহের অতুলন রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মল সুধাকর-বিনিঃসৃত সুধাধারার আস্বাদন

পাইলে কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না। কিন্তু সজ্জন সমূহের এরূপ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হওয়া যদিও নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় বটে, তথাপি বঙ্গভাষায় নাটকসংখ্যা অতি অল্পমাত্র থাকাতে তদ্বিষয়ে সকলের ঐ নবীন অনুরাগ সফল হইতেছে না।······

"সকলেই স্বীকার করিবেন যে অভিনব কোন নাটক প্রস্তুত করা অতীব সুকঠিন; কিন্তু অন্যভাষা হইতে অনুবাদ করা যে তদপেক্ষা নিতান্ত সহজ এমতও নহে। যেমন কাশ্মীর দেশস্থ উপত্যকার স্বভাবোৎফুল্ল কুসুমনিচয়, অতি যত্নেও এতদ্দেশের নিম্নভূমিতে বিকশিত হয় না, তদ্রূপ অশেষ রসশালিনী সংস্কৃত ভাষার চিত্তরঞ্জক ভাবাদি আধুনিক ও সঙ্কীর্ণ বঙ্গভাষায় পরিরক্ষিত হওয়া সুদূরপরাহত। তন্নিমিত্ত রত্নাবলী নাটকের অবিকল অনুবাদ করণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূল গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করা গেল; এবং কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম, তাহাতে স্থানে স্থানে কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে কোন কোন ভাব পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে।"

মূলের প্রস্তাবনা বর্জ্জিত হয় নাই; প্রথমেই সূত্রধারের নান্দীচ্ছলে গান ও পরে নটী বসন্ত বর্ণনা করিয়া একটি গান গাহিয়াছে। মূলের শ্লোকগুলি ছন্দে অনুবাদ না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নাটকে এরূপ ১০টি গান আছে; সেগুলি অনুবাদকের স্বরচিত নহে। সে সময়ের উৎকৃষ্ট সঙ্গীতরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য ও বন্ধু গুরুদয়াল চৌধুরী এই গানগুলি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রামনারায়ণ 'বিজ্ঞাপনে' লিখিয়াছেন:

"বিশেষতঃ এই নাটকাভিনয় বিষয়ে যে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, তাহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত থাকায় এ গ্রন্থ তদুপযোগী করণ মানসে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি, এবং তন্নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরী মহোদয় দ্বারা কতিপয় সঙ্গীতও সংগ্রহ করিয়া স্থানবিশেষে যোজনা করা গিয়াছে। যদিচ যাত্রার প্রতি আমারদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সঙ্গীত মাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সঙ্গীত সম্পদ নিতান্ত পরিবর্জ্জিত হইলেও তাহাতে রস ও সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা। বোধ করি পাঠকমণ্ডলীও এই অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবেন না।"

গানগুলি প্রায়ই প্রেমবিষয়ক; অনেকটা নিধুবাবুর টপ্পার ধরণের।

সূত্রধার ও নটী ভিন্ন, চেটী ও বৈতালিকের মুখে এই গানগুলি দেওয়া হইয়াছে, এবং সাগরিকাও চারিটি গান গাহিয়াছেন। সাগরিকার একটি গান নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি :

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।
শুন রতিপতি করি হে তোমারে এই মিনতি।
এ রীতি কি রীতি তব হইয়ে ভূপতি।
অনঙ্গ হইয়ে কত, রঙ্গ কর মনোমত,
বধিতে যুবতী,
হরকোপানলে জ্বলে গেল না কুমতি।
তব শরে নিরন্তর জর জর চরাচর
অমর প্রভৃতি ;
সে শর সন্ধান কেন অবলার প্রতি ॥

ভাষা ও ভঙ্গীর নমুনাস্বরূপ বেশী উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। তৃতীয় অঙ্কে, কণ্ঠে লতাপাশ অর্পণের প্রসঙ্গে সাগরিকার স্বগতোক্তি এইরূপ ফেনাইয়া বিস্তৃত করা হইয়াছে :

"সাগরিকা। (স্বগত) আমি তো বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি কেউ দেখতে পায় নাই—তা এখন যাই কোথা?—সে কথা সব রাজমহিষী টের পেয়েছেন, সকল সখীরে কাণাকাণি করচ্যে কাকেও আর আমি মুখ দেখাতে পাচ্চি নে। (দীর্ঘনিশ্বাস) বরং প্রাণত্যাগ করব তবু তো লজ্জা ত্যাগ করত্যে পারবো না। (চিন্তা করিয়া সরোদনে) প্রাণত্যাগ করিলেই বা প্রাণ আমাকে ত্যাগ করে কৈ? যখন সমুদ্রে নৌকা ডুবেছিল তখন আমার মরণ হলো না, যদি সেই সময় মরত্যেম, তা হলে আর কোন যাতনাই থাকত না, তা বিধাতা আমাকে সে সমুদ্র থেকে রক্ষা কোরে এখন এই অকুল দুঃখসমুদ্রে ফেলে দিলেন (অধোবদনে রোদন)।

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।
ছিছি কি লাঞ্ছনা।
না পুরাতে সাধ, বিষম প্রমাদ, হরিষে বিষাদ, হইল ঘটনা?
থাকিতে স্ববশে, পর প্রেমরসে, মজে নিজ দোষে দুখী হলাম শেষে ;
পোড়া লোকে হাসে, অপযশ ভাষে, হলো একি বিড়ম্বনা ॥

গেলো কুলমান, হলো অপমান, এখন এ দেহে কেন আছে প্রাণ ;
পর যে আপন, হয় কি কখন, বৃথা সে প্রেম বাসনা ॥
তেজি গুরুজন, আর পরিজন, কেন অকারণ সহিব গঞ্জন ;
বরঞ্চ জীবন, দিব বিসর্জ্জন, লাজ ভয় তেজিব না ॥…

(সদীর্ঘনিশ্বাসে সরোদনে স্বগত) হা পিতা মাতা! তোমরা আমাকে এত ভালবাসত্যে তা এখন আমাকে কোথায় বিসর্জ্জন দে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ? একবার তত্ত্বও করল্যে না! আমাকে কি তোমরা একেবারে পরিত্যাগ করেছ? হায় অমাত্য বসুভূতি! তুমি কত স্নেহ কোরে আমাকে সঙ্গে কোরে আন্‌ছিলে—আমার অদৃষ্টে তুমিও গেলে, সঙ্গিগণও সকল গেল! হা পোড়া অদৃষ্ট! আমার আর কেউ নাই, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখ্‌ছি! হে পৃথিবী! শুনিচি তুমি নাকি জগতের মা, তা মা, আমাকে তুমি একটু স্থান দেও। আমি আর দুঃখ সহ্য করত্যে পারিনে! আমি রাজার মেয়ে হয়ে পরের দাস্যবৃত্তি করছিলেম, করছিলেম করছিলেম বা, তা কেন মদনোৎসব দেখত্যে গেলেম?—কেন দুর্লভ বস্তুর প্রতি অভিলাষ করল্যেম?—কেন চিত্রপট লিখল্যেম? কেনই বা সুসঙ্গতার কুমন্ত্রণায় সম্মত হলেম?—তা না হলে ত এত যন্ত্রণা হতো না! সে যা হবার হয়েছে, তা আর সে সকল ভাবলে কি হবে। এখন প্রাণত্যাগ করবারি উপায় দেখি। (চিন্তা করিয়া) হাঁ ঐ একটি অশোক গাছ দেখত্যে পাচ্যি, তা ঐ গাছেতেই গলায় দড়ি দে মরি গে (আগমন)…… ”

ইত্যাদি আরও এক পৃষ্ঠাব্যাপী এই ধরণের হাহুতাশ ও দীর্ঘ স্বগতোক্তির পর লতাপাশে গ্রন্থি দিয়া আবার একটি গান গাহিয়া সাগরিকা কণ্ঠে লতাপাশ অর্পণ করিবার অবসর পাইলেন। কিন্তু এই রকম যাত্রার ধরণে দীর্ঘায়ত বিলাপোক্তি বা হাহুতাশ ছাড়া অন্যত্র কথোপকথন ক্ষিপ্রগতি, প্রাঞ্জল ও অনেকটা অভিনয়োপযোগী। নমুনাস্বরূপ দ্বিতীয় অঙ্কে কদলীগৃহে রাজা ও সুসঙ্গতার আলাপ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। (তৃতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত)—

“রাজা। (সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়ে শীঘ্র চিত্রপট আচ্ছাদন পূর্ব্বক) এস—এস সুসঙ্গতা—তবে,—তবে আমি এখানে আছি মহিষী কি জান্‌তে পেরেছেন?

সুসং। হাঁ, মহারাজ! তিনি জেনেছেন, আবার আমিও ঐ চিত্রপটের কথা বলিগে।

বিদূ। মহারাজ! ও মাগি ভারি দুষ্ট, ও না পারে এমন কর্ম্মই নাই, আমি ওকে কিছু দিয়ে—

রাজা। (সভয়ে সুসঙ্গতার হস্ত ধরিয়া) সখি, তুমি এ কথা মহিষিকে বোলো-টোলো না—আমার দিব্য।

সুসং। (সহাস্যমুখে) না মহারাজ! দিব্য দিবেন না, আমি পরিহাস করলেম্—এ কি বলবার কথা?

রাজা। (সহাস্যমুখে) তাই তো বলি এ কর্ম্ম কি তোমার যোগ্য, এই আংটিটি পর্য়ো—(হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রদান)।

সুসং। (সহাস্যমুখে) মহারাজ! আমাকে কিছু দিতে হবে না—আমার সখী সাগরিকা আমার উপর বড় রাগ করেছেন, কথা কন না, আমি এত সাধ্যি সাধনা কল্যেম কিছুতেই হলো না, তা আপনি বরং তাকে এট্টু বলে কয়ে দিন, তা হলেই আমার পারিতোষিক পাওয়া হল্যো।

রাজা। (সোৎসুকে) কি বলল্যে? সাগরিকা কি তোমার সখী? কৈ? তোমার সখী কোথায়?

সুসং। ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি এত ডাকলেম,—বলি ঘরের ভিতর আয়—তা কোন মতেই এলো না।

রাজা। (সত্বর আসিয়া দেখিয়া, স্বগত) এই সেই সাগরিকা! আহা! মরি মরি! এমন রূপ! (প্রকাশে) সুসঙ্গতা তোমার কি অদৃষ্ট—তুমি এমন সখী কোথায় পেলে? আহা! রূপ দেখে আমার নয়ন জুড়াল, বোধ হয় বিধাতা এঁকে নির্ম্মাণ কোরে আপনি মুগ্ধ হয়ে থাকবেন্।

সাগ। (রাজাকে দেখিয়া ত্রাস, অভিলাষ ও অঙ্গবিলাস প্রকাশ পূর্ব্বক স্বগত) এই না আমার সেই চিত্তচোর? (অধোমুখে অবস্থিতি)।

সুসং। (সহাস্যমুখে) এঁর রূপও যেমন—গুণও তেমনি।

রাজা। হাঁ তা তো প্রত্যক্ষেই দেখছি—একবার কটাক্ষ কোরেই আমার মন হরণ করলেন্—গুণ না থাকলে কি তা পারতেন?

সাগ। (সুসঙ্গতার প্রতি ঈর্ষাপূর্ব্বক) এই বুঝি তোমার চিত্রপট আন্তে যাওয়া? আমি এখান থেকে চল্যেম। (গমনোদ্যোগ)।

রাজা। কেন কেন? এত রাগ কেন?

সুসং। রাগ কেন—ঐ চিত্রপটে ইনি মহারাজকে লিখে দেখছিলেন, তা আমি অভাগী মরতে উরির্ এক ধারে উঁরির ছবি লিখে দিছি—তাই রাগ।

রাজা। এই রাগ? (স্বগত) এতো রাগ নয়—এ যে অনুরাগ। (প্রকাশে) সুন্দরি! আমার কথা রাখ, এমন কোরে যেয়ো না, দ্রুত গমন করলে তোমার কোমল চরণে বেদনা হবে।

সুসং। মহারাজ উনি বড় অভিমানিনী—হাত না ধরিলে হবে না।

রাজা (স্বগত) আমিও তো তাই চাই। (প্রকাশে) অবশ্য, তোমার অনুরোধে পায়ে ধরত্যে পারি—হাতে ধরা কি একটা বড় কথা? (সাগরিকার হস্ত ধারণ)।

সুসং। সখি! আর কেন? রাজা পর্য্যন্ত তোর হাত ধরলেন—তবু কি রাগ পড়ে না।

সাগ। (সুসঙ্গতার প্রতি) তোমার মরণ নাই?"

রামনারায়ণের পরবর্ত্তী 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকও এইরূপ কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাটক অবলম্বনে রচিত। ঠিক অনুবাদ নয়, পূর্ব্ববৎ স্বাধীনভাবে পরিবর্ত্তনাদি করা হইয়াছে। মূলের প্রস্তাবনা ও প্রথমাঙ্কের কিয়দংশ বর্দ্ধিত হইয়া প্রথমেই রাজা ও বৈখানসের কথোপকথন। দু'একটি ছোটখাট ভূমিকাও বিস্তৃত করা হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই ভাবাবলম্বনে গ্রন্থখানি নূতন করিয়া লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও[১৪], ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসের পূর্ব্বে ইহা অভিনীত হয় নাই। রামনারায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, ইহার প্রথম অভিনয়ের স্থান শাঁখারীটোলা ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটী, এবং উক্ত স্থলে এই নাটক পাঁচবার অভিনীত হইয়াছিল। রচনা প্রাঞ্জল এবং মূলের গাম্ভীর্য্য ও ভাব অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। বেশী নমুনা দিবার প্রয়োজন নাই; শকুন্তলার পতিগৃহ-গমন-প্রসঙ্গ হইতে[১৫] একটু উদ্ধৃত করিলেই চলিবে,—

১৪ ইহার পরিচয়-পত্র এইরূপ: অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক। শ্রীরাম নারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। চতুষ্টয়েঽপি টীকানাং প্রাচীনানাঞ্চ তুষ্টয়ে। চমৎকৃতিকরী ভূয়ান্নবীনানাঞ্চ মৎকৃতিঃ॥ কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ইষ্টান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। সম্বৎ ১৯১৭।—দ্বিতীয় সংস্করণের পরিচয়-পত্রে আছে: শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা দ্বিতীয়বার প্রকাশিত। চতুষ্টয়েঽপি টীকানাং প্রাচীনানাঞ্চ তুষ্টয়ে। চমৎকৃতিকরী ভূয়ান্নবীনানাঞ্চ মৎকৃতিঃ॥ কলিকাতা। পটলডাঙ্গা মির্জাফর্স লেন ২৩ নম্বর ভবনে গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত। সংবৎ ১৯২৬।

১৫ দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।

"(কণ্বের প্রবেশ)

কণ্ব। শকুন্তলা আজ স্বামীগৃহে গমন করবেন—অন্তঃকরণ নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে—বাষ্পে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আমার আর বাক্ নিঃসৃত হচ্চে না—একি!—আমি নির্ব্বিষয়ী বনবাসী—স্নেহে আমিও এত ব্যাকুল; এতে গৃহীদের কন্যা পাঠাতে কতই না জানি দুঃখ উপস্থিত হয়ে থাকে। (অল্পে অল্পে আগমন)।

গৌত। বাছা, এই যে তোমার পিতা এলেন, দেখ, স্নেহে ওঁর নয়ন বারিপূর্ণ হয়েছে, তা উঠে ওঁকে প্রণাম কর। (উঠিয়া শকুন্তলার প্রণিপাত)।

কণ্ব। বৎসে, যযাতি রাজার মহিষী শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় তুমি স্বামিসৌভাগ্য-শালিনী হও, আর পুরুর ন্যায় সৎপুত্রও প্রসব কর।

গৌত। বাছা এ তোমার বর, আশীর্ব্বাদ নয়।

কণ্ব। (বিলক্ষণরূপে দেখিয়া) বৎসে, এই যে পিতৃদত্ত ভূষণ পরিধান করেছ, ভাল ভাল, কিন্তু মা তুমি ঐতি রাজার পুত্রবধূ, রাজা দুষ্মন্তের রাজমহিষী, তোমার উপযুক্ত এ অলঙ্কার নয়, তবে কিনা—পিতৃদত্ত সামগ্রীতে স্ত্রীজাতির বহুমান আছে, স্পর্দ্ধাও করে থাকে, তাই কিঞ্চিৎ দেওয়া গেল, আমরা বনবাসী—আমরা কোথা পাবো ?

শকু। পিতঃ তোমার চরণধূলির কণামাত্রকেও আমি রাজসম্পত্তির অধিক দেখি।

কণ্ব। (সজল নয়নে) ঐ সকল গুণাবলিতেই তো আমার বিবেকি চিত্ত মুগ্ধ হচ্চে। (গৌতমীর প্রতি) ভগিনি, শুভ লগ্ন উপস্থিত, তুমি শকুন্তলাকে এই বেদীমধ্যবর্ত্তি ত্রিবিধ প্রকার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়ে যাত্রা করাও।

গৌত। হাঁ করাই, এস বাছা, এস। (সকলের অগ্নিপ্রদক্ষিণ)।"

রামনারায়ণের অন্যতম সুপরিচিত মৌলিক নাট্যগ্রন্থ 'নবনাটক' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে (—১৫ই বৈশাখ ১২৭৩ সালে) রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল[১৬]।

১৬। ইহার প্রথম সংস্করণের টাইট্‌ল-পেজ এইরূপ: বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৮৮। মূল্য এক টাকা।

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের মত ইহাও একটি সামাজিক রঙ্গচিত্র, এবং এই দুইটি মৌলিক রচনার উপরই প্রধানতঃ রামনারায়ণের যশ প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থকার এই নাটকের[১৭] বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—"আমি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই বহু বিবাহ বিষয়ক নবনাটক প্রণয়ন করিলাম।" ইহার ইতিহাস এইরূপ। পাথুরিয়াঘাটানিবাসী দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ বহুবিবাহ বিষয়ে একটি নাটক রচনা করিবার জন্য দুই শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহার উত্তরে প্রাপ্ত রচনাগুলির বিচারক ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারা কোন রচনাই পুরস্কারযোগ্য বিবেচনা না করাতে, তাঁহাদের উপদেশে গুণেন্দ্রনাথ 'নাটুকে রামনারাণ'কে এই বিষয়ে একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। পরে, ২৩শে বৈশাখ ১২৭৩ সালে (=৬ই মে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া, প্যারীচাঁদ মিত্রকে সভাপতি করিয়া রামনারায়ণকে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহার পর ১৮৮৭ সনের ৫ই জানুয়ারী (=২২শে পৌষ ১২৭৩) তারিখে, 'নবনাটক' ঠাকুরবাড়ীতে মহাসমারোহে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতাদের মধ্যে ঠাকুরবাড়ীর অনেকেই ছিলেন, এবং সে সময়ের প্রথা অনুসারে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষে গ্রহণ করিয়াছিল। রামনারায়ণের আত্মকথা হইতে জানা যায় যে, উক্ত স্থলে এই নাটক নয় বার অভিনীত হইয়াছিল। গুণেন্দ্রনাথ গ্রন্থখানির সমস্ত মুদ্রণ-ব্যয় বহন করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থস্বত্বও গ্রন্থকারকে দান করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নাটকটি গুণেন্দ্রনাথকে এইভাবে উৎসর্গ করা হইয়াছে: "অগণ্যসৌজন্যাদিগুণসম্পন্ন শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় মহনীয় চরিতেষু"। এই নাটকের অভিনয় ও সজ্জাদি এরূপ সুন্দর হইয়াছিল যে, গ্রন্থের যাহা কিছু দোষ তাহা লক্ষ্যপথে আসে নাই, কিন্তু কিশোরীচাঁদ মিত্রের মত সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক[১৮] ইহার ঘটনাবিরল নাট্যবস্তুর উল্লেখ করিয়াছে। তথাপি ইহার অভিনয়ে অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়া রামনারায়ণ স্বয়ং মনের আনন্দে এইরূপ সমালোচকদের লক্ষ্য

১৭। বিজ্ঞাপনের তারিখ,—"কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। ১৫ বৈশাখ, ১২৭৩ সাল।"

১৮। ইনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে (১৮৭৩, পৃঃ ২৬১) লিখিয়াছেন—The plot is poor and destitute of interesting incidents......In truth, the acting was infinitely better than the writing of the play.

করিয়া বলিয়াছিলেন : "যারা পলাট্ (plot) নাই, পলাট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্।"

বাস্তবিক, এই নাটকের আখ্যানভাগ অতি সামান্য ও বৈচিত্র্যবর্জ্জিত। পরিচয়পত্রের বর্ণনা অনুসারে ইহা "বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক", এবং ইহার উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের জন্য সদুপদেশসূত্রে নিবদ্ধ।" ইহা হইতে বুঝা যায়, একটি বিশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণ বিষয় লইয়া গ্রন্থখানি রচিত, কিন্তু বিষয়টির উপরই লেখক এত ঝোঁক দিয়াছেন যে, তাহাতে নাট্যবস্তুর বা চরিত্রাঙ্কনের যে ক্ষতি হয় নাই, তাহা বলা যায় না। নাটকের বিশিষ্ট উদ্দেশ্য-বর্ণনে যে সকল কথার উল্লেখ করিতে হয়, তাহা সহৃদয়তার ব্যাঘাতজনক; আর তাহা ত্যাগ করিলে আসল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। রামনারায়ণ যথেষ্ট কৌশল প্রকাশ করিয়াও এই দুই পক্ষের ব্যাঘাত সম্যক্ অপনয়ন করিতে পারেন নাই। সেই জন্য বক্তৃতা, অভিমত প্রকাশ, অবান্তর প্রসঙ্গ প্রভৃতির সাহায্যে সামান্য গল্পাংশকে নাটকাকারে বিস্তৃত করিতে হইয়াছে।

নাটকের গল্পটি এই। গবেশ নামক কোন স্থূলবুদ্ধি জমিদার দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া তাহার প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী ও তদ্গর্ভজাত ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্র সুবোধকে, দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখার প্ররোচনায় অবহেলা করেন। নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়া সুবোধ গৃহত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরে প্রস্থান করে; এবং সাবিত্রী স্বামিগৃহের পার্শ্বে এক পর্ণকুটীরে অত্যন্ত ক্লেশে দিন যাপন করেন। ইতিমধ্যে একদিন দ্বিতীয়া স্ত্রী চন্দ্রলেখা তাঁহার সপত্নীকে মিথ্যা করিয়া বলিলেন যে লক্ষ্ণৌ হইতে তাহার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে। ইহাতে সাবিত্রী হতাশ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং সেই শোকেই অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রলেখা স্বামীকে বশে আনিবার জন্য টোটকা ঔষধ সেবন করান। ইহাতে গবেশের উদরে কোন দুরারোগ্য রোগ হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী সাবিত্রীর মৃত্যুর দিনে তাঁহারও মৃত্যু হয়। সেই দিনই সুবোধ লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া পিতা ও মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, ও তাহারও মৃত্যু হয়।

নাটকটি ছয় অঙ্কে ও কয়েকটি "প্রস্তাব" বা "গর্ভাঙ্কে" বিভক্ত। এই গর্ভাঙ্কগুলি ইংরেজী নাটকের Act ও Scene-এর অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত

অংশ নয়; বরং এক-একটি অঙ্ক শেষ হইলে, এক-একটি গর্ভাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে গর্ভাঙ্ক বিরল হইলেও, সংস্কৃত "গর্ভাঙ্ক" শব্দের বোধ হয় এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। প্রতি অঙ্কের দৃশ্য বা "সংযোগস্থান"[১৯] এইরূপঃ প্রথম অঙ্ক—পুষ্করিণী সমীপে; দ্বিতীয় অঙ্ক—অন্দরের সামান্য পথ, অন্দর মহল; তৃতীয় অঙ্ক—গ্রামের প্রান্তে বটবৃক্ষ সমীপে প্রকাশ্য পথ; চতুর্থ অঙ্ক—গবেশবাবুর শয়নগৃহ, গোলপাতার ঘরের উঠান; পঞ্চম অঙ্ক—গবেশবাবুর বৈঠকখানা; ষষ্ঠ অঙ্ক—গবেশবাবুর বাটীর বহির্ভাগ, গবেশ-বাবুর বাটীর নিকট বৃক্ষের তলা। সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে সূত্রধার ও নটীর দ্বারা আরব্ধ একটি প্রস্তাবনাও আছে।

প্রথম অঙ্কে, গবেশবাবুর প্রথমা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বার বিবাহ সম্বন্ধে পুষ্করিণীর ঘাটে জমীদার বাড়ীর দুই দাসী সাবী ও ভগীর আলোচনা। ইহার গর্ভাঙ্কে, পরে ঘাটে বসিয়া দুই মোসাহেব গবেশবাবুর বিবাহের ইচ্ছা সমর্থন করিতেছে, কিন্তু গ্রামের কোন শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ যুবক সুধীর এরূপ বিবাহের যে কুফল তাহা তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেছে। সুধীরের প্রস্থানের পর দুই মোসাহেব গবেশবাবুকে পরামর্শ দিল যে, তাহার পুত্রের গৃহশিক্ষক হইয়া সুধীরের স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে; সুতরাং এই এই চাকরী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া এবং তাহার যে ব্রহ্মোত্তর জমি আছে, তাহা কাড়িয়া লওয়া হউক। পাড়াগাঁয়ে জমিদার ও মোসাহেবদের চরিত্র-চিত্রণ ভালই হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে, চন্দ্রলেখার সখী ও প্রতিবেশী-গণের নিজ নিজ অবস্থা বর্ণনা করিয়া গদ্যে ও পদ্যে কথোপকথন। ইহার মধ্যে কমলা, অমলা ও বিমলার প্রত্যেকের অনেকগুলি সপত্নী আছে; নির্ম্মলা বিধবা; এবং গবেশবাবুর সদ্যপরিণীতা চন্দ্রলেখার মাত্র একটি সপত্নী। তারপর, গবেশবাবুর প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রীর সহিত এই গ্রাম্যনারীগণের সাক্ষাৎ এবং স্বামীবশীকরণের জন্য তুকৃতাক্ করিতে পরামর্শ দান। তৃতীয় অঙ্কে, গ্রাম্য ও নাগর নামক গ্রামবাসী ও নগরবাসী দুই যুবকের বাক্যালাপ বেশ কৌতুক-জনক। রায়েদের বাড়ীতে বহু-বিবাহ-নিবারিণী সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়া নূতন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নাগর বহুবিবাহ,

---

১৯ 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকে, ইংরেজী scene অর্থে 'সংযোগস্থল' ব্যবহৃত হইয়াছে; "ভানুমতী-চিত্তবিলাসে' এই অর্থে 'অঙ্গ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে Act ও Scene অর্থে 'কাণ্ড' ও 'অঙ্ক' শব্দ পাওয়া যায়।

ইংরেজী শিক্ষার ফলাফল, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় লইয়া পথে গ্রাম্যের সহিত আলাপ করিতেছে। নাগরের ভাষা ইংরেজী ও বাঙ্গালার অদ্ভুত খিচুড়ী ; গ্রাম্যের কুশল প্রশ্নের উত্তরে নাগর বলিতেছে—

"হাঁ, এখন আমার হেল্‌থ মচ্‌ ইমপ্রুব্‌ড বটে, কিন্তু অনেকদিন এবার কলিকাতায় ছিলেম, টৌনের ভিতরটা নাকি বড় ডার্টি, তাতে তত ষ্ট্রং ফিল্‌ কচ্যিনে। তা ভাই তুমি একটু ওয়েট্‌ কর, আমার একটি ফ্রেণ্ড আস্‌বে, দেখি আস্‌চে কি না।"

তারপর ইহাদের যে আলাপ হইল, তাহা হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

(তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৫১-৫৫)—

"নাগর। না ভাই তিনি এখনো এলেন না, আমি থিঙ্ক করি, তার সে ভেঞ্চর এখনো হ্যাং কচ্যে ; তা চল যাই আমরা খানিক ওয়াক্‌ করি গে। (কিঞ্চিদ্‌গমন)।

গ্রাম্য। তা ভাই বল দেখি, কলিকাতার নূতন খবর কি শুনি।

নাগর। কলিকাতার নিয়ুস্‌ এখন সকলি নিয়ু—অফ কোর্ষ, টাইম যত ফিচ্চে তত সকল বিষয়েরই চেঞ্জ দেখা যাচ্যে, তা ভাই না হলেই বা ইণ্ডিয়ার ভাল কিসে হবে ?

গ্রাম্য। (হাস্য করিয়া) তোমার আপনার কথার অর্থ আপনি বুঝলে।

নাগর। কেন ?

গ্রাম্য। কি করো্য বুঝবো ? আমি তো ইংরেজি পড়িনি—তুমি যে মাঝে মাঝে একটি ইংরেজির বুকনি দিচ্য।

নাগর। হাঁ, আমরা বাঙ্গালা কথার মধ্যে দুএকটি ইংরেজি কথা ইয়ুজ করে থাকি—আমাদের ওরূপ হ্যাবিট্‌ বটে।

গ্রাম্য। ঐ আবার হলো—ভাই বাঙ্গালি ধুতি চাদর পর্যে একটি ইংরেজি টুপী মাথায় দিলে যেমন হাস্যাস্পদ হয়, বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে ইংরেজি কথা দুএকটা প্রবেশ করালেও সেইরূপ হয়ে ওঠে, ও বড় খারাপ।

নাগর। হাঁ তা বটে, তা তোমারো তো হচ্যে, তুমি তসোর কাপড় পর্যে পৈতে গলায় দে, ফোঁটা কর্যে, আবার মধ্যে মধ্যে দাড়িতে হুর রাখ্‌চ যে ? খবর, খারাপ, এ সকল ফার্শি বুলিও তো তুমি বাঙ্গালায় ফোড়ন দিচ্য।

গ্রাম্য। হাঁ বিলক্ষণ উত্তর দিলে। ঐ দেখ ওটা কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে।

নাগর। আমাদেরই কি প্রাক্‌টিশ্‌—মন্ অভ্যাস হতে নাই? আর তাও বলি যুটিয়ে উঠিতে পারিনে কি করি।

গ্রাম্য। যোটে নাই বা কেন?

নাগর। বিদ্যা কৈ ভাই? সেই গুরু মোশায়ের পাঠশালে শটুকে পড়্যেই শটুকে পড়িচি, বাবা বল্‌লেন আর কেন—বাঙ্গালায় কাজ কি? ইংরেজিতে পয়সা আছে, বল্যে ইস্কুলে ভরতি করে্য দিলেন। কি করবো, বাঙ্গালা তো ছেড়ে যেতে দেবেন না—তা বাঙ্গালা কেন ছাড়ালেন তা তিনিই জানেন।

গ্রাম্য। ঐ তো আমাদের দোষ, মাতৃভাষা শিক্ষা না করে্য অন্যভাষা শিক্ষা করা এ আর কোথাও নাই। আর তোমাদেরও ভাই ইংরেজিতে বিলক্ষণ ভক্তি জন্মেচে, বাঙ্গালা জেনেও ইংরেজি বল্‌তে তোমরা ভা লবাসো।

নাগর। তাও সত্য কথা। তা বল্‌বো না কেন? আমরা তো বহুরূপী হরবোলার জাত, যা দেখি তাই শিখি। দেখ যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন সেই ব্যবহারই করেচি, সংস্কৃত কথা বল্‌তেম, কুশাসনে বস্‌তেম, ধুতি চাদর পরতেম, পরে যবনদের অধিকারে ফার্শিতে অনুরক্ত হয়েছিলেম, গদি, তাকিয়ে, মশলন্দ, আলবলা, গুড়গুড়ি এ সকল ব্যবহার, স্ত্রীলোকদের গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করে্য রাখা তদবধিই তো আমাদের চল্যে আস্‌চে, এখন আবার ইংরেজের অধিকার, এখন চ্যার, চুরোট, চাম্‌চে কেন না চল্‌বে? ইংরেজি ভাষায় প্রতি শ্রদ্ধাই বা কেন না হবে? আরো একটা কথা বলি বিবেচনা করো, ভাষান্তরের সঙ্গে যোগ না হলে ভাষা বৃদ্ধিও পায় না।

গ্রাম্য। হাঁ ভাই, সে কথা আমি মানি, কিন্তু তাতে একটি কথা আছে, বাঙ্গালাতে যে সকল কথা নাই, ইংরেজি থেকেই হোক্, আর অন্য ভাষা থেকেই হোক, সে সব কথা নিয়ে ভাষা-শরীর পরিপুষ্ট করা উচিত, কিন্তু তা বল্যে, যা বাঙ্গালাতে আছে, তার পরিবর্ত্ত করে্য ভাষান্তরীয় কথা ব্যবহার কেন? বাবা না বল্যে ফাদর বল্যে ডাকলে কি ভাল শুনোয়?

নাগর। হাঁ, সেটি অন্যায় বটে।

গ্রাম্য। নাগর, ভাল ভাই, এখন তো তুমি বেশ উত্তম বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কচ্চো।

নাগর। তাতো পূর্ব্বেই বলেচি, আমরা যে নিতান্ত বাঙ্গালা জানিনে

তা নয়, তবে কিনা ইংরেজি আয়ত্ত অধিক, আর কিছু ভক্তিও থাকবে। তা তুমি ইংরেজি জান না তোমার সঙ্গে সাবধান হয়ে কৈত্যে হচ্যে।”

তারপর কোন তোষামোদকারী ব্রাহ্মণ চিত্ততোষ আসিয়া, 'জামাই-বারিকে'র পদ্মলোচনের দুই স্ত্রীর হস্তে চোরের লাঞ্ছনার অনুরূপ একটি গল্প বলিল। তাহারা চলিয়া গেলে, কৌতুক নামে কোন অনূঢ় যুবক ও রসময়ী গোয়ালিনীর রসিকতা; আধুনিক রুচিসম্মত না হইলেও কৌতুকজনক। রসময়ী তন্ত্রমন্ত্র জানে, এবং গবেশবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী চন্দ্রলেখাকে স্বামী-বশীকরণের ঔষধ শিখাইতেছে। 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের ডাকিনীদের মন্ত্রের মত, ঔষধকরণের ছড়াটি এইরূপ—

"বেঙের মাথার ঘিয়ে, প্রদীপ তাহে জ্বালিয়ে, মড়ার মাথার খুলি, তাহে কাজল তুলি, ত্রিমাত্রা পথের ধূলি, নৌকার জলেতে গুলি, পানের শিকড় পেলে, নখে তা ছিঁড়িয়ে তুলে, কনক ধুতুরা ফুল, হিরাকশি শতমূল, গোময়ের ঠুলি কর্যে, এ সকল তাতে পুর্যে, পুড়িয়ে করিয়ে ছাই, ভাই আমি যা মনে করি তাই পাই।"

এরূপ ঔষধ সেবন করিয়া, বশীভূত না হইয়া গবেশবাবু যে রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের কথা নয়!

এই অঙ্কের গর্ভাঙ্কে, সমাজসংস্কারে উদ্যোগী সুধীর ও কলহপ্রিয় ভণ্ড দলপতি দন্তাচার্য্যের সাক্ষাৎ। তৎপরে সুধীরের সহিত সুবোধের সাক্ষাৎ এবং সুবোধের পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রার উদ্যোগ। চতুর্থ অঙ্কে, দুই সখী চন্দ্রকলা ও চপলার নিকট সপত্নী-নির্য্যাতনে স্বীয় দক্ষতা সম্বন্ধে চন্দ্রলেখার অহঙ্কার। পরে সাবিত্রীর গোলপাতার ঘরের সম্মুখে গিয়া চন্দ্রলেখা তাঁহাকে সুবোধের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিলেন। তাহাতে সাবিত্রীর মূর্চ্ছা, বিলাপ ইত্যাদি। পঞ্চম অঙ্কে, তোষামোদকারী চিত্ততোষ আসিয়া অসুস্থ ও অসুখী গবেশবাবুকে জানাইল যে, জমীদারগৃহে বাস করা তাহার পক্ষে আর সম্ভব নয়, কারণ চন্দ্রলেখার যে ঝাঁটা এতদিন গবেশবাবুর জন্য মজুত ছিল, এখন তাহা মাঝে মাঝে চিত্ততোষের পৃষ্ঠে পড়িতেছে, কারণ চিত্ততোষ সাবিত্রীর দুঃখে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিল। দুর্ব্বলচিত্ত গবেশ তাহাকে দশ টাকা ঘুষ দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন সময় অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের রোল আসিল। সাবী দাসী আসিয়া খবর দিল যে সাবিত্রী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। ষষ্ঠ ও শেষ অঙ্কে,

সুধীরের স্বগতোক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে গবেশবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। পরে সুবোধের লক্ষ্ণৌ হইতে হঠাৎ প্রত্যাগমন এবং সুধীরের মুখে পিতা ও মাতার মৃত্যুসংবাদে ('নীলদর্পণে' নবীনমাধবের মত) মূর্চ্ছা, বিলাপ ইত্যাদি।

এইরূপ সামান্য গল্পের মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া বহুবিবাহ প্রভৃতির কুপ্রথার দোষোদ্‌ঘোষণই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যমূলক রচনার যাহা কিছু দোষ, তাহা এই নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্যমূলক রচনা মাত্রই মন্দ নয়; কিন্তু উদ্দেশ্যটি যদি নাট্যকলা অপেক্ষা গ্রন্থকারের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে, তবে নাটকটি প্রবন্ধের সমষ্টিতে পরিণত হয়। 'নবনাটকে'ও তাহা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে—"এ নবনাটুকে দেশে নব-নাটকের অপ্রতুল কি? কত চটকওয়ালা নাটক এখন দিন দিন হয়ে উঠ্‌চে।" কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য—"কোনও সদুপদেশপূর্ণ বিশুদ্ধ নাটক প্রকাশ করা"। এই উপদেশ দিবার ইচ্ছা তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়। সেই জন্য বহু স্থলে অনেক চরিত্রের মুখে লম্বা লম্বা বক্তৃতা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, নাটকের শেষে নটী ও সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া দর্শকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন:

"সভ্য মহোদয়বর্গ! আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখ্‌লেন, অভিনয়ে গবেশবাবুর দুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথায় অনুমোদন করবেন। ও দুষ্প্রথা আর রাখতে চাবেন? যাতে ঐ নানাদোষকর ঘৃণিত দুষ্প্রথা দেশ হইতে দূরীভূত হয় তদ্বিষয়ে আপনারা কি কিছু যত্ন করবেন না? যদি করেন, আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্থকার কৃতার্থ হন, এবং যে সকল মহোদয়ের উদ্যোগে এই নাটক প্রস্তুত হয়ে অভিনীত হলো তাঁরাও কৃতার্থ হন।"

গ্রন্থকার কৃতার্থ হইলেও, কতদূর এই নাটকের দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা এ দেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এ বিষয়ে নাটকখানির সুফল স্বীকার করিয়া লইলেও, শুধু নাটকহিসাবে দেখিলে ইহার সফলতা খুব বেশী নয়। গ্রন্থকারের সহজ নাট্যপ্রতিভা তাঁহার রচনাকে অনেক দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে সত্য, এবং তৎকালীন সমাজের রঙ্গচিত্র হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইহা নাটক হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে, এই নাটক দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের ছয় বৎসর

পরে রচিত[২০] এবং শেষোক্ত নাটকের দ্বারা ইহা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। 'নীলদর্পণ' নাটকের melodrama বা sentimental sensationalism, শোকাবহ ঘটনার আতিশয্য, এবং মধ্যে মধ্যে পয়ারের আবির্ভাব প্রভৃতি লক্ষণ অনেক পরিমাণে এই নাটকে আছে; কিন্তু নীলদর্পণকারের নাট্যকৌশল ও চরিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা ইহাতে নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেক চরিত্র কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের জন্য বা কোন প্রথার দোষ প্রদর্শনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। মানবচরিত্রের ও জীবনের অভিজ্ঞতা গ্রন্থকারের যথেষ্ট ছিল, এবং সেই জন্য কতকগুলি চরিত্র-চিত্র ভালই হইয়াছে; যেমন বিধর্ম্মবাগীশ, চিত্ততোষ, নাগর, রসময়ী গোয়ালিনী ইত্যাদি। পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও তাহার খোসামুদে অনুচরদ্বয়, গ্রাম্যঘোঁটের অগ্রণী কলহশীল ভণ্ড দলপতি প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কন বেশ সুস্পষ্ট ও কৌতুকজনক হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীচরিত্র-অঙ্কনে দক্ষতা দেখা যায় না, এবং প্রধান চরিত্রগুলি বিশেষত্বহীন ও বৈচিত্র্য-বর্জ্জিত। সেগুলি কোনও দোষগুণের সাধারণ type বা প্রতীকস্বরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, রক্তমাংসের বিশিষ্ট জীব বা individual হয় নাই। 'কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব' নাটকেও এই দোষ আছে; কিন্তু 'নবনাটকে' ইহা সুস্পষ্ট। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামকরণ হইতেই গ্রন্থকারের এই উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। যথা, গবেশ—গ্রাম্য জমীদার; সুধীর—সুপণ্ডিত; গ্রাম্য—পাড়াগেঁয়ে লোক; নাগর—নগরবাসী; চিত্ততোষ—তোষামোদকারী; বিধর্ম্মবাগীশ—পাণ্ডিত্যাভিমানী অধার্ম্মিক; দম্ভাচার্য্য—দাম্ভিক ভণ্ড দলপতি ইত্যাদি। নামগুলি চরিত্রের গুণ বা দোষজ্ঞাপক label স্বরূপ।

কিন্তু একটি বিষয়ে উন্নতি দেখা যায়; সেটি সরল নাট্যোপযোগী ভাষার প্রয়োগ। 'নব-নাটকের' কিছু পূর্ব্বে প্রকাশিত তারকচন্দ্র চূড়ামণির বহুবিবাহ বিষয়ক 'সপত্নী নাটক'এর[২১] ভাষা, ভাব ও ভঙ্গীর সঙ্গে তুলনা করিলে, এ সম্বন্ধে

২০ কোন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলা ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধে চিত্ততোষ বলিতেছে (তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৬০) "তার বাঙ্গলা শুনল্যে নীলদর্পণ নাটক মনে হয়।"

২১ এই নাটকের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার পরিচয়-পত্র এইরূপ: সপত্নী নাটক। প্রথম ভাগ। জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের আদেশে শ্রীতারকচন্দ্র চূড়ামণি প্রণীত। কলিকাতা। ভাস্করযন্ত্রে শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তি দ্বারা মুদ্রিত। সংবৎ ১৯১৪। পত্রসংখ্যা ১-১৪৮। গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে "উত্তরপাড়া ২৪ পৌষ ১২৬৪" এইরূপ তারিখ আছে। বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে, 'ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই

রামনারায়ণের কৃতিত্ব কত বেশী, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যদিও 'নবনাটকে' পয়ারাদি ছন্দে দু'এক স্থলে পদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে[২২] সেগুলির পরিমাণ বেশী নয়। এগুলি প্রায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে স্ত্রীলোকদিগের কথোপকথনে কিংবা দম্ভাচার্য্যের গ্রাম্য দলাদলির বর্ণনায় দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষা স্বাভাবিক, প্রাঞ্জল ও লঘু।

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে গ্রন্থের একটি সংস্কৃত নান্দী আছে, যথা—

সজ্জনপরিতোষনিদানং সুললিতরসনবনাটকপানং।
কর্ত্তুং বাঞ্ছতি ভবদবধানং ক্ষণমিহ ময়ি কুরু করুণাদানং॥

তারপর সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার অনুরূপ সূত্রধার ও নটীর আলাপ। এই নাটকে তিনটি গান আছে; তাহার মধ্যে একটি প্রস্তাবনায় নটীর দ্বারা গেয় ও জয়দেবের অনুকরণে সংস্কৃতে লেখা; যথা—

মলয়নিলয়পরিহারপুরঃসরদূরসমাগমধীরে,
বিকচকমলকুলকলিকাপরিমলবাহিনি বহতি সমীরে।
বহুপরিণায়কনাথবধূরবসীদতি সপদি শরীরে,
জলদতিবিরহকৃশাণুকৃশা কিল মজ্জতি লোচননীরে॥

প্রথম অভিনয়ের সময় উনবিংশবর্ষবয়স্ক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নটীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া, এই গানটি গাহিয়াছিলেন।

'নবনাটক' অভিনয়ের পর প্রতিভাবান্ নাট্যকার বলিয়া রামনারায়ণের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার পর এক 'রুক্মিণী-হরণ' নাটক ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য অনূদিত নাটকের মত, 'মালতী-মাধব' নাটকও উল্লেখযোগ্য, কিন্তু পরবর্ত্তী পৌরাণিক নাটক ও প্রহসনগুলিতে তাঁহার শক্তির হ্রাস ও অবনতি দেখা যায়।

পুস্তকখানি সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বের' ক্ষীণ অনুকরণে রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটিকার উপাখ্যান-ভাগ গদ্যে সঙ্কলিত করিয়া তারকচন্দ্র চূড়ামণি, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, উত্তরপাড়ার জমীদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রকাশিত করেন।

২২ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত নাটকগুলিতে মাইকেল পয়ারাদি ত্যাগ করিয়াছেন, এবং পদ্মাবতী (১৮৬০) নাটকের এক স্থলে অমিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে দীনবন্ধু তাহা করেন নাই।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবু (পরে মহারাজা স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পাথুরিয়াঘাটা ভবনে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। ইহাতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তাঁহার স্বরচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক[২৩] প্রথম ও ১৮৬৬ সালের ৬ই জানুয়ারী দ্বিতীয় বার অভিনীত হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র এই রঙ্গমঞ্চের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন:—not very spacious, but very beautifully got up......the scenes are singularly well painted, especially the drop-scene, which is ablaze with aloes and water-lilies, and entirely oriental. এই রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের অনূদিত 'মালতী-মাধব', তাঁহার তিনখানি প্রহসন 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল', 'উভয় সঙ্কট' ও 'চক্ষুদান', এবং তাঁহার মৌলিক পৌরাণিক নাটক 'রুক্মিণী-হরণ' অভিনীত হইয়াছিল।

ভবভূতির সুবিদিত সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে লিখিত রামনারায়ণের 'মালতী-মাধব' ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ শে সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-বাড়ীতে অভিনীত হয়, এবং ইহার জন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থকারকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেন। সেই বৎসরই ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়[২৪]। রামনারায়ণ নিজে লিখিয়াছেন যে, এই নাটক উক্ত রঙ্গমঞ্চে প্রায় ১০।১১ বার অভিনীত হইয়াছিল। নামে অনুবাদ হইলেও, রামনারায়ণের অন্যান্য অনূদিত নাটকগুলির মত, ইহাও পরিবর্ত্তনাদি হিসাবে প্রায় নূতন করিয়া লেখা।

---

২৩ ইহার প্রথম সংস্করণ (১০০ খণ্ড মাত্র) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়; কিন্তু ইহা সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই সংস্করণ দেখি নাই। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ, ইণ্ডিয়া আফিসের গ্রন্থাগারে আছে; তাহার তারিখ ১৮৬৫ খ্রীঃ অঃ। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই নাটক উক্ত রঙ্গমঞ্চে পাঁচবার অভিনীত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের, ১৩ই জানুয়ারী গিরিশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রে ইহার সম্বন্ধে এই মন্তব্য দেখা যায়—The play has been purged of the grossness and immorality with which the original of Bharat Chandra was stained. Of its literary merits we cannot say it displays any high effort of the dramatic faculty.

২৪ ইহার পরিচয়-পত্র এইরূপ: মালতীমাধব নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। বাং ১২৭৪। ইং ১৮৬৭।—পত্রসংখ্যা ।৶০+১৭৯। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৮৭৩।

কালীপ্রসন্ন সিংহের অপরিপক্ক অনুবাদ অপেক্ষা, এই রচনা সুপাঠ্য ও সুলিখিত। কালীপ্রসন্নের রচনার সঙ্গে তুলনার জন্য ইতিপূর্ব্বে এই নাটক হইতে একটি অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে তুলিয়া দিয়াছি, সুতরাং এখানে অন্য নমুনা পুনরায় উদ্ধৃত করিবার দরকার নাই। গর্ভাঙ্কে বিভক্ত পাঁচটি অঙ্কে এই নাটক সমাপ্ত, এবং বনোয়ারীলাল রায় নামক কোন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ইহার গানগুলি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। গানের নমুনা এইরূপ—

খাম্বাজ। খেমটা।

গেলো প্রাণ রে স্বজনি তাঁরে সঁপে প্রাণধন।
পরের বেদনা পরে তো তা জানে না, তবু বোঝে না অবোধ মন।
ছিল যে বাসনা, সফল তা হলো না, সুহৃ হতে হলো জ্বালাতন॥

রামনারায়ণের তিনখানি প্রহসনের[২৫] একটিও সুরচিত নয়। অন্যান্য নাটকে তাঁহার যে স্বাভাবিক রসিকতা ও রঙ্গচিত্র-অঙ্কন-ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রহসনগুলিতে তাহার কিছুই নাই। plot বা আখ্যানভাগ নির্ম্মাণে রামনারায়ণ কোন কালেই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; এগুলিরও আখ্যানভাগ যৎসামান্য ও বৈচিত্র্যহীন। নাটকচ্ছলে সৎশিক্ষা দেওয়া সবগুলিরই স্পষ্ট উদ্দেশ্য। 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল' বোধ হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম সংস্করণের কাপি আমরা দেখি নাই; দ্বিতীয় সংস্করণের তারিখ ১৮৭২ (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৫)। কোন বৃদ্ধ ও বুদ্ধিহীন মুন্সেফ, স্বীয় বার্দ্ধক্যসত্ত্বেও, নিজকে তরুণ মনে করিয়া, কোন প্রতিবেশীর সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর সহিত প্রেম করিতে গিয়া কিরূপ জব্দ হইয়াছিলেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রহসনখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। 'উভয়-সঙ্কট' বহুবিবাহ-বিষয়ক, ২৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, আরও ক্ষুদ্রকায় প্রহসন। কিছুই বিশেষত্ব নাই; 'নব-নাটক' ও 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'

---

২৫ এই প্রহসনগুলি সাধারণতঃ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামেই চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহা ঠিক নয়। রামনারায়ণও স্বয়ং তাঁহার আত্মকথায় লিখিয়াছেন—"এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুর্দান নামে আরও তিনখানি প্রহসন, অর্থাৎ হাস্যরসব্যঞ্জক ক্ষুদ্র নাটক, প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের (যতীন্দ্রমোহনের) নিকট যথাযোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি, সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার করিয়া তাঁহারই বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।" মুদ্রিত পুস্তকের পরিচয়-পত্রে রামনারায়ণই গ্রন্থকার বলিয়া দেওয়া আছে।

নাটকের পর ইহার রচনা নিষ্ফল। ইহা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (=১২৭৬ সালে) কলিকাতায় উক্ত ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে "বন্ধুদিগের বিতরণার্থে" মুদ্রিত, এবং বোধ হয় সেই বৎসরই অভিনীত হয়। 'চক্ষুদান'ও এইরূপ ২৬ পৃষ্ঠায় ও তিন অঙ্কে সমাপ্ত ক্ষুদ্র প্রহসন। মাতাল, বেশ্যাসক্ত ও তোষামোদকারীর করতলগত স্বামী নীলকান্তকে তাহার চতুরা স্ত্রী অবলা কিরূপে সৎপথে আনিয়াছিল, তাহাই ইহার সামান্য ও বৈচিত্র্যবর্জ্জিত গল্পাংশ। ইহারও প্রথম সংস্করণ (ইং ১৮৬৯= বাং ১২৭৬) "বন্ধুদিগের বিতরণার্থে", সাধারণের জন্য মুদ্রিত হয় নাই; কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক অঙ্কের শেষে আছে—'পটপ্রক্ষেপণ সমবেত বাদনম্'। শেষে গানও আছে।

এই সময়ে রচিত রামনারায়ণের আর একখানি নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা মুদ্রিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন—"সুনীতি-সন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে (=১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা কাঁশারীটোলা নিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।"

ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে (=১২৭৮ সালে) রামনারায়ণের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রুক্মিণীহরণ' রচিত ও প্রকাশিত হয়[২৬]। ইহার জন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থকারকে ৫০৲ পুরস্কার দেন এবং বহুবার স্বভবনে ইহার অভিনয়ের আয়োজন করেন। ইহার প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৭২। "রায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর"এর উদ্দেশ্যে নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা এই নাটকের উৎসর্গ করা হইয়াছে—

হাটককর্ণাভরণং নাটকমিদং রুক্মিণীহরণাখ্যম্।
কুরুতাং কৃপয়া কর্ণে ভবদভ্যর্ণে সমর্পয়ামি॥

নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক ও আটটি গর্ভাঙ্ক আছে। পাঁচটি গানও দৃষ্ট হয়। গল্পাংশ এইরূপ। প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে, যুবরাজ রুক্মী পাশা খেলিতেছেন,

২৬। রুক্মিণী হরণ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৭৮ সাল।—পত্রসংখ্যা ৴০+৭৭। ইহার যে উৎসর্গপত্র আছে, তাহার তারিখ এইরূপ —কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ভাদ্র ১২৭৮।

এমন সময় বৃদ্ধ রাজা আসিয়া, নারদের উপদেশ অনুসারে কৃষ্ণের সহিত স্বদুহিতা রুক্মিণীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু রুক্মীর ইহাতে মত হইল না, কারণ সে অন্য বর ঠিক করিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে, রুক্মিণী কাব্যের নায়িকার মত, কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে সগদ্‌গদ, এবং কিছুক্ষণ যাত্রার ধরণে হাহুতাশ করিয়া, পরে ধনদাস নামক কোন তোত্‌লা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় প্রেমপত্র দিয়া দূতস্বরূপ পাঠাইলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে, নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে বিবাহের উপদেশ দিলেন; কিছু পরে, রুক্মিণীর চিঠি লইয়া তোত্‌লা ধনদাসের প্রবেশ ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার আদর অভ্যর্থনা। যথা—

"(আহার সামগ্রী লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ ও তৎপ্রদান)

কৃষ্ণ। আহার করুন আপনি।

ধন। (দেখিয়া পরমাহ্লাদে) ইঃ! এ-এত সামগ্রী। (একবার ঘটীর প্রতি দৃষ্টিপাত) বলি এত সামগ্রী তো আ-আমি খে-খেতে পারবো না।

কৃষ্ণ। পারবেন বৈ কি, সব খেতে হবে।

ধন। (হৃষ্টচিত্তে) সব খেতে হবে, তাই তো, এত কি খেতে পারবো; (স্বগত) তোলাটা কিছু অসভ্যতা, তা হোক্, দেখ্‌তে না পেলেই হলো, ও যখনি অন্যদিকে চাবে, তখনি ঘটীর মধ্যে ফেল্‌বো। (ভোজনারম্ভ) ব-বলি এটা কি?

কৃষ্ণ। ওটা চন্দ্রপুলী।

ধন। চন্দ্রপুলী! ঠিক কথা, কেমন চ-চন্দ্রের ন্যায় আকার। (স্বগত) আহা এ চন্দ্র ব্রাহ্মণীর মুখমণ্ডলে উদয় হলো না, কেবল এই রাহুগ্রাসে পড়্‌লো। (প্রকাশ্যে) এদিগে অল্প রাঙা রাঙা শা-শালগ্রামের আকৃতি এ-এগুলি কি?

কৃষ্ণ। ওর নাম রসগোল্লা।

ধন। র-রসগোল্লা কি একেই ব-বলে? (ভক্ষণ করিয়া) উঃ! এতে এত রস, এমন সুরস সামগ্রী তো কখনও খাওয়া যায় নাই। (স্বগত) রসগোল্লা, আমার মুখে এ রস কেবল গোল্লাই হয়ে গেল, ব্রাহ্মণীকে তো দিতে পাল্যেম না।

কৃষ্ণ। খাউন না; এগুলি খাউন দেখি, এ মনোহরা, এগুলি মনোরঞ্জন।

ধন। আহা কি সু-সুন্দর নামগুলি, শু-শুনলেই কর্ণ জু-জুড়ায়, আর খেলে পেট জুড়োবে তার আর আ-আশ্চর্য্য কি! (স্বগত) আর তো খাওয়া

যায় না। পোড়াকপাল! এমন সব সামগ্রী রুচবে কেন, তা যা থাকে অদৃষ্টে, ব্রাহ্মণীর জন্য এমন অপূর্ব্ব সামগ্রী কিছু নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু তুলতে গেলে যদি দেখ্‌তে পায়! আঃ—তা পেলেই বা, ব্রাহ্মণের ও স্বভাব আছে সকলেই জানে, তবে পাছে দ্বারপাল বেটারা ঘটীটে ধরে টানাটানি করে? তা কি পারবে?—না! ভাল, দেখাই যাক্ না।......"

তৃতীয় অঙ্কে, গুরুজন কর্ত্তৃক বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে আদিষ্টা রুক্মিণী, উৎকণ্ঠিতা নায়িকার মত, ধনদাসের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ধনদাস আসিয়া খবর দিল যে কৃষ্ণ শীঘ্রই আসিতেছেন। ধনদাসের গৃহপ্রত্যাগমন বর্ণনায় রামনারায়ণ হাস্যকর চিত্র-অঙ্কন-ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কে, শ্যামা ও সোনা নামক দুই দাসীর মুখে রুক্মিণীর বিবাহের সংবাদ। পরিজনবেষ্টিতা রুক্মিণী যে-সময় অম্বিকার মন্দির হইতে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন, সে-সময় হঠাৎ কৃষ্ণ ব্যোমযান হইতে অবতরণ করিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে যুদ্ধও হইয়াছে। এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি কৌতুকজনক, এবং ইঁহাতে রামনারায়ণের রসিকতা ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃশ্যে রুক্মী, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব ও বিদূরথ কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুদ্ধে লাঞ্ছিত ও আহত হইয়া কাপুরুষোচিত শূন্য আস্ফালন ও নিষ্ফল ক্রোধের বাগাড়ম্বর করিতেছেন। পরে নারদের উপদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে আগামী রাজসূয় যজ্ঞের সময় কিরূপে এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়া যায়, তাহারই জল্পনা-কল্পনায় দৃশ্য শেষ হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে, কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মিলন; নারদের একটি কোরাস্‌যুক্ত স্তবগানের দ্বারা নাটকের সমাপ্তি।

নাটকের গল্পাংশে বা তাহার নির্ম্মাণে তাদৃশ বৈচিত্র্য নাই; এবং প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বিদূষকস্থানীয়, আধুনিক পেটুক ও ছাঁদাবাঁধা ব্রাহ্মণের প্রতীক-স্বরূপ এক তোত্‌লা ধনদাস ভিন্ন কোন চরিত্রই তেমন ভাল ভাবে ফুটে নাই। তবে নাটকটির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ভাষা বেশ সহজ ও সরস, এবং ইহার পরিকল্পনায় একটি হাস্যরস-সমুজ্জ্বল মনোরম নূতনত্ব রহিয়াছে। চরিত্রগুলি প্রাচীন, পুরাণপ্রসিদ্ধ ও পূজাস্থানীয় হইলেও, আধুনিক সময়ের সাধারণ জীবন্ত মানুষের মত প্রায় প্রত্যেকটি সৃষ্ট হইয়াছে, এবং anachronism বা স্থান-কালের অনৌচিত্যের প্রতি বিরাগ নাট্যকারের নাই বলিলেও চলে। নারদের কোরাস্‌-গানে যোগদান ছাড়া, কৃষ্ণ যে সেকালে চন্দ্রপুলী, রসগোল্লা, মনোহরা ইত্যাদির দ্বারা অতিথিসৎকার

করিতেন, এ কল্পনাও মনোরম। এমন কি, তিনি নারদকে বলিতেছেন, আমি কালো, আমায় কে মেয়ে দেবে। ব্যোমযান হইতে নামিয়া রুক্মিণীকে লইয়া পলায়ন, আধুনিক চলচ্চিত্রের এরোপ্লেন elopement এর মত শুনায়। কৃষ্ণ রুক্মীকে শুধু পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই, তাহার মাথা মুড়াইয়া অপমানের চূড়ান্ত করিয়াছেন। কতকগুলি ভাবগদ্‌গদ বা গম্ভীর দৃশ্য ছাড়িয়া দিলে, সমস্ত নাটকটি 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'-রচয়িতার লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে।

রামনারায়ণ আরও কতকগুলি পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এবং এক 'স্বপ্নধন' ছাড়া অন্য কোন নাটক কোথাও অভিনীত হয় নাই। দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নবীন নাট্যকারগণের অভ্যুদয় ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনল থিয়েটার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণের প্রতিপত্তি অনেক কমিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী রচনাগুলির নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় না। তখন পৌরাণিক নাটক-রচনার একটি যুগ আসিয়াছিল; সে যুগ তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' (১৮৫২), হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব-বিয়োগ' (১৮৪৮), ও মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' (১৮৫৮) হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর গিরিশচন্দ্র ও হাতনাগাদ ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। দুর্গাদাস করের দ্রৌপদী-বস্ত্র-হরণ বিষয়ক 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নাটক (১৮৬৩), কালিদাস সান্যালের 'নলদময়ন্তী' (১৮৬৪)[২৭], উমেশচন্দ্র মিত্রের 'সীতার বনবাস' (১৮৬৬)[২৮] এবং মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' (১৮৬৭), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৪)[২৯] প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক এই সময় রচিত হইয়াছিল। সুতরাং স্বীয় প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য, সংস্কৃত নাটকের অনুবর্ত্তন ও সামাজিক চিত্র অঙ্কন ছাড়িয়া দিয়া, রাম-নারায়ণ যে পৌরাণিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করিবেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু 'রুক্মিণী-হরণ' ভিন্ন, তাঁহার অন্য পৌরাণিক নাটক তেমন সফল হয় নাই।

রামনারায়ণের 'কংসবধ' ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (= ১২৮২ সালে)[৩০] যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উক্ত রঙ্গমঞ্চের জন্য রচিত ও উক্ত ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল,

২৭ গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাগবাজার নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত।

২৮ ভবানীপুর নীলমণি মিত্রের বাটীতে অভিনীত।

২৯ বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত।

৩০ কংসবধ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা।

কিন্তু কখনও কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। নাটকের নামেই ইহার কথাবস্তুর পরিচয়; কিন্তু ৭২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই অনতিবৃহৎ নাটকে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। রামনারায়ণও তাঁহার আত্মকথায় ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। সেই বৎসরই (১৮৭৫) হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত, তাঁহার 'ধর্ম্মবিজয়' নাটকও প্রকাশিত হইয়াছিল[৩১] কিন্তু ইহাও যে কলিকাতার কোন স্থানে অভিনীত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না, এবং রামনারায়ণের আত্মকথাতে ইহারও উল্লেখ নাই। অন্য কোন বিশেষত্বের দাবী না করিলেও, ইহার প্রস্তাবনায় সূত্রধার নটীকে বলিতেছে—"অন্যান্য রসঘটিত নাটক এখন সর্ব্বত্রই চল্‌চে, শান্তরসের নাটক দেশভাষায় অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই, এটি নূতন!" কিন্তু এটি ঠিক নূতন নয়। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি নাটকের অনুবাদ ছাড়িয়া দিলেও, ঠিক এই সময় হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান লইয়াই মনোমোহন বসুর পূর্ব্বোল্লিখিত নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ধর্ম্ম-বিজয়' নাটকের নাট্যবস্তু নির্ম্মাণে নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা থাকিলেও বৈচিত্র্য নাই, এবং মোটামুটি ইহা রামনারায়ণের অন্যান্য নাটকের মত সুলিখিত নয়। সর্ব্বকার্য্যের বিঘ্নকারক বিঘ্নরাট্ ও বিদ্যাত্রয়-সিদ্ধির পরিকল্পনা চণ্ডকৌশিক হইতে গৃহীত। যবনধর্ম্মী দুষ্প্রতাপ, পাপপুরুষ প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টিতে নূতনত্বের চেষ্টা আছে, কিন্তু এক শ্মশানদৃশ্য ভিন্ন কোন দৃশ্যই মনোরম হয় নাই। বিশ্বামিত্রকে একটি খিটখিটে সাধারণ রাগী বামুনের মত করিয়া গড়া হইয়াছে। ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিকের প্রভাব সুস্পষ্ট[৩২]।

ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮২ সাল।

৩১ ধর্ম্মবিজয় নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। হরিনাভি বঙ্গনাট্য সমাজের সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।" হরিনাভি। ইষ্টইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮২। পত্রসংখ্যা ৪+১১৪। প্রকাশককে গ্রন্থকার গ্রন্থসত্ব ১০ই ভাদ্র ১২৮২ সালে বিক্রয় করিয়াছেন, এইরূপ লিখিত আছে।

৩২। যে কলেজের সহিত রামনারায়ণ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে (=সংবৎ ১৯২৪) এই সংস্কৃত নাটকের একটি সংস্করণ কাব্যপ্রকাশ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণশাস্ত্রী গুর্জ্জর কর্ত্তৃক ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই নগরে ইহা প্রথম মুদ্রিত হইলেও, বাংলা দেশে এই নাটকটি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। জগন্মোহনের সংস্করণ নিশ্চয়ই রামনারায়ণের অগোচর ছিল না।

কতকগুলি গান আছে, সেগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থের শেষে দেওয়া হইয়াছে। এই গানগুলির জন্য প্রকাশক, শ্রীযুক্ত কালীকুমার চক্রবর্ত্তী ও কালীনাথ সান্যালের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এগুলি গ্রন্থকারের রচিত নয়, প্রকাশকের দ্বারা পরে অভিনয়ের জন্য সন্নিবিষ্ট।

ইহা ভিন্ন, রামনারায়ণ 'ধনুর্ভঙ্গ' নামক একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু তাঁহার আত্মকথায় ইহার কোন উল্লেখ নাই, এবং আমরা এই পুস্তকের সন্ধান পাই নাই। বরং তাঁহার আত্মকথায় রামনারায়ণ লিখিয়াছেন—"কেরলী-কুসুম নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।" এই সময় রামনারায়ণ 'স্বপ্নধন' নামক একটি ক্ষুদ্র নাটক রচনা করেন। ইহা সিমুলিয়া বেঙ্গল থিয়েটরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে (কার্ত্তিক ১২৮০ সালে) অভিনীত হইয়াছিল, এবং উক্ত রঙ্গ-ভূমির সম্পাদক গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রন্থসত্ব ক্রয় করিয়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে (= ১৯৩০ সংবতে) মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন[৩৩]। এই নাটকের নায়িকা কেরল-রাজকুমারী কুসুমলতা। আমাদের মনে হয়, রামনারায়ণ স্বয়ং যে নাটক 'কেরলী-কুসুম' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই 'স্বপ্নধন' নাটক। যখন রামনারায়ণ তাঁহার আত্মকথা লিখিয়া রাখেন, তখনও বোধ হয় এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় নাই[৩৪]। পরে 'কেরলী-কুসুম' এই নাম বদলাইয়া 'স্বপ্নধন' এই নূতন নামে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রাচীন কথাসাহিত্যের স্বপ্ন-সন্দর্শন কৌশল অবলম্বন করিয়া 'স্বপ্নধন' নাটক রচিত, এবং ইহার নামকরণ ও কথাবস্তুর কল্পনা এই মূল ঘটনা লইয়া। বিদর্ভদেশের রাজপুত্র মতিমান ও কেরলদেশাধিপতির একমাত্র কন্যা কুসুমলতা পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিয়া পরস্পরের প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন। মৃগয়ার সময়

৩৩। স্বপ্নধন নাটক। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি হইতে প্রকাশিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। কলিকাতা সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮। সম্বৎ ১৯৩০। মূল্য আট আনা।—উক্ত রঙ্গভূমির সম্পাদক লিখিত ইহার বিজ্ঞাপনের তারিখ—সিমুলিয়া। কার্ত্তিক ১২৮০।

৩৪। তাঁহার আত্মকথার শেষে রামনারায়ণ লিখিয়াছেন: "বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি"। এই সংস্কৃত গ্রন্থ ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহার আত্মকথা এই সালেই লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। বোধ হয় এই কারণেই আত্মকথায় 'কংসবধ' ও 'ধর্ম্মবিজয়' নাটকের উল্লেখ নাই।

মৃগানুসরণে পথশ্রান্ত হইয়া, রাজপুত্র বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইয়া এক অপরূপ লাবণ্যবতী রাজকন্যাকে স্বপ্নে দেখেন ; পরে সেইখানে কোন যোগীর নিকট সংবাদ পাইয়া মতিমান অনুমান করেন যে তাঁহার স্বপ্নের ধন কোন কেরল-কুমারী। এদিকে রাজকুমারীও তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া, অনঙ্গপীড়ায় পীড়িত হইয়া মানসিক ক্লেশ ও শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করেন। বনমধ্যে পথভ্রষ্ট কোন সওদাগরকে সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া, রাজপুত্র তাহার গৃহে অতিথি হইয়া, সেইখানে কেরলরাজের পূর্ব্বতন সভাপণ্ডিতের নিকট কেরল-রাজকুমারী ও তাঁহার অসুস্থতার কথা জানিতে পারেন। সে স্থান হইতে ছয় সাত দিনের পথ কেরলদেশে ব্রহ্মচারীবেশে উপস্থিত হইয়া, দৈবক্রমে রাজোদ্যানে রাজকুমারীর কোন সখীর সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া এবং সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া, সেই রাজকুমারীই যে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টা কন্যা, সে বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। পরে কৌশলপূর্ব্বক সেই সখীর হস্তে স্বচিত্রিত সেই স্বপ্নলব্ধ কুমারীর প্রতিমূর্ত্তি রাজকন্যার নিকট প্রেরণ করেন। রাজকুমারীও স্বপ্নদৃষ্ট যুবকের ছবি অঙ্কিত করিয়া সখীর দ্বারা কৌশল-পূর্ব্বক পাঠাইয়া দেন। এই চিত্র-বিনিময়ের পর, কন্যাবেশ ধারণ করিয়া মতিমান, বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী সওদাগর বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সওদাগর স্বীয় কন্যার নিরুদ্দিষ্ট বাগ্‌দত্ত বর আনয়নের জন্য যাত্রার ছল করিরা, রাজার নিকট কন্যাবেশী মতিমানকে অর্পণ করিলেন। এইরূপ রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া, মতিমান রাজপুত্রীর সখীরূপে থাকিয়া, তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক গান্ধর্ব্ব বিবাহে কুসুম-লতার পাণিগ্রহণ করেন। পরে একদিন কুসুমলতার সঙ্গে দীর্ঘিকায় স্নান করিতে গিয়া মতিমান অলক্ষিতে সেস্থান ত্যাগ করেন। কেরলরাজ ব্রাহ্মণ-কন্যাকে জলমগ্না ভাবিয়া মহাচিন্তায় পড়িলেন। এদিকে ভাবী জামাতারূপী মতিমানকে সঙ্গে লইয়া, ব্রাহ্মণবেশী সওদাগর রাজসভায় আসিয়া স্বীয় কন্যা প্রত্যর্পণের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। ছদ্মক্রোধ ও বিষাদে ব্রাহ্মণের ম্রিয়মাণ অবস্থা দেখিয়া শেষে রাজা মতিমানকে খেসারতস্বরূপ কন্যা দান করিয়া ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলেন। বাসরঘরে মতিমান নিজের পরিচয় দিয়া রাজার আশীর্ব্বাদ ও সকলের আনন্দস্রোতে অভিষিক্ত হইয়া কুসুমলতার সঙ্গে মিলিত হইলেন। শেষে নায়ক মতিমানের নিম্নোদ্ধৃত কথার দ্বারা নাটক সমাপ্ত হইয়াছে—

"মতি। তবে আর কি, সৎপাত্রে কন্যা প্রদত্ত হয়েছে বলে মহারাজ সন্তুষ্ট হয়েছেন, স্বপ্নধন লাভ হয়েছে, সুতরাং রাজকন্যা সন্তুষ্ট হয়েছেন; সখীরে! তোমরাও সকলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, এখন সভ্যগণ! এই স্বপ্নধন নাটক দর্শনে আপনারা যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, গ্রন্থকর্ত্তার হাতযশ আর আমার অদৃষ্ট।"

এই নাটক রচনায় গ্রন্থকর্ত্তার যে বিশেষ হাতযশ বা নিপুণতা আছে, তাহা বোধ হয় না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কাহিনীর রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প, স্বপ্নদর্শন, ছদ্মবেশধারণ, চিত্রবিনিময়, কন্যাকে ন্যাসরূপে সমর্পণ, ছদ্মবেশী নায়কের অন্তঃপুর-প্রবেশ প্রভৃতি মামুলী কৌশলের দ্বারা নির্ম্মিত নাট্যবস্তুতে যে শুধু বৈচিত্র্যের অভাব আছে তাহা নয়, স্থানে স্থানে রূপকথার অস্বাভাবিকতাও আছে। কাহিনীহিসাবে গল্পটি মন্দ না হইতে পারে, এবং ভাষাও প্রাঞ্জল, কিন্তু নাটকের পক্ষে এরূপ মালমসলা বিশেষ উপযোগী হয় নাই।

বাংলা নাট্যশালার সামান্য আরম্ভের যুগ হইতে, ন্যাশনল থিয়েটারের স্থাপনের সহিত (১৮৭২) সাধারণ ও স্থায়ী নাট্যশালার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত, রামনারায়ণের সাহিত্যিক জীবন বিস্তৃত। কিন্তু ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রথম যুগেরই পথপ্রদর্শক। তাঁহার সমসাময়িক মাইকেল মধুসূদন ও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী দীনবন্ধু, এই দুইজনই বাংলা নাট্য-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন। ক্রমবর্দ্ধনশীল বাংলা নাটক ও অভিনয়ের ইতিহাস হইতে বুঝা যায় যে, বাংলা নাটক আধুনিক যুগের সৃষ্টি; ও ইহার বিকাশ, বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবের অন্যতম ফল। ঊনবিংশ শতকে বিদেশীয় আদর্শে 'নভেল', 'এপিক' প্রভৃতির মত নাটকেরও প্রচলন হইয়াছিল। নবশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ যে শুধু ইংরেজী নাটকের আস্বাদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা নয়, ইংরেজী রঙ্গমঞ্চে এই সকল নাটকের উত্তম অভিনয় দর্শনের সৌভাগ্যও তাঁহাদের হইয়াছিল। ইংরেজী নাটকের অভিনয় ও অনুশীলনের দ্বারা বাঙালী শিক্ষিত সমাজের রুচি ক্রমশঃ গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং রামনারায়ণের মত ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরও প্রচলিত যাত্রায় অশ্রদ্ধা ও নূতন ধরণের নাটকাভিনয়ে শ্রদ্ধা দেখা যাইতেছিল[৩৫]। ইংরেজী নাটক ও অভিনয়ের প্রভাবে ও আদর্শে নূতন বাংলা নাটক ও অভিনয়ের আরম্ভ হইল। প্রথমে অল্পসংখ্যক নাটক রচিত হইয়াছিল, এবং

৩৪ 'রত্নাবলী'র উল্লিখিত 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

অভিনয় শুধু মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে নির্দ্দিষ্ট দর্শকের জন্য হইত। কিন্তু ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরে বাংলা নাটকের সংখ্যা বহুলপরিমাণে বাড়িয়া গেল, এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গমঞ্চও স্থাপিত হইল।

কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেশীয় আদর্শে সূত্রপাত হইলেও, সংস্কৃত নাটকের প্রভাবে বাংলা নাটক দেশীয় ভাব একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই। অভিনয়েও নয়, রচনাতেও নয়। আমাদের অভিনয় প্রণালী সম্পূর্ণ বিদেশী অনুকরণ; কিন্তু পূর্ব্বকালেও কি, এখনও কি, সংস্কৃত অভিনয়ের পদ্ধতি বা যাত্রার ধরণ একেবারে ইহা হইতে যায় নাই। বিশেষতঃ দীর্ঘচ্ছন্দী হাহুতাশে, বক্তৃতায়, ভাব-বাহুল্যে, এবং মামুলী প্রথাগত কাব্যের নায়ক-নায়িকার পরিকল্পনায়। সেইরূপ ইংরেজী নাটকের আদর্শ ও রীতি অনুসারে রচিত হইলেও, প্রথম বাংলা নাটকগুলি ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে সংস্কৃতের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াইতে পারে নাই। সর্ব্বপ্রথম বাংলা নাটক 'ভদ্রার্জ্জুনে'র রচয়িতা নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ ইংরেজী নাটকের প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ; কিন্তু ইহার আখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত, এবং ইহার ভাব ও ভাষাও সম্পূর্ণ দেশী। হরচন্দ্র ঘোষের রচনা ইহা অপেক্ষা ইংরেজীভাবাপন্ন; কিন্তু তিনিও সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নান্দী ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং তাঁহার 'কৌরব-বিয়োগ' নাটকে (১৮৫৮) বিজাতীয় আখ্যানও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের তো কথাই নাই। তিনি ইংরেজী নাটকের 'অতুলন রসমাধুরী'তে মুগ্ধ, কিন্তু স্বয়ং ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, সংস্কৃত কাব্যনাটক ও অলঙ্কারের অধ্যাপক। নূতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক বাংলায় নূতন করিয়া লিখিয়াছেন, পৌরাণিক বিষয় লইয়াও মৌলিক নাটক রচনা করিয়াছেন। এমন কি, ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় ভাবের প্রধান আমদানিকারী স্বয়ং মাইকেল মধুসূদনও প্রথমে সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়া হাত পাকাইয়াছেন। স্বরচিত নাটক সম্বন্ধে তিনি খুব জোর দিয়া লিখিয়াছেন—

I am aware that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about

the thing?......It is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit.

কিন্তু তিনি যাহাকে সংস্কৃতের গঠিত শৃঙ্খল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে শৃঙ্খল তিনি আপনিও সম্পূর্ণ চূর্ণ করিতে পারেন নাই। বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়াও তিনি বাঙালী ছিলেন; এবং স্পষ্ট না হইলেও তাঁহার রচনায় দেশীয় ভাবের ছাপ যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

'পদ্মাবতী' নাটকে ইন্দ্রনীল রাজার মধ্যস্থতায়, মুরজা, শচী ও রতির সৌন্দর্য্যবিবাদ প্রসঙ্গ, তিনি গ্রীক গল্পের Paris-এর মধ্যস্থতায় Athena, Juno, Venus-এর সুবিদিত Apple of Discord আখ্যান হইতে লইয়াছেন; তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ইংরেজী Romantic Drama-র অনুকরণে tragic heroine, villain, rival claimants, comic relief প্রভৃতি সমস্তই আনিয়াছেন। কিন্তু এ সকল স্বীকার করিলেও, সংস্কৃত নাটকের অনিবার্য্য প্রভাব তাঁহার নাটকগুলিতে লক্ষিত হইবে। রামগতি ন্যায়রত্নকে কেহই ইংরেজী ভাবের পক্ষপাতী বলিবেন না, এবং তিনি তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' আধুনিক বিদেশীভাবাপন্ন বাংলা সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট কটাক্ষপাত করিয়াছেন; কিন্তু তিনিও মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' সম্বন্ধে স্বীকার করিয়াছেন—"শকুন্তলা নাটক অধ্যয়নের পরেই কবি এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি স্পষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হয়", এবং উদাহরণস্বরূপ তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত রাজার মিলনের উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাটকের বিদূষককে বর্জ্জন করিয়াছেন; মাইকেল তাহা করেন নাই। ইহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, যাঁহারা নাটক রচনার প্রথম প্রবর্ত্তক, তাঁহারা সকলেই ইংরেজী সাহিত্য হইতে নূতন ধরণের রচনা ও শিল্পকলা শিক্ষা করিয়াও, দেশের যাহা গৌরবের সামগ্রী সেই পুরাতন সাহিত্যকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, এবং দেশের যাহা বৈশিষ্ট্য তাহাও জলাঞ্জলি দেন নাই। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে বিদেশীয় সাহিত্যের ছায়া স্পষ্ট হইলেও, দেশীয় ভাব ও জাতীয়তার সহিত এরূপ সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত বলিয়া ইহা একেবারে বিজাতীয় হইতে পারে নাই। তবে, 'servile admiration of everything Sanskrit'-এ যে আর নাটক লেখা চলিতে

পারে না, একথা মাইকেল ঠিকই ধরিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। শুধু পুরাতনকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, নূতনের সহিতও অগ্রসর হইতে হইবে। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ বা অনুবাদ তাঁহার সময়ে যথেষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং সাহিত্যের ধারা বদলাইয়া না দিলে নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। নবশিক্ষিত পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলা ও সাহিত্যের আদর্শ লইয়া, প্রাচ্য ভাব ও ভাষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। এই হিসাবে তিনি বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে অগ্রণী। তিনি আর এক স্থলে এই কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—

If I live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya-darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. That would be founding a real national theatre.

আর একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এই সকল পুরাতন বাংলা নাটকের আলোচনা করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, এই সকল রচনার ত্রুটি অনেক পরিমাণে ইহাদের ভাষার অপরিপুষ্টতার জন্য। তখনও গদ্য বা নাট্যসাহিত্যের উপযোগী ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, এবং ভাষা-সমস্যার নিষ্পত্তিও হয় নাই। প্রথম সৃষ্টির যাহা কিছু দোষ, তাহা এই সকল রচনায় আছে, কিন্তু সেই দোষগুলি অনুপযোগী ভাষার জন্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনেক স্থলে অনেক লেখক (যথা রামনারায়ণ) অনেকটা সরল ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা যে এক দিকে সংস্কৃতানুযায়ী ও কৃত্রিম এবং অন্য দিকে অত্যন্ত খেলো ও অমার্জ্জিত হইয়া যায় নাই তাহা বলা যায় না। তখনকার কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ উৎকট সংস্কৃতবহুল ভাষা প্রয়োগ করা, ভাষার আভিজাত্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন মনে করিতেন। 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের "জগতীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজ তাপসমূহ সমর্পিত করিয়া স্বয়ং সুশীতল হইল। অ-হ-হ! বিরহীজনসন্তাপে কাহারও সঙ্কোচ নাই" প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার পরবর্ত্তী নাটকগুলিতে (এমন কি সংস্কৃত অনুবাদেও) রামনারায়ণ অনেক

পরিমাণে এই দোষ পরিহার করিয়াছেন, এবং সহজ ভাষার প্রয়োগে সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সরল ভাষা অনেক সময় (বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের কথোপকথনে) হাল্‌কা ও খেলো হইয়া পড়িয়াছে; এবং গুরুগম্ভীর সাধু-ভাষায় মোহ তিনি একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে-সময় ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যপ্রবন্ধে ইহা অপেক্ষা শতগুণ অলঙ্কারকণ্টকিত, অনুপ্রাসবহুল ও অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃতের যে রূপান্তর বাংলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ গৃহীত হইত, রামনারায়ণ কোন দিন তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন সাহিত্যের, বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যের, ভাষার সৃষ্টি হয় নাই; ভাষা তখনও সাহিত্যশিল্পাগারে শিক্ষার্থী। তখনও গদ্যে, নাটকে, কবিতায় সকলেই নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কাব্যে ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল ও মধুসূদন; নাটকে রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু; গদ্যে এক দিকে সংস্কৃত কালেজী দল, অন্যদিকে আলালী ও হুতোমী নক্সাকার—এইরূপ সাহিত্যের সকল বিভাগে এই চেষ্টার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। কিন্তু ইহাদের কেহই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। এক দিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অন্য দিকে অক্ষয়কুমার দত্ত—এই দুই মহাপুরুষের কল্যাণে যদিও গদ্যের ভাষা নবজীবন লাভ করিল, তথাপি উভয়েই সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন বলিয়া, ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও অত্যন্ত সংস্কৃতানুযায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগরী ও অক্ষয়ী ভাষার লালিত্য, দৃঢ়তা ও ওজস্বিতা থাকিলেও, সংস্কৃত ভাব, অলঙ্কার ও শব্দগৌরবে এত ভারাক্রান্ত যে তাহাতে মহাকাব্য রচিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা কোন মতে নাটক বা উপন্যাসে ব্যবহৃত হইতে পারে না। অবশ্য এই সময়ে টেকচাঁদের আলালী ভাষা অধিকতর দ্রুত, সহজ ও স্ফূর্ত্তিশালী ছিল, কিন্তু তাহা এত হাল্‌কা ও অনেক স্থলে এত খেলো হইয়া পড়ে যে তাহাকে মার্জ্জিত করিয়া না লইলে, কোন উচ্চশ্রেণীর রচনায় চালান যাইত না। এমন কি, দীনবন্ধুর রচনাতেও এক দিকে দীর্ঘায়ত সমাসবহুল ভাষা 'নীলদর্পণ' নাটকের বহু স্থলে করুণ রসের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে; অন্য দিকে টেকচাঁদী ভাষার ছায়া তাঁহার হাস্যরসের রচনার শ্রীবৃদ্ধি করিলেও স্থানে স্থানে যে নিতান্ত লঘু হইয়া যায় নাই, তাহা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সমৃদ্ধিশালিনী সর্ব্বশ্রীসম্পন্ন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই; এবং হইলেও তাহার আদর্শ তখনও সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই।

রামমোহন রায়

গত যুগের যে সকল মনীষীর কীর্ত্তি ও সাধনার উপর বর্ত্তমান বাংলা দেশ ও বাঙালীর ভাব-জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন অগ্রগণ্য, শুধু কাল হিসাবে নয়, জ্ঞান ও কর্ম্মের নবপ্রবুদ্ধ ও বহুবিস্তৃত প্রভাবের জন্য। রামমোহনের জীবনী ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ভক্তির আতিশয্যে অনেকগুলি অমূলক কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়াছে। এগুলি ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিলে, তাঁহার প্রথম জীবনের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, তিনি বিষয়ী ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মলাভ করিয়া সমৃদ্ধ ভদ্রসন্তানের মত প্রথমে স্বগ্রামে পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে কোনও নূতন ভাব বা কর্ম্মের প্রেরণা দেখা যায় না। তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮০৩-৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহফাৎ' গ্রন্থে; কিন্তু তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। হয়ত বা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর চেয়ে তাঁহার ফার্সী বা সংস্কৃত জ্ঞান বেশি ছিল; কিন্তু তখনও ইংরেজীতে তাঁহার দখল হয় নাই, এবং প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। তাঁহার মনে সংশয় ও বিদ্রোহের স্পষ্ট সূচনা হয় ইহার দশ বৎসর পরে, যখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বৈষয়িক কাজের জন্য ১৮১৪ সালের ২০শে জুলাই রংপুর ত্যাগ করিয়া স্থায়িভাবে কলিকাতাবাসী হইয়া নূতন জগতের সন্ধান পাইলেন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে রংপুরে অবস্থানের সময় পাঁচ বৎসরের মধ্যে ডিগবী সাহেবের সাহচর্য্যে ইংরেজী শিক্ষা ও হরিহরানন্দ স্বামীর সঙ্গলাভে হিন্দু-শাস্ত্রাদি আলোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় স্থায়ী বসবাসের সময় হইতেই পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশ, বিতর্ক-আলোচনা, সভা-স্থাপন প্রভৃতির আয়োজন এবং তাঁহার নিজস্ব মতামতের পূর্ণ বিকাশ আরব্ধ হয়। ইংরাজ রাজত্বের স্থাপনের ফলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নূতন রাজধানী হিসাবে কলিকাতা ছিল মুসলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী এই তিন সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। তদানীন্তন মুসলমানী বিদ্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত রামমোহনের মনের প্রথম সংশয় এখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে

ও হিন্দুশাস্ত্রাদির আলোচনায় বিকশিত হইয়া, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত বৃহত্তর কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত করিল।

রামমোহনের প্রথম বাংলা রচনা বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮১৫ সালে। ইহার পর ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত সত্তরটি মৌলিক বা অনূদিত বিতর্কমূলক পুস্তক-পুস্তিকা বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে মতপ্রচারের সুবিধার জন্য রামমোহন বাংলায় ও ইংরেজীতে দুইখানি সাময়িক পত্রেরও সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী রচনা সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি গত যুগের বিশ্বাসযোগ্য লেখকেরা বলিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে রামমোহনের ইংরেজ বন্ধুদের যথেষ্ট সাহায্য বা সংশোধন আছে। হয়ত বাংলা বাংলা রচনাতেও সেকালের কোন কোন ধনী ও গুণী ব্যক্তির মত তিনিও গৌরমোহন বিদ্যালংকার প্রভৃতি লেখকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা না হইলেও, এগুলির বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী যে তাঁহার নিজস্ব তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

✓ বাংলা গদ্যের স্রষ্টা বা 'জনক' হিসাবে রামমোহন বহু বার বহু সমালোচকের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বাংলা গদ্যের বিবর্ত্তন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই দাবী তাঁহার পূর্ব্বে একাধিক লেখকও করিতে পারেন। বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপনে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের কীর্ত্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই লেখক হিসাবে রামমোহনের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারই সর্ব্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে বিশিষ্ট সাহিত্য-রূপ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রামমোহন প্রকৃত সাহিত্যিক রচনা বিশেষ কিছু করেন নাই; তাঁহার লেখা প্রায় সবই তর্ক বা বিবাদমূলক অথবা শাস্ত্রব্যাখ্যা-সম্বন্ধীয়, যাহাতে লালিত্য বা মাধুর্য্যগুণ নাই বলিলেও চলে। যদিও তাঁহার গৌড়ীয় ব্যাকরণে রামমোহন সাধারণের বোধগম্য রচনা-রীতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তবুও তাঁহার নিজের রচনা সমসাময়িকদের রচনার তুলনায় জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু সাহিত্যিক গুণ থাক বা না থাক, গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া বাংলা প্রবন্ধ রচনার অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন রামমোহন। এক দিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ভাষায় প্রকাশিত করিয়া তিনি যেমন ভাব ও শব্দ-সম্পদের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি অন্য দিকে

তর্ক ও বিচারমূলক পুস্তক রচনা করিয়া ভাষায় প্রকাশভঙ্গীর গুরুত্ব, দৃঢ়তা ও মননশীলতার সঞ্চার করিয়াছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ইহার দ্বারা বিচার করিলে চলিবে না। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ যুক্তিবাদী সংস্কারক। সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম সকল ক্ষেত্রেই সংস্কারের আগ্রহ ছিল যেমন প্রবল, তেমনি ছিল তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা ও মনের প্রসার। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও হিন্দু সংস্কৃতির সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি নিজেকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই। দেহে ও মনে তিনি ছিলেন শক্তিমান পুরুষ, তাই সকল বাধা সত্ত্বেও প্রখর যুক্তিবাদের নিকষে সকল বিরুদ্ধ মত যাচাই করিয়া তিনি নিজের মত স্থাপিত করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত হইতেছে নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদের জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলন, যাহা ১৮২৯ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আইন-ঘোষণার দ্বারা সফল হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ছাড়া যাহাতে এ দেশের নারীরা সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, সে জন্যও তিনি যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে সে সময় একটি প্রবল তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষের মত ছিল, এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও ফার্সী পড়ানই সঙ্গত; অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিল। তৎকালীন কালেজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়াও রামমোহন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। নিজে ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় বিচক্ষণ হইয়াও, এ সম্বন্ধে ১৮২৩ সালে তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রাচ্য-ভাষা-শিক্ষার দোষই দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই পত্রে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কথা বলেন নাই, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগিতা ও আবশ্যকতার উপরই বেশি ঝোঁক দিয়াছেন। এ বিষয়ে কেবল মত প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। ইহার পূর্ব্বেই ১৮২২ সালে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উপায়স্বরূপ আংগ্লো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ও নিজ ব্যয়ে স্থাপিত করিয়াছিলেন। রাজনীতিক ব্যাপারেও স্বাধীনচেতা ও স্বাধীনতাবাদী রামমোহনের মত ছিল উদার। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সংরক্ষণ, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইনের পরিবর্ত্তন, জুরীপ্রথার প্রবর্ত্তন, নিয়মানুগ শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ জনহিতকর বিষয়ের আন্দোলনে তিনি উদ্যোগী ছিলেন। রামমোহনকে এই সকল আন্দোলনের পথপ্রদর্শক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত আন্দোলনই ছিল তাঁহার জীবনের প্রথম ও প্রধান প্রচেষ্টা। তাঁহার মত-প্রচারের বিশিষ্ট উপায় ছিল কেবল পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ নয়,—বিতর্ক, আলোচনা, সাময়িক পত্রিকার প্রচার, সভা-স্থাপন, আধুনিক propagandaর যাহা কিছু অস্ত্র সকলই তাঁহার জানা ছিল। রামমোহন ছিলেন মূলতঃ একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতার বিরোধী। তাই মুসলিম ধর্ম্ম তাঁহাকে প্রথমে আকৃষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টান শাস্ত্রেও রামমোহনের শ্রদ্ধা ছিল; তাই মূল বাইবেল হইতে তিনি খ্রীষ্টীয় উপদেশ সংকলন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হইয়াছিল এইখানে যে, ধর্ম্মবুদ্ধি উন্নত করিবার জন্য খ্রীষ্টের উপদেশ মূল্যবান্ বলিয়া স্বীকার করিলেও খ্রীষ্টকে অবতার অথবা চার্চ্চ-প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্মের তত্ত্বগুলি সত্য বলিয়া তাঁহার যুক্তিবাদী মন গ্রহণ করিতে পারে নাই। তেমনি হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামিতে রামমোহন শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, এবং তাহার জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ তাঁহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু যে সময়ে বাংলা দেশে বেদ-উপনিষদের চর্চ্চা ছিল না বলিলেই চলে, সেই সময়ে রাম-মোহন নূতন করিয়া বেদান্ত-চর্চ্চার সূত্রপাত করিলেন, এবং বেদান্তের উপর বাংলা ভাষায় প্রথম নিজস্ব ভাষ্য রচনা করিলেন। অনেকগুলি উপনিষদ্ ও তাহার অনুবাদও নিজের অর্থব্যয়ে প্রকাশিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। একেশ্বর-ব্রহ্মবাদী রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল, তিনি হিন্দুর অতি প্রাচীন ও অতি সম্মানিত শাস্ত্রগুলির আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করিবেন যে, হিন্দুধর্ম্মে বেদান্তোপনিষৎ-কথিত নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য তিনি প্রথমে (১৮১৫ সালে) আত্মীয়-সভা ও পরে (১৮১৮ সালে) ব্রহ্মসভা নামে সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। জাতি, ধর্ম্ম বা সামাজিক পদনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই এইখানে এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, এইরূপ তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সেই জন্য ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠার যে দলিল প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে স্পষ্ট করিয়াই সাম্প্রদায়িক উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সভার আচার্য্য ছিলেন উপনিষদ্-বেত্তা ব্রহ্মজ্ঞানী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ব্রহ্মসভা হইতে পরবর্ত্তী সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু এ কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রামমোহন নিজেকে

কোনও দিন কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের বা বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক বলিয়া দাবী করেন নাই, এবং তাঁহার ব্রহ্মসভা কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মসমাজ ছিল না।

সুতরাং যাঁহারা রামমোহনকে প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহাদের মত নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। একেশ্বর-ব্রহ্মবাদী হইলেও রামমোহনের মনোভাব ছিল যুক্তিবাদী দার্শনিকের। বিলাত গমনের কিছু পূর্ব্বে তিনি না কি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান সকল সম্প্রদায়ই তাঁহাকে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য দাবী করিবে, কিন্তু আসলে তিনি কোনও সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার—নূতন কোনও ধর্ম্মের প্রচার বা প্রবর্ত্তন নয়। সকল ধর্ম্মের সার সত্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল; দেশের তিনটি আপাতবিরোধী ধর্ম্মের আন্তরিক চর্চ্চার দ্বারা তিনি এই সার্ব্বভৌম মনোভাবে পৌছিয়াছিলেন। সে-যুগে একদিকে ছিল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি, অন্যদিকে স্বাধীন চিন্তার নিরঙ্কুশ উচ্ছৃঙ্খলতা,—এই হিসাবে রামমোহনেব সমন্বয়সন্ধানী উদার মনোভাব ছিল তাঁহার যুগের অগ্রগামী। আজকালকাব দিনে যে দার্শনিক অনুশীলনকে Study of Comparative Religion বলা হয়, রামমোহন ছিলেন তাহারই নির্দ্দেশক। কিন্তু কেবল জ্ঞানচর্চ্চায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান ও চিন্তার যুক্তিযুক্ত সমন্বয় ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য, এবং যুগ-সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া এই সমন্বয়ের তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। কিন্তু তিনি জাতীয় ধর্ম্ম বর্জ্জন করিরা সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাই একেশ্বরবাদ বিদেশী শাস্ত্রের সাহায্যে নয়, উপনিষদ ও বেদান্তের সাহায্যেই স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নূতন ধর্ম্মের প্রচারক বা সাধক তিনি ছিলেন না; যুক্তির দ্বারা সত্যের সন্ধানই ছিল তাঁহার সংস্কারের আদর্শ। হয়ত কেবল যুক্তির দ্বারা নয়, অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়; কিন্তু যে ব্রহ্মের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষেরই ধর্ম্মগত বিশ্বাসের ব্রহ্ম, নীরস দর্শনশাস্ত্রের ব্রহ্ম নয়। তাই দেখা যায়, গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও রামমোহন যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই, মৃত্যুকালেও তাঁহার দেহে দ্বিজত্বের এই প্রতীক বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু কেবল সাম্প্রদায়িক হিন্দু বা ব্রাহ্মণ হিসাবে তিনি তাঁহার মতবাদের প্রচার

করেন নাই; যুক্তির দ্বারা যে শাস্ত্র গ্রহণীয় সেই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম সকল ক্ষেত্রেই দূরদর্শী সমন্বয়বাদী রামমোহন এইরূপ যুক্তিযুক্ত সংস্কারের নূতন নূতন পথ দেখাইয়াছেন, এবং বর্ত্তমান যুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদন

মহাকাব্য রচনা গত যুগের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই রচনার রীতি ও আদর্শ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ছিল না। প্রাচীনতর সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য ছিল বটে, কিন্তু তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র। গঠনে ও উপকরণসংগ্রহে, ছন্দ ভাষা ও ভঙ্গীর প্রয়োগে, ভাববস্তুর কল্পনায় বাঙ্গলা মহাকাব্য হইল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের রচনা। সংস্কৃত মহাকাব্যের কিছু প্রভাব হয়ত ছিল; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, গত যুগের বাংলা সাহিত্যে যে ভাববিপ্লব আসিয়াছিল, বাংলা মহাকাব্য হইল তাহারই সর্ব্বপ্রথম নিদর্শন, এবং ইহার আদর্শ ছিল মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্য। ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বরগুপ্ত পর্য্যন্ত বাংলায় যে রচনা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার রস ও রুচির জের তখন এরূপ জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল যে বিশাল ও বিচিত্র ইংরেজী কাব্যে অভ্যস্ত শিক্ষিত সমাজ তাহাতে আমোদ পাইলেও তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল না। সুতরাং নবযুগের নবজাগ্রত রস-পিপাসা যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের বশবর্ত্তী হইবে তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

কিন্তু সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে মহাকাব্য ছিল না; ছিল স্কট্, মুর ও বায়রণের উচ্ছ্বাসপ্রবণ উপাখ্যান-কাব্য। সে-যুগের হিন্দু কলেজে পোপ এবং গোল্ডস্মিথও পাঠ্য ছিল। শেলি, কীটস্ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের সূক্ষ্মতর প্রভাব তখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাই আধুনিক যুগের প্রথম কবি রঙ্গলাল যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি এই সদ্য-আহৃত উপাখ্যান-কাব্যের স্থূল অনুকরণে কথা-কাব্য রচনা করিলেন। কিন্তু নূতন সাহিত্যে কৃতবিদ্য হইলেও রঙ্গলালের পক্ষপাত ছিল প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভাব ভাষা ও ভঙ্গীর দিকে। সেইজন্য, সাময়িক ইংরেজী Metrical Romance-এর যাহা প্রকৃত রূপ ও অন্তর্গত ভাব, এবং যাহার জন্য এই শ্রেণীর রচনার বৈশিষ্ট্য ও উপাদেয়তা, সেই ভাব ও রূপ তিনি তাঁহার বাংলা কথা-কাব্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। একদিকে যেমন বাঙ্গালী পাঠকের রুচি তখনও সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গঠিত হয় নাই, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্ত্য কাব্য-কলা আয়ত্ত করিবার শক্তি বা ইচ্ছা রঙ্গলালের ছিল না। তৎকালীন

শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের ধাতে যতটুকু নূতন ভাব সহ্য হয় তত-টুকুই আমদানী করিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন; প্রাচীন রীতি বজায় রাখিয়া নূতন আদর্শের যতটুকু অনুকরণ করা যায় ততটুকুই তিনি করিয়া-ছিলেন। তাই তিনি বাংলা কাব্যে কোনও স্বতন্ত্র ধারা প্রবর্তিত করিতে পারেন নাই।

রঙ্গলালের মত মধুসূদনেরও উপাখ্যানকাব্য লেখা যে স্বাভাবিক ছিল, তাহা তাঁহাব প্রথম ইংরেজী রচনা The Captive-Lady কাব্যে দেখা যায়। ইহার প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিল তৎকালীন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর Fakeer of Jungheera (১৮২৮)। কিন্তু যখন ইংরেজী ছাড়িয়া দিয়া মধুসূদন বাংলা ধরিলেন, তখন প্রচলিত উপাখ্যান-কাব্য বা গীতি-কবিতা তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে—মহাকাব্য-রচনা তাঁহাকে প্রথম আকৃষ্ট করিয়াছিল কেন? এ-জাতীয় কাব্য বাংলা ভাষায় কোনোদিন রচিত হয়নি—প্রাচীন বাংলা কাব্য ছিল ছিল চিরদিনই গীতি-প্রাণ বা উপাখ্যান-প্রধান। সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে মহাকাব্যরচনার রীতি ছিল না,—ছিল উপাখ্যান-কাব্য বা গীতি-কবিতার ধারা। মধুসূদনও প্রথমে উপাখ্যান-কাব্য ও পরে গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকাব্য-রচনার মধ্যেই কি তিনি তাঁর অভীপ্সিত কাব্য-মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন?

মহাকাব্যের প্রতি মধুসূদনের আকৃষ্ট হইবার কারণ কি, তাহা ঠিক বলা বলা যায় না। হয়ত তাঁহার কবি-প্রকৃতির এই দিকেই ঝোঁক্ ছিল। স্বল্পায়ু জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মধুসূদন পথ খুঁজিয়াছিলেন, পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কাব্যে, নাটকে, গীতিকবিতায়, প্রহসনে, সনেট্-রচনায়, নূতন ভাষা ভঙ্গী ও ছন্দের প্রবর্তনে—সর্ব্বত্রই তিনি জাতির সাহিত্য-পথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হয়ত মহাকাব্য-রচনা ছিল তাঁহার এই নিত্যনূতন প্রয়োগ-পরীক্ষার একটি দিক। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীন মহাকবিদের গুরুগম্ভীর মহাকাব্য মধুসূদনকে যেরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল, সমসাময়িক তরল ভাব-প্রধান উপাখ্যান-কাব্য বা গীতি-কবিতা তাঁহাকে সেরূপ মুগ্ধ করিতে পারে নাই। যে কবি-কল্পনার স্ফূর্তি ও মুক্তির মন্ত্র তিনি খুঁজিতেছিলেন, তাহার সন্ধান বোধ হয় এইখানেই পাইয়াছিল; তাই মহা-কাব্য রচনাকেই শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। অথবা,

মহাকাব্য না লিখিলে মহাকবি হওয়া যায় না, এইরূপ একটি প্রচলিত ধারণাও হয়ত মধুসূদনকে মহাকাব্য-রচনায় প্রথম প্রেরিত করিয়াছিল।

কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, মধুসূদন যে ঠিক হোমার বা মিল্‌টনের ধরণের মহাকাব্য লিখিতে পারিয়াছেন—এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বাহ্যতঃ সাদৃশ্য থাকিলেও, মর্ম্মগত পার্থক্য রহিয়াছে যথেষ্ট। মধুসূদন যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা দেশীয় বা বিদেশীয় কোনও কাব্য-শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে ঠিক মহাকাব্য নয়। ইংরেজীতে যাহাকে Epic বলা হয় এবং হোমারের রচনা যাহার আদর্শস্বরূপ, তাহা একমাত্র সহজ সরল বীররস-প্রধান heroic যুগেই সম্ভবপর। আমাদের মহাভারত ও অনেকাংশে রামায়ণ এই শ্রেণী রচনা। ইহাদের অনুকরণে অধিকতর মার্জ্জিত যুগে ও অনেক পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল—যেমন মিল্‌টন বা কালিদাসের কাব্য—সেগুলিকেও Epic বা মহাকাব্য বলা হয় বটে, কিন্তু সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম ও অনুকৃতিমূলক। ইহাদের মধ্যে আদিম যুগের বা জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না। শিল্প হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিলেও, কাব্য-প্রেরণা হিসাবে এগুলিকে প্রাচীনযুগের Epic বা মহাকাব্যের পর্য্যায়ে ধরা যায় না।

কিন্তু মহাকাব্য কেন, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে যে কোনও উচ্চশ্রেণীর রচনার প্রধান অন্তরায় ছিল এই যে বাংলা ভাষার সুপ্ত প্রকাশ-শক্তি তখনও ছিল অগোচর। যাঁহাদের স্বজাতি-প্রীতি ও বাংলা ভাষার প্রতি মমতা ছিল, তাঁহাদের কাছে তখন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, কি করিয়া বাংলা ভাষাকে, ইংরেজীর মত, স্বাধীন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও উৎকৃষ্ট কাব্য-কলার উপযুক্ত করিয়া তোলা যায়। অর্থাৎ, কি উপায়ে ইংরেজী কাব্যের শুধু বহিরঙ্গ নয়, অন্তর্গত প্রাণটিকে, বিজাতীয়তা হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা কাব্যের নির্জীব দেহে সংক্রামিত করা যায়। বাংলা মহাকাব্য-রচনার মধ্য দিয়া মধুসূদনের দুর্দ্দমনীয় প্রতিভার দুঃসাহস সর্ব্বপ্রথম এই সমস্যা-সমাধানের সন্ধান দিল। সে সময় অনেকেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের মর্ম্মটি প্রাণের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিশিষ্ট রূপটি, রঙ্গলালের মত, প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই; বাংলা ভাষার তৎকালীন অবস্থায় এরূপ চেষ্টা দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গী যে বাংলা ভাষায় অনুকরণ করা যায় তাহা নহে,

সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করাও যায়, তাহা মধুসূদনই প্রথম দেখাইলেন। শুধু উপকরণ-সংগ্রহ নয়, কাব্য-কৌশল নয়, ভাষার পারিপাট্য নয়—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের মূল আদর্শটি, তাহার কাব্যকলার অসীম সম্ভাব্যতা, তাহার অপূর্ব্ব কল্পনা-ভঙ্গী ও বিচিত্র রস-মাধুর্য্য, তাহার ভাষার অপরিমেয় শক্তি ও ছন্দের অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য—এক কথায়, পাশ্চাত্ত্য কাব্যের যে প্রাণটি সে-যুগের অন্ত কেহই মৃতকল্প বাংলা কাব্যের দেহে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই, মধুসূদন সেই প্রাণটি সংযোজিত করিয়া দিলেন। ইহার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে নবজীবন লাভ করিল তাহা দিনের পর দিন নিত্য-নূতন কাব্য-সাধনা ও নূতন যুগের সূচনা আনিয়া দিল।

এই অসাধ্য সাধনে কার্য্যকরী হইয়াছিল একদিকে মধুসূদনের স্বকীয় দুর্লভ কবি-প্রতিভা, অন্তদিকে বিদেশী কাব্যের একাগ্র সাধনা। তাঁহার সহজাত প্রতিভাকে পুষ্ট ও পরিণত করিয়াছিল নানা উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্ত্য কাব্যের অনুশীলন—এ কথা আমরা জানি এবং তিনি নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ কি ছিল, তাহা না বুঝিলে, তাঁহার প্রতিভা-বিকাশের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে না। কবির সজ্ঞান অভিপ্রায় ছিল, তাঁহার কল্পনাকে নানা ‘কবি-চিত্ত-ফুলবনে’ মধু আহরণে নিযুক্ত করিবেন; এবং এই অভিপ্রায়ের ফলে যে মধু-চক্র তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার সমগ্র মাধুর্য্যে যেমন আত্মগত ভাব ও কল্পনা রহিয়াছে, তেমনি বাহিরের আহৃত উপকরণও তাহার গঠন-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে। বহু পণ্ডিত সমালোচক দেখাইয়াছেন, মধুসূদন বিদেশী সাহিত্য হইতে ভাব, বর্ণনা, পুরাণাখ্যায়িকা, প্রকাশ-রীতি, কল্পনাদর্শ, উপমা, ছন্দ প্রভৃতি কাব্য-রচনার বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা বলিলেই সব কথা বলা হয় না। মধুসূদনের কাব্য কেবল কেতাবী বিদ্যার আহরণপটুতায় পর্য্যবসিত হয় নাই; তাই কেবল উপকরণের তালিকার দ্বারা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিমাপ করা যাইবে না, তাঁহার প্রতিভার নূতন করিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির শক্তিও বোঝা যাইবে না। মধুসূদন নিজে লিখিয়াছেন :

I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (do) and Milton. These কবিকুলগুরু's ought to make a first-rate poet if nature has been gracious to him.

এই উল্লেখের মধ্যে স্বদেশের কবি কৃত্তিবাসের নাম বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বিদেশী কবিদের মধ্যে, ভার্জ্জিলের কতটুকু প্রভাব ছিল, বলা যায় না। দান্তে বা তাস্‌সোর মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান মনোভাব মধুসূদনের ছিল না; তাই তাঁহার কাব্যে দান্তের নরক-বর্ণনার অনুসরণ সার্থক হয় নাই। কেবল ইংরেজ কবি মিল্‌টন ও গ্রীক্ কবি হোমার তাঁহার কবি-চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। উদাত্ত গম্ভীর ছন্দ-সঙ্গীতে মিল্‌টন যে তাঁহার গুরু ছিলেন এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মিল্‌টনের মত মধুসূদনেরও বিদ্যার সাধনা ছিল, এবং একই ধরণের প্রশস্ত ও উচ্চ সারস্বত ভিত্তির উপর তিনিও তাঁহার কাব্যসৌধ নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কবি-মানস ও কাব্যের প্রকৃতি ছিল মিল্‌টনের কবি-মানস ও কাব্যের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। মিল্‌টনের কঠোর পিউরিটান্ মনোভাব অথবা গ্রীক-লাতিন কাব্যের আন্তরিক সংস্কারে classicalityর কঠিন সংযম, মধুসূদনের কল্পনা ও মনোবৃত্তির অনুকূল ছিল না। কারণ, মধুসূদনের কাব্যের classic আবরণটি ছিল রচনাগত আদর্শ, বাহিরের সংযম মাত্র, ইহার প্রাণবস্তু ছিল খাঁটি romantic। এই সকল কারণে তাঁহার তথাকথিত মহাকাব্য মিল্‌টনের মহাকাব্যের সগোত্র হইতে পারে না। সেইরূপ হোমারের প্রভাব ছিল দেশ ও কালের ব্যবধানে দূরাগত সাহিত্যিক প্রভাব মাত্র। মধুসূদন যখন লিখিয়াছেন:

I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write, as a Greek would have done.

তখন বোধ হয় গ্রীক কবির বাণী-ভঙ্গী বা গঠন-রীতির অনুসরণের কথাই বলিয়াছেন। 'The grand mythology of our ancestors'-এর প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু উপাখ্যানের বিস্তারে তিনি হিন্দু পুরাণ নয়, গ্রীক পুরাণের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক কাব্যের নিরবচ্ছিন্ন বীররসের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার নিজের ভাষায়—'Homer is all battles!' কেবল যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় যে বীররস সার্থক হয় না, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন মিল্‌টন-বর্ণিত শয়তানের অপূর্ব্ব মানসিক স্থৈর্য্য ও বীর্য্য হইতে। সেইজন্য যুদ্ধবিগ্রহ বাদ দিয়া রাবণের চরিত্রে তিনি অনুরূপ মানসিক বলের প্রকাশ দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। বীররসের উদ্দেশ্য কাব্যের প্রারম্ভে ঘোষণা করিলেও, মধুসূদন বীরবিক্রমের

কাহিনীকে শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ করুণ-রসে ডুবাইয়া দিয়াছেন। এ সকল পার্থক্য সত্ত্বেও গ্রীক মনোভাবের সঙ্গে এক জায়গায় তাঁহার কবি-চিত্তের গভীর মিল ছিল। যাহাকে আমরা গ্রীক Paganism বলি, অর্থাৎ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও সুস্থ সহজ জীবন-প্রীতি, যাহা পাপ-পুণ্যে উদাসীন, আধ্যাত্মিকতার ভারে অপীড়িত, প্রেমে ঘৃণায় সুখে দুঃখে সমান অধীর— এই মনোভাব খাঁটি ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী হইলেও বাঙ্গালীত্বের বা স্বভাব-কবিত্বের বিরোধী নয়। তেমনি গ্রীক অদৃষ্ট-বাদ ও দেবদেবীর উপর নির্ভরশীলতা তাঁহার মজ্জাগত হিন্দু কর্ম্মবাদ বা অদৃষ্টবাদের বিপরীতগামী ছিল না। ইহা ছাড়া, যখন মধুসূদন দাবী করেন যে তাঁহার কাব্য three-fourths Greek, তখন তাহা কবিজনোচিত অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়।

অবশ্য নিছক কাব্য-কলার দিক হইতে গ্রীক ও ইংরেজী কাব্যের অনুশীলনে মধুসূদন পাইয়াছিলেন সাহিত্যিক শিক্ষা বা সংস্কৃতি, এবং নিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যাহাকে বলে শিল্পিজনোচিত বুদ্ধি। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ও অনুভূত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ-শক্তি কবির নিজস্ব; কিন্তু বিদেশী সাহিত্যের শিক্ষাগারে এই স্বাভাবিক অনুভূতি ও রূপদক্ষতা অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় পরিণতি লাভ করিয়াছিল। ইহা শুধু কাব্য-কসরৎ নয়; ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর অভিনব প্রয়োগ, গঠন-সৌকুমার্য্য, ছন্দের নূতন ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্য,—কাব্যকে রসাত্মক করিবার যাহা কিছু উপায়, তাহা মধুসূদন স্বকীয় প্রতিভায়, শুধু আত্মসাৎ নয় আত্মস্থ করিয়া, নবযুগের নূতন কাব্যের পথনির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই হিসাবে তিনি পাশ্চাত্ত্য কাব্য-কলার যাহা উৎকৃষ্ট আদর্শ, তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করিলেন।

কিন্তু বিদেশী কাব্যের অনুসরণে মধুসূদনের কাব্যে যেটুকু পাশ্চাত্ত্য ভাব আছে তাহা মুখ্যতঃ আকৃতিগত; কাব্যের প্রকৃতিতে বিদেশীর উপর দেশী ভাবই জয়ী হইয়াছে। নূতন শিক্ষা ও রুচির বিস্তারে পাশ্চাত্ত্যের প্রবল প্রভাব তাঁহার নবজাগ্রত চেতনাকে আলোড়িত করিয়াছিল, কিন্তু গভীর মর্ম্মস্থলে ছিল বাঙালীর অতিপ্রাচীন মজ্জাগত বাঙালীত্ব। এই মনোবৃত্তির মূলে ছিল সে-যুগের বিদেশী ভাব ও চিন্তায় প্রপীড়িত বিপর্য্যস্ত বাঙালী প্রাণের আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না,— সাহিত্য-অনুশীলন, সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও ভাবগ্রাহিতার অভাব ছিল না, হোমার ভার্জ্জিল তাস্‌সো মিল্‌টন বাল্মীকি ও কালিদাসের আদর্শ উপলব্ধি করিবার

যথেষ্ট প্রতিভা ছিল,—কিন্তু কবি যাহা রচনা করিলেন, তাহা প্রাচীন মহাকাব্যের ব্যর্থ নকল মাত্র নয়, তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের প্রতিচ্ছায়ামূলক খাঁটি আধুনিক কাব্য। এ কথা সত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের আদর্শে মধুসূদন অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের কবির পক্ষে, বিশেষতঃ বাঙালী কবির পক্ষে, প্রাচীনতম যুগের প্রেরণা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ছন্দের উদাত্ত ধ্বনি-বৈচিত্র্য, কল্পনার অবাধ বিস্তার ও বিপুল বিবিধ বিষয়ের সন্নিবেশ প্রভৃতি মহাকাব্যের কয়েকটি লক্ষণ মধুসূদনের কাব্যে রহিয়াছে সত্য; কিন্তু যে বহির্বস্তুগত সংযত-শান্ত রসাবেশ, বিরাট-গম্ভীর বস্তুর যে গৌরব-গান মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ, তাহা মধুসূদনের কাম্য হইলেও তাঁহার কবি-প্রকৃতির অধিগম্য ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে মধুসূদনের মন ছিল মহাকাব্য-সঞ্চারী; কিন্তু আমাদের মনে হয়, classic মহাকাব্যের অনুরাগী হইলেও, তাঁহার কবি-প্রকৃতি ছিল মুখ্যতঃ romantic। বাহিরের বস্তু-জগৎ হইতে উপাদান আহৃত হইলেও, তাঁহার আত্মগত ভাব ও আবেগই সেই উপাদানকে কাব্য-সঙ্গত রূপ দান করিয়াছে। মেঘনাদবধের উপাখ্যানভাগ পুরাতন বটে, কিন্তু কবির রাম-লক্ষ্মণ, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ, সরমা-প্রমীলা প্রভৃতি বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের সন্ততি নয়, হোমার বা মিল্‌টনের চরিত্র-চিত্রের সগোত্রও নয়। কারণ, প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের কাব্য-প্রেরণার মূলে ছিল না রামায়ণ, ইলিয়দ্‌ বা প্যারাডাইস্‌ লষ্ট; ছিল একদিকে বর্ত্তমান যুগের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির ভাব-জগৎ ও নব মানবতার আদর্শ, অন্যদিকে বাঙালীর সংস্কারাগত একান্ত সুকুমার ভাব-প্রবণতা। কাব্যের প্রথমেই কবি বলিয়াছেন—

"গাইব মা, বীররসে ভাসি'
মহাগীত",

কিন্তু তিনি যে মহাগীত রচনা করিলেন, তাহাতে বীররস নয়, করুণরসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার চরিত্রগুলি বীর-গরিমার লোকাতীত আদর্শে অঙ্কিত নয়; এগুলিতে দেখিতে পাই বাঙালী জীবনের নিতান্ত লৌকিক সংস্কার, বাঙালী চিত্তের স্নেহার্দ্র কোমলতা। রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি কবির পক্ষপাত এই কারণেই ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে তিনি মনুষ্যের মনুষ্যধর্ম্ম ও পুরুষের পৌরুষকে তাঁহার কাব্য-কল্পনার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ফল্গুর মত অন্তর-প্রবাহী

বাঙালী-সুলভ মমতা ও প্রীতি বহিরাগত আদর্শকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই।

এই ভাবপ্রবণতা লক্ষ্য করিয়া এক সময় তরুণ রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এদিক দিয়া লক্ষ্য করেন নাই যে, এই আত্মভাব-নিমগ্নতাই মধুসূদনের তথাকথিত মহাকাব্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এই মূলগত আবেগের বেগ রাবণের বিলাপে, রামচন্দ্রের মমতায়, সীতার দুঃখে, প্রমীলার ক্রন্দনে সর্ব্বত্রই epic-এর বাস্তব-আবরণ ভেদ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কবির এরূপ আত্মগত ভাবের প্রাধান্য মহা-কাব্য-জাতীয় রচনার নয়, গীতিকবিতারই উপজীব্য। বাস্তবিক মধুসূদনের রচনা মহাকাব্য হিসাবে সফল হয় নাই; সফল হইয়াছে কেবল কাব্য হিসাবে, কাব্যের নূতন আদর্শকে আয়ত্ত করিয়া। অর্থাৎ নকল 'মহাকাব্য' না হইয়া তাঁহার রচনা যে অপূর্ব্ব বাংলা কাব্য হইয়াছে তাহা দোষের কথা নয়, সৌভাগ্যের বিষয়। ইহাই বিস্ময়কর যে, রবীন্দ্রনাথের মত lyric কবি, মধুসূদনের কাব্যের এই lyric ভাবটি গ্রহণ করেন নাই, ইহার epic আবরণ তাঁহাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। মহাকাব্য-হিসাবে ইহার অসম্পূর্ণতা আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল কাব্য-হিসাবে ইহার সার্থকতাকে।

নিছক মহাকাব্য-রচনার দিক্ দিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব মধুসূদনের মনের উপর কার্য্যকরী হয় নাই; কিন্তু এই স্বাধীনচেতা পুরুষ সাহিত্যে স্বাধীনতার যে মূলমন্ত্র খুঁজিতেছিলেন, নূতন শিক্ষার আলোক তাঁহাকে তাহার সন্ধান দিয়াছিল। বিদেশী সাহিত্য হইতে যে সব নূতন প্রয়োগের পরীক্ষা তিনি করিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই হয়ত পূর্ণাঙ্গ হয় নাই; কিন্তু তাঁহার সকল প্রেরণার মূলে ছিল কবিকল্পনার মুক্তির জন্য দুর্দ্ধর্ষ আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্য শুধু নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধি হিসাবে নহে, সাধনা হিসাবেও এই সকল রচনা মূল্যবান্; তিনি যাহা করিয়াছিলেন শুধু তাহাই নহে, যাহা করিবার প্রথম পথ দেখাইয়া-ছিলেন তাহাও ধরিতে হইবে।

কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্যই কাব্যের একমাত্র মূল্য নয়। পথিকৃৎ হিসাবে আমরা মধুসূদনকে স্মরণ করি, কিন্তু কেবল কবি হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব যে অনন্যসাধারণ তাহা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। বাংলা সাহিত্যে তিনি যে সকল নূতন ধরণের রচনার অবতারণা করিলেন, প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি না থাকিলে তাহার একটিকেও রূপ দিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি

হইতেছে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন। এই একটি বিষয়ের প্রয়োগ-নৈপুণ্য হইতেই তাঁহার অসামান্ত কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন যিনি করিয়াছিলেন, তিনি কত বড় প্রতিভাবান্ কবি, এবং এই ছন্দের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তাঁহার কবিত্ব-শক্তির কতখানি সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা বুঝিতে গেলে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচিত্র-বিপুল সঙ্গীত, যাহা ধরা-বাঁধা কাঠামোর মধ্যে ধরা দেয় না, তাহাকে আয়ত্ত করিতে কতখানি ক্ষমতার প্রয়োজন। বিদেশী ভাষার উৎকৃষ্টতম ও সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ছন্দ তৎকালীন অতিদুর্ব্বল ও অপরিণত বাংলা কাব্যের দেহে (শুধু অক্ষর গুণিয়া নয়, কানের সূক্ষ্মতায় ও প্রাণের অনুভবে) ধ্বনিত করিয়া তোলা যে কতখানি বিস্ময়ের ব্যাপার, তাহা কাব্যরসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদনের দুর্লভ কবিত্ব-শক্তি ছিল বলিয়াই তাঁহার নূতন ছন্দ পুরাতন ভাষায় এত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই সম্পূর্ণ অভিনব ছন্দ বাংলা কাব্যের চিরাগত রীতি ও প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার গতিও ফিরাইয়া দিল। ইহা শুধু কাব্যের ছন্দ-ভাণ্ডারে একটি নূতন ছন্দের দান নয়; এই প্রেরণার মূলে রহিয়াছে কবি-কল্পনার মুক্তি ও প্রকাশ-রীতির অবারিত স্বাচ্ছন্দ্য। ইহা শুধু বাংলা কবিতার পায়ের বেড়ি ভাঙে নাই, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পথেরও সন্ধান দিয়াছে, যাহার মুক্তি-মন্ত্র পরবর্ত্তী কবিদের অন্তরে নবসৃষ্টির সাহস ও স্বাধীন কল্পনার স্ফূর্ত্তি জাগাইয়া দিল। ভাবের দিক হইতে যেমন, তেমনি আবার কবিতার বহিরঙ্গ ভাষা ও ছন্দের ব্যাপারেও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বাংলা কবিতার আদিরূপ যে পয়ার এবং যাহা বাংলা ছন্দের মেরুদণ্ডস্বরূপ, সেই পয়ারের অন্তর্নিহিত শক্তি যে কত বৃহৎ, তাহা মধুসূদনই প্রথম দেখাইলেন। ইহার পরে অসামান্য ধ্বনি-বৈচিত্র্যে ও বিবিধ রূপের সমৃদ্ধিতে পয়ারের শক্তি বহু পরিমাণে বাড়িয়া গেল; শুধু একতারা নয়, বঙ্গভারতীর সপ্তস্বরা বাজিয়া উঠিল।

তাই এই অমিত্রাক্ষর-রচনা কেবল অভিনব কলা-কৌশলের প্রমাণ নয়, ইহাতে এইটি অপূর্ব্ব কবি-মানসের পরিচয়ও রহিয়াছে। অমিত্রাক্ষরের সঙ্গীত-তরঙ্গে ছন্দ-সরস্বতীর যে সপ্ততন্ত্রী বাজিয়াছে, তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? মধুসূদন কি কেবল ছন্দ-কুশলী, ছন্দ-ধ্বনির সুনিপুণ কলাবিদ্?

যে-অবস্থায় যে-ভাবে তিনি এই বিদেশী সঙ্গীতকে স্বদেশী ছন্দে ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় ছাড়া মহত্তর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদন যে ছন্দ-শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিয়া এই অপূর্ব্ব ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। যাহা সকল উৎকৃষ্ট কবিতার উৎস, যাহা কাব্যের ছন্দ-সঙ্গীতে রূপ গ্রহণ করে, সেই অকৃত্রিম ভাব-প্রেরণাই তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে স্পন্দিত হইয়াছে। তাই ইহার বিচিত্র ও অবারিত ঝঙ্কারের মধ্যেই আমরা কবিপ্রাণের প্রকৃত পরিচয় পাই; তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা অপেক্ষা এই আবেগের মধ্যেই আমরা তাঁহার কবি-কল্পনার মহত্ত্ব অনুভব করি। বাহিরের যে ছন্দোময় প্রকাশ, তাহা শুধু বাহিরের বেশ নয়, তাহা ইহার অন্তরের ভাব-মূর্ত্তি। কবির প্রাণে কবিতার যে আদর্শ রহিয়াছে, লোকাতীত কল্পনা-জগতে বিচরণ করিবার যে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, সর্ব্ববন্ধনমুক্তির যে অসীম আনন্দ তাঁহার কবি-চিত্তকে উদ্বেল করিয়াছে, মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ধ্বনির সাগরকল্লোলবৎ গম্ভীরমধুর প্রাণোচ্ছ্বাসে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। তাই মনে হয়, মধুসূদনের ভাবাবেগ ও কবিত্বশক্তির বিরাট নিদর্শন এই সঙ্গীত,—ইহাই তাঁহার কাব্য-কীর্ত্তি, সৃষ্টিসামর্থ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, নূতন সৃষ্টির পথ খুঁজিয়া পাইলেও, বাঙালীর কবি-প্রতিভা মহাকাব্য-রচনার অনুকূল ছিল না; বরং গীতি-সুলভ ভাব-প্রবণতার জন্য তথাকথিত মহাকাব্যগুলিতে classic সংযম অপেক্ষা romantic আবেগ ওতপ্রোত রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে, সে-যুগের মহাকাব্য-রচয়িতাগণ কাব্যের প্রেরণার জন্য আপনার মনোরাজ্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বাহিরের বস্তুজগতে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলেন, আত্মগত অনুভূতির মধ্যে নয়, ইতিহাস পুরাণের মধ্যে উপকরণ সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বাহিরের বাস্তব-আবরণের অন্তরালে, epic বা narrative রূপের পিছনে, তাঁহাদের কাব্যের সমস্তটাই মনঃসৃষ্টি, অন্তরগত ভাব-কল্পনার বিজয়গীতি, yric আবেগের অসীম আনন্দ। যে শক্তির স্ফূর্ত্তি ও সংস্কার-মুক্তির প্রেরণা বাংলা সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ খাতে সমুদ্র-গর্জ্জন আনিয়াছিল, নির্জ্জীব পয়ারকে সঞ্জীবিত ও পক্ষমুক্ত করিয়া মহাকাব্যের আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটি lyric আবেগ, প্রাণের দুর্দ্দমনীয় বিদ্রোহের উল্লাস।

বস্তু-জগৎকে অস্বীকার না করিলেও, তাহাকে হৃদয়ের ভাব ও চিন্তার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল সে যুগের কাব্য-সৃষ্টি। সেইজন্য একটি প্রচ্ছন্ন গীতি-কবিতার সুর সমস্ত রচনায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। বিহারীলালের প্রায় সমসাময়িক গীতি-কবিতায় এই সুরটি ক্রমশঃ আপন মূর্ত্তিতে অন্যান্য সমস্ত সুরকে অতিক্রম করিয়া অবশেষে বাংলা কাব্যের আসরে একক হইয়া পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বিদেশী ছাঁচে ঢালা মহাকাব্য বাঙ্গালীর ধাতে সহিল না, মহাকাব্য-রচনার প্রয়াস স্থায়ী হইল না। বাংলা সাহিত্যের অতি পুরাতন গীতি-কবিতার সুরটি, সমসাময়িক গীতি-কবিতার সুরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, পুনরায় নূতন আকারে প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। এবার আর পরকীয় ভাব রহিল না, কবি নিজস্ব সুরেই বিশিষ্ট সুখদুঃখের কথাকে নির্ব্বিশেষ রসধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

রোহিণী

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ইহা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন যে, প্রায় একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তাঁহার দুইটি উপন্যাসে, যেমন একদিকে সূর্য্যমুখী কুন্দ ও নগেন্দ্র, তেমনই অন্যদিকে ভ্রমর গোবিন্দলাল ও রোহিণী পরস্পরের পুনরুক্তিমাত্র না হইয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। এখানে কেবল অবস্থাভেদের কথা নয়, অন্তর্গত ভাবের পার্থক্যে প্রত্যেক চরিত্র-চিত্রের মূল-কল্পনাটি বিভিন্ন আকারে পল্লবিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই বিষবৃক্ষের রোপণ, উদ্‌গম ও মূলোচ্ছেদ চিত্রিত হইয়াছে; কিন্তু পৃথ্বী-মৃত্তিকার এক প্রদেশে তাহা যে-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, অন্যত্র সেরূপ হওয়া সকল সময়ে স্বাভাবিক নয়। কুন্দনন্দিনীর অবসান করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী, কিন্তু রোহিণীর বিনাশ ঘৃণ্য ও ভয়াবহ। বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অন্য কোনও নায়িকার প্রতি এরূপ অপরিসীম নির্ম্মমতা দেখান নাই। শৈবলিনী ও রোহিণী এই উভয়কেই তিনি পাপীয়সী বলিয়াছেন; শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে কুৎসিত পরিণামের অতলে ডুবাইয়া রোহিণীর মত নিষ্ঠুরভাবে হত্যার হস্তে সমর্পণ করেন নাই।

কিন্তু রোহিণীর এই পরিণাম হইল কেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে কঠোর নীতিদর্শী বলিয়াছেন, কিন্তু রোহিণীর দুর্ভাগ্যকে কেবল পাপের শাস্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গত হইবে না। তাহা যদি হয়, তবে নিষ্পাপ ভ্রমরও কেন শাস্তি ভোগ করিয়াছে? বিভিন্ন প্রকারে উভয়েরই ভাগ্যে অবশেষে মৃত্যুদণ্ড আসিয়াছে। রোহিণীর পাপ স্বীকার করিয়া লইলেও, অনভিজ্ঞ বালিকার অভিমান ও অবিমৃশ্যকারিতা তাহার সহিত কি সমান দণ্ডে দণ্ডিত হইবে? তাহা হইলে মূল প্রশ্ন হইতেছে, এই দুইটি জীবনের যে tragedy বা বিয়োগান্ত পরিণাম, তাহার জন্য দায়ী কে?

গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা সমর্থন করিয়া অনেকে বলিবেন যে কৃষ্ণকান্তের উইলই সকল সর্ব্বনাশের মূল। একদিক দিয়া দেখিলে ইহা সত্য বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু জীবনের কোনও শোচনীয় পরিণতি

কেবল বাহ্যিক ঘটনার অনির্দ্দিষ্ট নিয়তির উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলে মানুষের ভাব, চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির কোন মূল্যই থাকে না। মানুষ অবস্থার দাস বটে, কিন্তু অবস্থার নিয়ন্ত্রণ তাহার শক্তির একেবারে বহির্ভূত নহে। কেবল ঘটনা-পরম্পরা নয়, অন্তর্গত ভাবনাও মানুষের জীবন-চক্রকে চালিত করে।

কৃষ্ণকান্তের উইলকে মুখ্যতঃ দায়ী না করিলে বলিতে হইবে যে, ভ্রমর, রোহিণী ও গোবিন্দলাল, ইহাদের মধ্যে একজন অথবা তিন জনই হয়ত সমানভাবে দায়ী। ইহা সত্য যে তিন জনই বিভিন্ন প্রকারে বিষবৃক্ষের ফলভোগী, এবং আংশিকভাবে নিজের ও পরস্পরের শান্তিকে সুগম করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে একের দোষ অন্যকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু সত্যই কি তিন জনে সমানভাবে দায়ী ?

বয়স ও সাংসারিক জ্ঞান হিসাবে ভ্রমর নিতান্ত বালিকা; সুতরাং তাহার দুর্জ্জয় অভিমান ও চিন্তাহীনতার পরিণাম যে কোথায় দাঁড়াইবে, তাহা সে তাহার সরলতায় প্রথমে বুঝিতে পারে নাই; পরে বুঝিয়াও বোঝে নাই। সে স্বামীকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত; কিন্তু স্বামীকে চিনিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাই, যখন তাহার অগাধ বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিতে আঘাত লাগিল, তখন সে আর কিছু বোঝে নাই, কেবল বুঝিয়াছিল যে তাহার কপাল ভাঙিয়াছে। ইহার বেশি কিছু বুঝিবার সময়, শক্তি বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। তাই ক্রোধে, দুঃখে, দম্ভে ও অভিমানে চিন্তাশূন্য হইয়া স্বামীকে লিখিল—"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।" এমন কি, রোহিণীর মৃত্যুর পরও, গোবিন্দলাল যে পাপী ও হত্যাকারী এ কথা ভ্রমর ভুলিতে পারে নাই; কোনও দিন বলিতে পারে নাই—হোক সে পাপী, হোক সে হত্যাকারী, তবুও সে আমার স্বামী, সে আমার আপনার। ভালবাসা দিয়া, দরদ দিয়া কোনও দিন সে কোনও ক্ষত ঢাকিয়া দিতে পারে নাই, কোনও অপরাধ অশ্রুজলে মুছিয়া দিবার চেষ্টা করে নাই। গোবিন্দলাল নিজেও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে ভ্রমর এরূপ চিঠি লিখিতে পারে; সাবিত্রী যে শাড়ি ছাড়িয়া গাউন পরিবে, তাহা তাহার কল্পনারও

অতীত। ভ্রমর যদি তাহাকে বোঝে নাই, সেও কোন দিন ভ্রমরকে বোঝে নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই। তাহার মনে তখন অন্য চিন্তার বীজ পল্লববিস্তার করিয়াছিল; সুতরাং তাহার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না যে, ভ্রমরের এই মনের অবস্থার জন্য সে নিজে কত অপরাধী, বিশ্বাস-ভঙ্গের কত বড় আঘাত তাহার সরল নিশ্চিন্ত মনে লাগিয়াছে। ভ্রমরের আত্মঘাতী অভিমান হয়ত খুব বড় একটি ভুল করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার এই মনের অবস্থার জন্য প্রথম হইতেই গোবিন্দলাল দায়ী। গোবিন্দলালের প্রশ্রয়ে ও আদরে তাহার মনের বয়স কোনও দিন বাড়ে নাই। ভ্রমর তাহার খেলার পুতুল ছিল—এ কথা ভ্রমর নিজেও বলিয়াছে; তাই সে হাসিতে পটু হইলেও কোনও দিন স্নেহের শাসনে পটু হয় নাই, গোবিন্দলালের অস্থির চিত্তকে আত্মবিস্মৃতা নারীর গভীর প্রেমে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। ভ্রমরের পিত্রালয়গমন ও সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ—উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য রহিয়াছে। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথের ভাব-বন্ধনের মত ভ্রমর ও গোবিন্দলালের ভালবাসা বহুদিনের নিবিড়বদ্ধ পরিচয়ে পরস্পরের ভাবজ্ঞ ছিল না; নিজের বা পরের মর্য্যাদাশীল ও ক্ষমাপ্রবণ ত ছিলই না। ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণ অসত্য ছিল না, কিন্তু বন্ধনের লঘুতায় তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। ভ্রমরকে গোবিন্দলাল ক্ষমা করিল না, কিন্তু ভুলিতে পারিল না; অন্য আকর্ষণ প্রবলতর হইয়া ভাগীরথী-জলতরঙ্গে ক্ষুদ্র তৃণের মত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাই নগেন্দ্রনাথের মত গোবিন্দলাল কোনও দিন বলিতে পারে নাই—"সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব।...আমার সূর্য্যমুখী—কাহার ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে?" আত্মসংযমের অভাবে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গোবিন্দলাল কেবল বলিয়াছে—"আমি মরিব, ভ্রমর মরিবে।" এই নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া দুর্ব্বল চিত্তের আত্মপ্রবঞ্চনা আছে, আত্মজয়ের আড়ম্বর আছে, কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা নাই। সে ইচ্ছাপূর্ব্বক মনকে সান্ত্বনা দিল, ভ্রমরকে ভুলিবার, ভ্রমরের স্পর্দ্ধা ভাঙিবার প্রকৃষ্ট উপায়—রোহিণীর চিন্তা।

তাই, 'পতঙ্গবদ্‌ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' গোবিন্দলাল আগুনে ঝাঁপ দিল, কিন্তু

আগুনে ঝাঁপ দিবার মত শক্তি ও দৃঢ়চিত্ততা তাহার ছিল না; দুঃসাহস ছিল, কিন্তু তাহার অনুরূপ বলিষ্ঠতা ছিল না। স্রোতের মুখে গা ঢালিয়া দেওয়া যেরূপ সহজ, তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করা সেইরূপ প্রয়াসসাধ্য; গোবিন্দলালের পক্ষে সহজ পথই স্বাভাবিক। সেইজন্য, নগেন্দ্রনাথ বা ভবানন্দের যে নিষ্কপট মর্ম্মস্পর্শী আত্মসংগ্রাম দেখিতে পাই, গোবিন্দলালের তাহা নাই। রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাহার হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছিল; ভ্রমরের ভুল ও রোহিণীর আবির্ভাব তাহাকে যে সুযোগ দিয়াছিল তাহা চরিতার্থ করিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইল না। কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিবর্ত্তন এই সুযোগের একটি উৎকৃষ্ট কৈফিয়ৎ হইয়া ব্যাপারটিকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। দ্বিধার আর অবকাশ রহিল না; "আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা" সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতার "ক্ষমা কর, আমি বালিকা" এই অসহায় ক্রন্দনের উত্তরে রোহিণীর রূপমুগ্ধ গোবিন্দলাল অনায়াসে বলিল—"আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।" সাবিত্রীর গাউন পরা সহিল না; গাউনের নীচে যে চিরাভ্যস্ত শাড়ি উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, শেষে তাহাই তাহার দেহের ও মনের স্বাভাবিক আবরণ হইল। আধুনিক সত্যবান ক্ষমা করিল না, সাবিত্রীও স্বামীকে বাঁচাইতে পারিল না, মৃত্যুকে জয় করিতে পারিল না; মৃত্যু জয়ী হইল। তথাপি মরণেও তাহার সাহসের অভাব ছিল না; স্বামীর পদযুগল স্পর্শ করিয়া পদধূলি লইয়া অবশেষে বলিল—"আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল ধনীর সন্তান হইলেও উচ্ছৃঙ্খল ছিল না; কিন্তু সে নিজের প্রবৃত্তির পথে কখনও কোন বাধার সম্মুখীন হয় নাই, আত্ম-সংযমের ইচ্ছা বা অভ্যাস তাহার ছিল না। তাই প্রথম জীবন-সঙ্কটে দারুণ মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলেও নিজেকে সামলাইবার আন্তরিক প্রয়োজন সে অনুভব করে নাই, উপায়ও জানিত না। প্রথমে ভদ্রতা, সহৃদয়তা অথবা বংশোচিত মর্য্যাদা-জ্ঞানের অভাব ছিল না; তাই সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, মরিতে হয় মরিবে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী হইবে না। কিন্তু দুর্ব্বল চিত্তের এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ যৌবনের "উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল" মনোবৃত্তির প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং ভ্রমররূপ অন্তরায় ক্রমশ অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বারুণীর তীরে যখন জলমগ্না

রোহিণীকে সে বাঁচাইল, তখন তাহার স্বভাব-কোমল ও প্রলোভন-উন্মুখ চিত্ত বিচলিত হইলেও সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয় নাই। তখন তাহার মনে হইয়াছিল—এই অপরূপ সুন্দরীর আত্মঘাতের মূল সে নিজেই; আত্মছলনার বশে এরূপ চিন্তার যে বেদনা, তাহাতেও সুখ আছে। সত্য হউক বা ছলনা হউক, দুঃখময় সুখের স্মৃতি কোমল ও দুর্ব্বল চিত্তের কাছে এত মধুর যে তাহাকে জোর করিয়া তাড়াইলেও সে যায় না। কিন্তু এতটা হইত না, যদি ঘটনা-পরম্পরায় ভ্রমরের পিত্রালয়-গমন ও কৃষ্ণকান্তের উইল-পরিবর্ত্তনের সুযোগ ও সুবিধা আপনা হইতে আসিয়া না জুটিত, এবং চঞ্চল প্রবৃত্তির পথ আরও সুগম করিয়া না দিত। যাহা স্মৃতিমাত্র ছিল, তাহা কাল্পনিক দুঃখে পরিণত হইল; এবং দুঃখ হইতে কামনা আপন নগ্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ভ্রমরের কাছে সে যে অপরাধী তাহা গোবিন্দলালের অজ্ঞাত ছিল না, তাই যাইবার পূর্ব্বে ভ্রমরের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাহস হইল না; কিন্তু তখন আর তাহার ফিরিবার পথ ছিল না।

ভ্রমর ত মরিল, নিজের সর্ব্বনাশের ত কিছুই বাকি রহিল না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল রোহিণীকেও ডুবাইল। যে আপনি ডুবিতে উন্মুখ ও অগ্রসর, তাহাকে অধঃপতনের সর্ব্বনিম্নস্তরে লইয়া যাইতে তাহার দ্বিধা বা বিলম্ব হইল না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, রোহিণী প্রথম হইতেই কেবল কুৎসিত লালসার বশবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দলালের অনুগামী হইয়াছিল। তাহা যদি হয়, তবে উপন্যাসের প্রারম্ভে রোহিণীর বিবরণে যে কাব্যাংশের অবতারণা, তাহার কোনই অর্থ হয় না। বারুণীর তীরে, কোকিলের কুহুরবের সঙ্গে, মধুমাসের মাদকতার পরিবেষ্টনীর মধ্যে পরিপূর্ণ-যৌবনা রোহিণীর যে রূপচ্ছবি, তাহা সেই বসন্তের কুসুমসম্ভার ও কোকিলের পঞ্চমে-বাঁধা কুহুরবের সহিত একই সুরে বাঁধা। এই অপরূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-কল্পনা যেরূপ চরম সীমায় গিয়াছে, তাহা তাঁহার উপন্যাসের অন্যত্র বিরল:

"রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চন-গৌর—স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল, সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়,

যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে ; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুরবাঁধা বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতিনিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল—"কু উ।" তখন রোহিণী সরোবর-সোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।"

যে সুন্দরীকে সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টা তাহার সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ, এবং কুহুরবের পঞ্চমের সঙ্গে আপনার উচ্ছ্বসিত কল্পনাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাকে শেষে তিনিই পাপীয়সী রাক্ষসী বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু এই গালিই শেষ কথা নয়। রমণীরূপলাবণ্য গোবিন্দলালকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, কিন্তু তাহার কবি-স্রষ্টাকেও আপনার অজ্ঞাতে আকৃষ্ট করিয়াছে ; তাহাতেই এই গালির সার্থকতা। "অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র ; দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, কিন্তু চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল।" কিন্তু শেষে যে কালিমা-লেপনের দ্বারা চিত্র ও চিত্রপট উভয়ই লুপ্ত হইল, তাহাতে মনে হয়, রোহিণীর চরিত্রে যে অপরূপ সম্ভাব্যতা ছিল, তাহা উপন্যাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ফুটিবার অবকাশ পায় নাই।

রোহিণী বৈধব্যের কোনই নিয়মশাসন মানিত না; তাহাকে শাসন করিবারও কেহ ছিল না। যৌবনের চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে নারীসুলভ ভাবভঙ্গি ও অশিক্ষিতপটুত্বের জন্য তাহার ব্যাপিকা-অপবাদ বিচিত্র নয় ; কিন্তু হরলালের সহিত তাহার যে ব্যবহার তাহা হইতে জানা যায় যে, একটি নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইলেও, অসৎপ্রবৃত্তি বা কুটিলতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ নয়। অর্থের প্রলোভন তাহাকে লুব্ধ করে নাই ; এমন কি, যখন সে হরলালের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, তখন আশাভগ্ন হইয়াও তাহাকে সম্মার্জ্জনী দেখাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু গোবিন্দলালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ যে-পরিবেষ্টনীর মধ্যে হইয়াছিল, তাহাতে তাহার যৌবন-সুলভ কল্পনা তাহার

মানসচক্ষে আঁকিয়া দিয়াছিল—"বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোকপ্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনির্ম্মিত" এক অপূর্ব্ব দুর্লভ "দেবমূর্ত্তি"। এই চিত্র দিন দিন নানা অনুকূল ঘটনার মধ্যে তাহার হৃদয়পটে গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইয়া একাধারে তাহার সর্ব্বকামনার ও সর্ব্বদুঃখের মূল হইয়া দাঁড়াইতেছিল। কিন্তু যৌবন-স্বপ্নের নেশায় মশগুল হইয়া তখনও সে ভাবিয়া দেখে নাই—এই দেবমূর্ত্তি কি মৃত্তিকায় গঠিত। তখন সে ভাবিতেছে—"রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না; আশাও নাই।...চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।" আশাহীন দুঃখে সে মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল; কিন্তু সংস্কৃত নাটকের রত্নাবলীর মত, মরিতে গিয়া সে বাঞ্ছিতের বাহুপাশে সঞ্জীবিত হইয়া আবার নূতন মরণে মরিল। পাপ-পুণ্যের কথা সে শেখে নাই, পাপ-পুণ্যের কথা সে জানিত না—এ কথা সে নিজেই বলিয়াছে। যে ভালবাসা তাহার হৃদয়ে প্রথম বহ্নিজ্বালা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তখনও পাপ-পুণ্যের অতীত; কিন্তু তাহার পাবক-পরশ তাহাকে পোড়াইল, মনের কালিমা ঘুচাইল না। তাই নিদারুণ যন্ত্রণায় সে ডাকিল—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়, আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর; আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না।"

বন্ধনহারা কিন্তু বন্ধনলিপ্সু যুবতীর তৃষাতাড়িত হাহাকার তাহাকে যে পথে লইয়া গেল, তাহা হইতে আর ফিরিবার উপায় তাহার ছিল না। ভ্রমরের চেয়ে রোহিণী গোবিন্দলালকে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, এবং সে বোঝা তাহার অনুকূলেই ছিল। তবুও সে জানিত, গোবিন্দলাল ভ্রমরকে সত্য সত্যই ভালবাসে, তাহার নিজের প্রতি যে আকর্ষণ তাহা ক্ষণিকের মোহ মাত্র। তাই ভ্রমরের সুখ তাহার সহ্য হইল না; ঈর্ষার উত্তেজনায় পুঁটলি হাতে লইয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া আসিল। আত্মসুখের কামনা তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। সে ভাবিল—"কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড?" অসামান্য রূপ, উদ্দাম যৌবন,—সকলই কি ব্যর্থ হইবে? তাহারও কি সুখের অধিকার নাই? যে-সুখ তাহার রূপ ও যৌবনের প্রাপ্য, তাহা সে সহজে ছাড়িবে কেন? এদিকে, অনুকূল পবনে চালিত, তরঙ্গভঙ্গে বিভিন্ন হইয়াও

গোবিন্দলালের তরণী তাহারই কূলে আসিয়া ভিড়িল। ধৈর্য্যহীন কামনা বর্ত্তমানেরই কথা ভাবে, ভবিষ্যতের চিন্তা করে না; রোহিণীও তাহা করে নাই।

তাহার অনিবার্য্য ফলভোগও তাহাকে করিতে হইল। নিতান্ত ক্ষোভে ও দুঃখে ভাঙিয়া পড়িলেও, ভ্রমর গোবিন্দলালকে ঠিকই বলিয়াছিল—"তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" গোবিন্দলালের দুর্ব্বল চিত্ত, সকল মানসমোহিনী রমণীর মত, রোহিণীর অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু সুখের অতিরঞ্জিত আশায় সে অন্যরূপ ভাবিয়াছিল। ভ্রমর যখন গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল, তখন গোবিন্দলালের নিতান্ত অসার, আত্মসুখান্বেষণে লোলুপ ও নিষ্ঠুর চিত্ত ভাবিয়াছিল—"এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।" কিন্তু রূপ-সেবাকে যে এরূপ লঘু করিয়া ভাবিতে পারে, তাহার নিকট একাগ্রতা বা আন্তরিকতা আশা করা যায় না। রূপ-সাধনার শক্তি তাহার ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, গোল্লায় যাইতেছি, যাইব; কিন্তু গোল্লায় যাওয়াও নিতান্ত সহজ নয়। বক্ষের তলে যাহার প্রাণ নাই, চরিত্রে স্থৈর্য্য নাই, ত্যাগের কথা দূরে থাক, ভোগ ভুঞ্জিবার ক্ষমতা সে কোথায় পাইবে?

ফলেও তাহা হইল। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের যে আকর্ষণ, তাহা অসত্য ও অসার ছিল বলিয়াই অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সেইজন্য, ব্রাউনিংএর কবিতার কোনও নায়কের মত, গোবিন্দলাল রূপ-সেবার স্পর্দ্ধা করিলেও, শেষে অকুণ্ঠভাবে বলিতে পারে নাই—

How sad and mad and bad it was,
But then, how it was sweet!

যদি রূপ-সেবাই তাহার সঙ্কল্প হইল, যদি রোহিণীর জন্য ভ্রমরকে সে অনায়াসে ত্যাগ করিল, তবে রোহিণী ও রূপ-সেবা তাহার দেহপ্রাণমন পূর্ণ করিতে পারিল না কেন? তাহার কারণ, ভ্রমরকে যেরূপ, রোহিণীকেও সেইরূপ, সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করে নাই। প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল যখন রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনও ভ্রমরের চিন্তা তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিত। তাহার চঞ্চল চরিত্রে ভাবের বিস্তার বা ঐকান্তিকতা ছিল না; অতিস্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ঊর্দ্ধে তাহার কামনা পক্ষবিস্তার করিয়া মুক্ত হইতে পারে নাই। ক্ষুদ্র দাবিদাওয়ার তুচ্ছতা ছাড়িয়া দিয়া প্রসন্ন প্রীতির অবাধ আলোকে সে কোনদিন নিজে দাঁড়াইতে

পারে নাই, রোহিণীকেও দাঁড় করাইতে পারে নাই। সে মানসিক বল, সে idealism, সে অতীন্দ্রিয় কল্পনা, পরিমার্জ্জিত চিত্তের সে সহজ উৎকর্ষ তাহার ছিল না; তাহা যদি থাকিত, তবে নিজেও অধঃপতিত হইত না, রোহিণীকেও অধঃপতিত করিত না। রোহিণীকে সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছিল; তাহার বেশি দিবার প্রবৃত্তি বা সঙ্গতি তাহার ছিল না। উভয়ের সম্বন্ধের মধ্যে কোনও শ্রদ্ধা, কোনও মায়া, কোনও সত্য ছিল না। রোহিণী জানিত যে যতদিন গোবিন্দলাল তাহাকে পায়ে রাখিবে, ততদিন সে তাহার দাসী, তাহার বিলাসের সামগ্রী, নহিলে কেহ নয়। ইহাতে তাহার নিজের সম্মান বাড়ে নাই, বরং দিন দিন নিম্নস্তরে নামিয়াছিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে লঘু করিয়া দেখিয়াছিল বলিয়াই নিজে লঘু হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে রোহিণীকেও লঘু হইতে লঘুতর করিয়াছিল। তাই যে-রোহিণী একদিন তাহার চক্ষে ছিল "তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী, প্রভাতশুক্রতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী", আজ তাহাকে সুরুচিবিগর্হিত-চিত্র-সজ্জিত কক্ষে সামান্য গণিকার মত ওস্তাদজীর তম্বুরার সঙ্গে তবলা বাজাইয়া, অলস ক্ষণের বিলাসের ক্রীড়াপুত্তলী করিতে তাহার কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ হয় নাই। ইহাই বোধ হয় তাহার আমোদ-প্রমোদের চরম ধারণা! অবশ্য, রোহিণী ঠিক গ্রামের লজ্জাশীলা বধূ ছিল না; কিন্তু যৌবনচঞ্চলা ও স্বভাবচতুরা হইলেও, গোবিন্দলালের আশ্রয়ে শহরের বাইজীর মত জীবন-যাপনও তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। যখন সে বাধাদ্বিধাহীন হইয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিল, গোবিন্দলাল বুঝি পারাবার; কিন্তু অতলে ডুবিতে গিয়া সর্ব্ব দেহে ও মনে পঙ্কের ভার মাখাই তাহার সার হইয়াছিল। যে-রোহিণী একদিন মরিতে ভয় পায় নাই, আজ তাহার নিষ্কৃতির সহজ উপায় যে মরণ, তাহাতে আর সাহস নাই। দুঃখ-ক্রোধের বেগে গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি, রোহিণী, যে তোমার জন্য ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত যে ভ্রমর—তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম?" ভ্রমরের জন্য আক্ষেপ, স্বাভাবিক হইলেও, যেমন নিরর্থক, রোহিণীর উপর দোষারোপও সেইরূপ অবিচারিত ও অমনুষ্যোচিত। সুতরাং, যাহাকে পঙ্কে টানিয়া আনিয়া দেহে মনে নগ্ন করিয়াছে, সে অসহায় জীবন-ভিক্ষায় কাতর স্ত্রীলোক হইলেও, তাহাকে অনায়াসে হত্যা করিয়া বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবনে পলাইয়া বাস করা, তাহার

পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। তাহার মনুষ্যত্বহীনতা সেইদিন চরম সীমায় উঠিল, যেদিন সামান্য ভিক্ষুকের মত ভ্রমরের নিকট আশ্রয় ও অর্থ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না।

রোহিণীর এই অধঃপতনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র বিবৃত করেন নাই, আভাসে দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু "মহাপাপিষ্ঠা" বলিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। এ কথা বলিতেছি না যে রোহিণী নিরপরাধ, কিন্তু ইংরেজীতে যাহাকে more sinned against than sinning বলে, হতভাগ্য রোহিণী তাহার শোচনীয় নিদর্শন। যে দুইটি নারীর করুণ জীবন-কাহিনী লইয়া সমগ্র ঘটনাচক্রের গভীর tragedy বা বিয়োগান্ত পরিণাম, গোবিন্দলাল মূলে না থাকিলে সে চক্র ঘুরিত না। কিন্তু তাহারা মরিল, গোবিন্দলাল শেষে পরম শান্তির অধিকারী হইল,—ইহাই কি নিয়তি?

অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতা

কবি বিহারীলালের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার এই দুইজন কবিই তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে কবিগুরু বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই দুই কবির তরুণ রচনার উপর বিহারীলালের কবিতার প্রভাব কতখানি এবং বিহারীলাল এই দুই কবিকে কি কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোনও সমালোচনা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা আমাদের প্রবন্ধের বিষয় নয়; কিন্তু অক্ষয়কুমারের প্রতিভার উন্মেষে বিহারীলালের কবিকল্পনা কতদূর সহায়তা করিয়াছিল, তাহার কিছু আলোচনা না করিলে অক্ষয়কুমারের কাব্য-সাধনার গতি ও প্রকৃতির সম্যক পরিচয় দেওয়া যাইবে না।

বিহারীলালের প্রথম রচনা 'স্বপ্নদর্শন' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার কাব্য-জীবন পুস্তকাকারে 'সারদামঙ্গল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল বলিলে অসঙ্গত হইবে না; কিন্তু কবি ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অক্ষয়কুমারের জন্ম ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, এবং বিহারীলালের জীবদ্দশায় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থ 'প্রদীপ (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫) ও 'ভূল' (১৮৮৭) রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাস্তবিক অক্ষয়কুমারের কাব্যজীবন বিহারীলালের প্রভাবের মধ্যেই অঙ্কুরিত, পরিপুষ্ট ও ফলবান হইয়াছিল।

উল্লিখিত তারিখগুলি আর এক হিসাবেও প্রণিধানযোগ্য। রঙ্গলালের প্রথম গ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান'ও প্রকাশিত হইয়াছিল বিহারীলালের প্রথম গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, এবং তাঁহার শেষ গ্রন্থ 'কাঞ্চীকাবেরী'র তারিখও, বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র তারিখের মত, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। মাইকেলের প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ইংরেজী 'রত্নাবলী' ও তাঁহার 'শর্ম্মিষ্ঠার' তারিখ ১৮৫৯; কিন্তু তিনি অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়ু ছিলেন এবং তাঁহার শেষগ্রন্থ 'মায়াকাননে'র তারিখ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

এই তারিখগুলি লক্ষ্য করিলে এই কথাটি বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, রঙ্গলালের উপাখ্যান-কাব্য ও মাইকেলের ইংরেজী ধরণের মহাকাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলাল-প্রবর্ত্তিত গীতি-কাব্যের ধারাও প্রায় একই সময়ে বঙ্গসাহিত্যে

প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। ইহারা কেহই ভারতচন্দ্র বা ঈশ্বর গুপ্তের বংশধর ছিলেন না; কিন্তু বিহারীলাল এই নূতন ধারাটি সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে আমদানী করিয়াছিলেন, একথাও বলা যায় না। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে অভিজ্ঞ হইলেও, বিহারীলাল যে রঙ্গলাল ও মাইকেলের মত য়ুরোপীয় সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বিহারীলাল তাঁহার হৃদয়-বীণায় যে স্বতন্ত্র সুরটি প্রথম বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং যে-সুর পরবর্ত্তী সময়ে অন্য সমস্ত সুরকে ছাড়াইয়া বঙ্গসাহিত্যের আসরে একক হইয়া বিরাজ করিল, সে সুরটি যে তাঁহার নিজস্ব, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

কিন্তু গীতি-কবিতা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন নয়; বিহারীলাল শুধু প্রাচীন সুরকে নূতন করিয়া আপনার একতারাটিতে অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে বাজাই-লেন। কিন্তু এই নূতনত্ব সেই যুগের ক্রমবর্দ্ধনশীল গীতাত্মক ব্যক্তিতন্ত্রতার সহিত খাপ খাইয়াছিল এবং সেইজন্য স্থায়ী হইয়া পরবর্ত্তী সময়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, সে-কালের মহাকাব্য-রচয়িতাগণ, কাব্যের প্রেরণার জন্য, আপনার মনোরাজ্যে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বাহিরের বস্তু-জগতে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলেন; আত্মগত অনুভূতির মধ্যে নয়, ইতিহাস-পুরাণের মধ্যে কাব্যের উপকরণ সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বাহিরের বাস্তব-আবরণের অন্তরালে, epic বা narrative আকৃতির পিছনে তাঁহাদের কাব্যের সমস্তটাই ছিল অপূর্ব্ব মনঃসৃষ্টি, আত্মগত ভাব ও কল্পনার বিজয়-গীতি, lyric-আবেগের অসীম আনন্দ। বস্তু-জগৎকে অস্বীকার না করিলেও সে-যুগের কবিগণ তাহাকে নিজের হৃদয়ের ভাব ও চিন্তার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা এক প্রকার কল্পনা-বিলাস ও বাস্তব-বিমুখতা, যাহা বাস্তব হইতে অবাস্তবে স্বপ্নপ্রয়াণ করিয়াছিল, সমস্ত জগৎকে আত্মচিন্তায় আত্মসাৎ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় আবিষ্কার করিতেছিল। সে-যুগের এই দেশকালনিরপেক্ষ আত্মতন্ত্র সাধনার প্রচ্ছন্ন সুরটি বিহারীলাল তাঁহার প্রাণের নিভৃত স্পন্দনে অনুভব করিয়াছিলেন, এবং অপূর্ব্ব প্রতিভা-বলে এই সুরটিকে নিজস্ব করিয়া বঙ্গভারতীর বীণায় আবার নূতন করিয়া বাজাইলেন। সেইজন্য, যখন য়ুরোপীয় ছাঁচের মহাকাব্য ভাবপ্রাণ বাঙালীর ধাতে সহিল না, এবং নভেলের অভ্যুদয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান-কাব্যের আসর

জমিল না, তখন বাংলা সাহিত্যের পুরাতন গীতি-কবিতার সুরটি পুনরায় প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু এবার আর পরকীয় ভাব রহিল না, কবি নিজস্ব সুরেই নিজের বিশিষ্ট সুখদুঃখের কথাকে নির্ব্বিশেষ রসধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

এই আত্মতন্ময়তা ও ভাব-নিমগ্নতাই বিহারীলালের একান্তগীতিপ্রাণ কবি-প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। অশরীরী সৌন্দর্য্য ও প্রেম-কল্পনার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া কবি নাভিগন্ধী হরিণের মত আপনার সৌরভে আপনি পাগল—

প্রেমের প্রসন্নমুখ, সারদার স্তোত্রগান,
এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান! (সাধের আসন)

প্রেম ও সৌন্দর্য্য এই দুই কেন্দ্রগত ভাবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত আত্মগত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও বেদনা, তাঁহার মনের মধ্যে এক অপরূপ কল্পনা-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার অতীন্দ্রিয় ও অপরিমেয় সুষমার ধ্যানে আমাদের বিজনবাসী, কল্পনাবিলাসী কবি বিভোর ও আত্মনিমগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু নিছক ভাবপন্থী হইলেও বিহারীলাল কখনও বাস্তব-জগৎ ও জীবনের সংযোগ ছিন্ন করেন নাই; তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী কল্পলোকের মায়াসৌন্দর্য্য অভিষিক্ত হইলেও, তাঁহার সমস্ত বাস্তব-অনুভূতির বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। স্বপ্নের মধ্যে এই সত্যোপলব্ধির প্রয়াস, ভাবের মধ্যে বস্তুর অন্বেষণ, বাহিরের সুখদুঃখের মধ্যে অন্তরের ধ্যানধারণার প্রতিষ্ঠা ইহাই বিহারীলালের কবিকল্পনার বিশেষত্ব।

বিহারীলাল অক্ষয়কুমারকে যে কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই ভাবকল্পনার নিরুদ্বেগ আনন্দের সঙ্গে বাস্তব-বেদনার নিবিড় অনুভূতিও ছিল। সেইজন্য প্রথম হইতেই তাঁহার কাব্যে এই বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব, এই স্বপ্ন ও সত্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাই।

বিহারীলালের কবিতার মত, অক্ষয়কুমারের কবিতার ভাববস্তু—প্রেম ও সৌন্দর্য্য। "রমণীর প্রেমমুখ" ও "প্রকৃতির শ্যাম বুক" তাঁহাকে প্রথম হইতেই বিভোর করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কাব্য-সাধনার প্রথম যুগের কবিতাগুলিতে তিনি প্রধানতঃ স্বপ্নবিলাসী, একান্তকল্পনাপ্রাণ, মানস-মূর্ত্তির আত্মগত ভাবনায় আত্মবিস্মৃত—

কি যেন স্বপনে হারাই আপনে
মনে ত থাকে না এ ধরাতল! (ভুল পৃঃ ৪৯, কনকাঞ্জলি পৃঃ ১০)

ভাবপ্রধান চিত্তের এই তন্ময়তাকে বিহারীলাল অপূর্ব্ব যোগ-মত্ততা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

বিচিত্র এ মত্তদশা ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে ! (সারদামঙ্গল)

মন্ত্রশিষ্য অক্ষয়কুমার বিহারীলালের এই নিগূঢ় মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। বিহারীলালের মৃত্যুর পর অক্ষয়কুমার তাঁহার উদ্দেশে যে শোকগীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এ কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

বুঝিয়াছি, গুরো, কিবা শ্রেয় ভবে,
কি যোগ-মত্ততা কবিত্ব-সৌরভে !
সুখদুঃখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি' !

সেইজন্য অক্ষয়কুমারের প্রথম রচনাগুলিতে বাস্তবাতিরিক্ত কল্পনার উল্লাসই বেশী। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' ও 'ভগ্নহৃদয়' হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' পর্য্যন্ত কাব্য-সাধনার প্রথম যুগের রচনার মধ্যেও এই মনোভাবটি দেখা যায়। Romanticismএর প্রথম উন্মেষে ভাবাতিরেকের এই উন্মত্ততাকে Werterism বলিয়া কার্লাইল উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু এই Werterism বা 'ভগ্নহৃদয়ের' ভাবপ্লাবন স্বভাবতঃ বস্তুতান্ত্রিক য়ুরোপীয় কবির মধ্যে বিসদৃশ ঠেকিলেও কল্পনাপ্রাণ বাঙালী কবির রচনায় শুধু উচ্ছৃঙ্খল ভাব-বিপ্লবে পর্য্যবসিত হয় নাই। কারণ এই আনন্দ-কল্পনা তাহার নিকট মানস-সত্য। যে স্বভাবতই কল্পলোকবাসী, তাহার নিকট কল্পলোকের সুখ-দুঃখ শুধু ছায়া-শরীরী নয়, চিন্ময় সত্যের সৌন্দর্য্যে সমুদ্ভাসিত।

এই সংকল্প-সৌন্দর্য্যের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তজ্জনিত আনন্দ ও নৈরাশ্য, 'সারদামঙ্গলের' প্রথমাংশের মত, অক্ষয়কুমারের 'ভুল' ও 'কনকাঞ্জলি'র অধিকাংশ কবিতার প্রাণবস্তু। অন্তরে ও বাহিরে ক্ষণভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেও, এই ছায়াসৌন্দর্য্য কায়াযুক্ত মানবচিত্তের অনধিগম্য; সেইজন্য সৌন্দর্য্যের মানসমূর্ত্তির ভাবনায় অনায়ত্ত অসীমতার অফুরন্ত আনন্দ আছে, কিন্তু দেহ ও প্রাণের পরিতৃপ্তি নাই। কারণ, ইহাকে রূপ ও রসের সীমানায় বিশিষ্ট বিগ্রহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধরা যায় না। সুতরাং অপূর্ণ প্রয়াসের ব্যাকুলতা ও নৈরাশ্য ভাবাতিরেকে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—

কেহ পরিবে না যদি মালা,
মিছে কেন কাঁদি' ফুল তুলি।
কেহ যদি শুনিবে না গান,
মিছে দুখে আকুলি ব্যাকুলি।
* *
তাই ভাবি—তাই ভাবি সদা,
কি ভুলেতে আছি আমি ভুলি'! (ভুল, পৃঃ ১৯)

এই ভুলই অক্ষয়কুমারের 'ভুল' নামক কবিতাগ্রন্থের উপজীব্য। এই কাব্যের 'উপহার' কবিতায়, তাঁহার কাব্যসাধনায় সতীর্থ ও সহচর রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া, জগতের বহুদূরে কল্পলোকে বসিয়া আপনার ভাবে আপনি মত্ত ছিলেন বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন—

অচেনা জগৎ-বুকে অবরুদ্ধ সুখে-দুখে
কত ভুল করিয়াছি, কত ভুলে ভুলিয়া!
না ল'য়ে কিছুরি তত্ত্ব, আপনার ভাবে মত্ত
ফেলিছি, ঝটিকা মত, না জানি কি তুলিয়া?
রবি, এও কি হয়েছে ভুল, এত ভুলে ভুলিয়া? (ভুল, পৃঃ ১৪)

এইরূপ বিষাদে ও নৈরাশ্যে বিহারীলালও একদিন গাহিয়াছিলেন—

তবে কি সকলি ভুল, নাই কি প্রেমের মূল,
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার!
মন কেন রসে ভাসে, প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার! (সারদামঙ্গল)

এই সকল যৌবন-স্বপ্নের কবিতায় অক্ষয়কুমার ভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন; এখানে তিনি কবি, শিল্পী নহেন। সেইজন্য, 'প্রদীপ', 'ভুল' ও 'কনকাঞ্জলি'র প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলিতে, কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য না থাকিলেও, কবি-হৃদয়ের সুকুমার ভাব ও কল্পনা একটি কোমল-মধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছে। তাঁহার সাধনার প্রারম্ভেই কাব্য-সরস্বতী তাঁহার চক্ষে যে স্বপ্নের অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছেন তাহাতে এই কঠোর বিসদৃশ জগৎ তাঁহার চক্ষে সুন্দর লাগিয়াছে—

প'ড়ে আছি নদীকূলে শ্যাম দুর্ব্বাদলে ;
কি যেন মদিরা-পানে, কি যেন প্রেমের গানে
কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে !
প'ড়ে আছি নদীকূলে শ্যাম দুর্ব্বাদলে ! (ভুল, পৃঃ ৬৭)*

এ যেন কোন সুদূর ভাব-জগতের বিস্মৃত কাহিনী—

ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি—যেন কা'র কথা !
না জানায়ে আসে যায়, হাসি অশ্রু নাই তায়,
দিয়ে মৃদু অনুভব, মৃদু অলসতা,
ধীরে ধীরে আসে স্মৃতি—যেন কা'র কথা !…

সত্য যেন উপকথা—দূর স্বপ্নজাল !
বুঝিতে হয় না সাধ— গত দুখে সুখস্বাদ !
পরের ঘটনা লয়ে কাটে যেন কাল !
সত্য যেন উপকথা—দূর স্বপ্নজাল ।

(ভুল, পৃঃ ৬৮ ; কনকাঞ্জলি পৃঃ ৭৯)

সেইজন্য, স্বপ্নের শেষে আসন্ন নির্ম্মম জাগরণের আশঙ্কায় কবি ক্ষুব্ধকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

ফুটো না ফুটো না, রবি থাক ঘোর-ঘোর ছবি ;
ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন—মদির মধুর !
নাহি শোক, নাহি তাপ, নাহি মোহ, নাহি পাপ,
কেটো না এ আবছা-জাল,—প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর !

(ভুল পৃঃ ৬০, প্রদীপ পৃঃ ৬১)

প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর, কবি তাই বাস্তব-জগৎ হইতে দূরে কল্পনার মেঘপুরে ছায়ার মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে বাস করিতে চাহেন—

জগতের দূরে—তোর মেঘপুরে নিয়ে যা আমায় !
তোর ছায়া মত স্বপ্ন-মায়া মত ক'রে দে আমায় !

(ভুল ১১৮, কনকাঞ্জলি, পৃঃ ৬৮)

* কনকাঞ্জলি, ২য় সংস্করণ, ১৩০৪, পৃঃ ৭৯। 'ভুলের' অনেক কবিতা 'কনকাঞ্জলি' ও 'প্রদীপে'র ২য় সংস্করণে সংশোধিত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশগুলিতে সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

কিন্তু কেবল কল্পনায় পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই, তাই এই নিরুদ্বেগ সুখ-স্বপ্নের মধ্যেও একটি অস্ফুট অজানা দুঃখ কবির প্রাণ-মন আকুল করিয়াছে—

হৃদয় এলায়ে পড়ে যেন কি স্বপনভরে,
মুদে আসে আঁখিপাতা যেন কি আরামে !
অন্যমনে চাহি' চাহি' কত ভাবি, কত গাহি !
পড়িছে গভীর শ্বাস গানের বিরামে !

(ভুল পৃঃ ৬২, শঙ্খ পৃঃ ১১৮)

এ দুঃখের আকার নাই ; এ যেন একটি অব্যক্ত world-weariness ভাব-প্লাবনের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার মনকে বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত ও অশান্ত করিতেছে। তাই

প্রাণ কাঁদিবার তরে নিশিদিন হাহা করে,
বুঝিছে না অথচ কি দুখ !
বরষার মেঘপ্রায় ঝরে না, নড়ে না, হায়,
ক্রমশঃ যেতেছে ভরি ক !

(ভুল পৃঃ ৫৫)

প্রয়াসের অবসাদখিন্ন নৈরাশ্যে ও বিষাদে কবি পরিশেষে আক্ষেপ করিয়াছেন—

বড় শ্রান্ত চেয়ে চেয়ে, বড় শ্রান্ত গেয়ে গেয়ে—
সুখে দুঃখে প্রেমে কল্পনায়।

(ভুল পৃঃ ১১৭, কনকাঞ্জলি পৃঃ ৬৭)

কবির অন্তর-লক্ষ্মীর প্রতিচ্ছবি গানের ও প্রাণের মধ্যে মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু বাহির-জগতে বাস্তব-বন্ধনের মধ্যে নিত্যকালের জন্য ধরা পড়ে না। কারণ সে মূর্ত্তি চিরচঞ্চল ও অনায়ত্ত। সেই জন্য কবির মনে কখনও সংশয় কখনও বিশ্বাস, কখনও অভিমান কখনও বেদনা। বিহারীলালও তাঁহার কল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রী সারদার উদ্দেশ্যে তাঁহার অন্তরের এইরূপ অশান্ত আকুলতার কথা লিখিয়াছেন—

সেই আমি, সেই তুমি, সেই সে স্বরগ-ভূমি
সে সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন,
সেই প্রেম, সেই স্নেহ, সেই প্রাণ, সেই দেহ,
কেন মন্দাকিনী-তীরে দু'পারে দুজন !

(সারদামঙ্গল)

অক্ষয়কুমারও তাঁহার স্বপ্ন-সহচরীকে বাস্তব-জগতের সীমানায় ধরিতে না পারিয়া ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার দুঃখে বলিয়াছেন—

কোথা তুমি, কত দূরে, কোন্ সুর-অন্তঃপুরে—
স্বর্ণমেঘ ঘুরে ঘুরে রাখে কি আড়ালে ?
ফুলে ছেয়ে গেছে দিক্, গাছে গাছে ডাকে পিক,
কত শশী অনিমিখ চায় চক্রবালে !...
তুমি কি জীবনে ভুলে' কখন গবাক্ষ খুলে
দেখনি বাতাসে দুলে কত দীর্ঘশ্বাস—
কত শোভা, কত গন্ধ, কত সুর, কত ছন্দ,
কি যন্ত্রণা, কি আনন্দ, কি চির-বিশ্বাস !
কোন্ জন্মে, কোন্ লোকে দেখেছি সহস্র চোখে—
এস গো বিরহ-শ্লোকে মিলন-আশ্বাস !
ছায়া পিছে কায়া নিয়ে আজীবন ছুটি প্রিয়ে,—
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে কর দেহ নাশ। (শঙ্খ পৃঃ ১১৩)

এই স্বপ্নের মধ্যে বাস করাও এখন যাতনা, তাই বাস্তব-লুব্ধ কবি আর স্বপ্নের মধ্যে সম্পূর্ণ সুখ পাইতেছেন না। প্রাণে যে অপূর্ব্ব ও সত্য পিপাসা জাগিয়াছে, তাহা প্রাণের বাহিরে বাস্তবের মধ্যেও কবি পাইতে চাহেন। তাঁহার কাতর আহ্বানের মধ্যে আদর্শ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের জন্য মানব-চেষ্টার চির-বিফলতার সুর জাগিয়া উঠিয়াছে—

এ জীবনে পূরিত সকল,
সে যদি গো আসিত কেবল !
গানে বাকি সুর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে,
স্বপ্ন বাকি হইতে সফল—
সে যদি গো আসিত কেবল। (ভুল পৃঃ ১১৯, শঙ্খ পৃঃ ১১৯)

এ যেন অর্দ্ধেক জীবন লইয়া অপরার্দ্ধের জন্য অসীম ব্যাকুলতা। কি যেন নীরব প্রীতি সমস্ত জগৎ ভরিয়া রহিয়াছে, সে যেন আপন হৃদয়-ভারে আপনি ব্যথিত। এ সমস্তই কি কিছুই নয় ?—এ প্রতীক্ষার পারে কি কেহই নাই ?

ওই কুটীরের দ্বারে এ ভাঙা বেড়ার পারে
কেহ কি বসিয়া নাই মোর অপেক্ষায় ?
চমকি উঠিলে বায়ু চমকি' সে চায় ? (ভুল পৃঃ ১২৩)

যেখানে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ নাই, সেই আত্মতন্ত্র প্রেমের মধ্যে sentiment অপেক্ষা sentimentalism অধিক। এই মানসিক অবস্থায় মানুষ ভালবাসাকে ভালবাসে, প্রেমাস্পদ উপলক্ষ্য মাত্র। অক্ষয়-কুমারের প্রথম বয়সের রচনাগুলিতে এইরূপ একটি কবিত্বস্বপ্নময় ভাবাবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। অকারণ চঞ্চলতা, অর্থহীন আবেগ তাঁহার প্রাণ-মন উদ্বেল করিয়াছে; তাঁহার মধ্যে বিলাস আছে, কিন্তু বেদনা নাই, অনুভূতি আছে কিন্তু চেতনা নাই। কবি হাইনের অনুকরণে অক্ষয়কুমারও সুখ-কল্পনা করিয়াছেন—প্রেম যদি একটি সুরভি কুসুম হইত, প্রেম যদি একটি চুম্বনে নিঃশেষ হইয়া যাইত—

প্রেম যদি হইত কুসুম, হাতে তার দিতাম তুলিয়া ;
হয়ত সে বুকেতে রাখিত, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভাবিয়া !
দুঃখ যদি হইত সমীর, কাঁদিত তাহারে ঘুরি ঘুরি ;
পাশে তার ঘুমায়ে পড়িত, একটি চুম্বন করি চুরি !
হবে না গো কিছুই—কিছুই ! এ কেবল কল্পনার খেলা !
ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে কত, মোরে হায়, পাইয়া একেলা !

(ভুল পৃঃ ৩৯)

কিন্তু বাস্তবদায়িত্বহীন ভাবমার্গ তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। কে যেন কোথায় আছে; যেন আসিবে বলিয়া কবে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু আসে নাই; তাহাকে কখনও চোখে দেখি নাই, তবুও কামনার অবসাদ ও আকাঙ্ক্ষার গ্লানি লইয়া তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষায় তৃপ্তি কোথা, এ অন্বেষণের শেষ কোথা ?

কোথা তুমি, ভালবাসা,—যে তুমি সে তুমি দূরে !
গান ত হইল শেষ, কোথা তুমি সুর-রেশ ?
সুখ দুঃখ হ'ল শেষ, হ'ল শেষ কারে ঘুরে ? (ভুল পৃঃ ১২৮)

কবি এতদিনে বুঝিয়াছেন যে তিনি আযৌবন যে চিন্ময়ী ছায়ার অন্বেষণ-কাতর, তাহাকে সম্পূর্ণ কায়া-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করা যায় না। তাহা চিরকাল অপরিমেয় ও অনায়ত্ত—

এতদিনে বুঝিলাম,—যখন কি হবে বুঝে—
অনন্তের মাঝে আমি ছুটিতেছি অন্ত খুঁজে!
যেখানে অনন্ত শুদ্ধ, খুঁজিতেছি সেথা শব্দ;
যেখানে অনন্ত স্বপ্ন, খুঁজিতেছি সেথা কাজ।
নাহি সুখ, নাহি শ্রান্তি, খুঁজিতেছি সেথা ভ্রান্তি,—
চড়িতেছি স্মৃতি-ভেলা অনন্ত খেলার মাঝ!
এতদিনে বুঝিলাম—কি হবে বুঝিয়া আজ। (ভুল পৃঃ ১২১)

ইহাই বুঝি সমস্ত ভাববিলাসী idealist-এর স্বপ্নভঙ্গের আক্ষেপ! কবি এতদিনে বুঝিয়াছেন যে শুধু কামনার মধ্যে সাধনা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, শুধু কল্পনা-বিলাসের মধ্যে সত্য-পিপাসার তৃপ্তি নাই। কবি বিহারীলালের মত তিনিও অনুভব করিয়াছিলেন, যদি প্রেম ভুল হয় তবে

এ ভুল প্রাণের ভুল, মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী, অমৃত-বল্লরী! (সারদামঙ্গল)

'কড়ি ও কোমলে'র কবিও একদিন কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ বাতাসে সুখশ্রান্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

এস ছেড়ে এস সখি, কুসুম-শয়ন,
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে!
কতদিন করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুম-বনে স্বপন-চয়ন। (কড়ি ও কোমল)

সেইরূপ অক্ষয়কুমারের মত ভাবপ্রাণ কবিও বুঝিয়াছেন, ক্ষুদ্র জীবনের মায়াময়ী মমতার মধ্যে বিচিত্র সুখদুঃখ থাকিলেও সে যে নাগপাশ—

দেরে দেরে ছেড়ে দেরে, ছুটে গিয়ে কেঁদে আসি,
পারি না বহিতে আর এ মায়া-মমতা-রাশি!
এ কি স্নেহ, এ কি ভয়, এ কি হাসা, এ কি কাঁদা,
ফিরিতে দিবি না পাশ—শত নাগপাশে বাঁধা।

গেল গেল সব গেল—অকূল সমুদ্র-আশ
ও ক্ষুদ্র ইঙ্গিত-পথে ছুটে ছুটে বারো মাস।
কোথা সে পৌরুষ-গর্ব্ব, বিশ্বগ্রাসী গরজন,
সে উল্লাস, সে উচ্ছ্বাস, উৎক্ষেপণ, বিক্ষেপণ!

ছেড়ে দে পাগল প্রাণ উধাও ছুটিয়া যাক !
ফুলপরিমল-ভারে যে থাকে পড়িয়া থাক্ !
দুরন্ত প্রলয়-ঝড়—আছে তার শত কাজ,
অঞ্চল-বীজন হতে আসেনি সে ধরামাঝ ।

কারণ, মহাজীবনের দুর্দ্ধর্ষ গম্ভীর মূর্ত্তি তাঁর ভাবুক হৃদয়কে চঞ্চল করিয়াছে—

কি মহাজীবন-খেলা মেঘে ব্রজে হুড়াহুড়ি—
দাপটে ঝাপটে ধরা ভ্রমে কোথা গুড়ি-গুড়ি !
আহাহা, সমুদ্রে ঝড়ে কি সন্তাষ কি আরতি,—
মূর্চ্ছিত দেবতাগণ, স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি ! (কনকাঞ্জলি পৃঃ ১৬)

যখন বাস্তবের কঠোর স্পর্শে তাঁহার ভাবমার্গের সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, তখন সমস্ত ভাবপন্থীর মত তিনিও হাহাকার করিয়াছেন—

সে স্বপ্ন কোথায় গেল,
জাগরণ কেন এল ?
জগতের ছাড়াছাড়ি হৃদয়ে ঘুচিতেছিল ! (কনকাঞ্জলি পৃঃ ৫৭)

কিন্তু যখন বাস্তব-বেদনার এই কঠিন পীড়নে তাঁহার হৃদয়-বীণায় এক নূতন ও নিবিড় ঝঙ্কার উঠিল, তখনই তাঁহার কাব্য-জীবন বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্বে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিল, তাঁহার কবিতা আত্মস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইল। কবি আপনার শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাইলেন ।

এই বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব অক্ষয়কুমারের সমস্ত কাব্যে এরূপ ওতপ্রোত ভাবে দেখা যায় যে, ইহা তাঁহার কাব্য-জীবনের কোন এক বিশিষ্ট সময়কে চিহ্নিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার বিভিন্ন কাব্যের কবিতাগুলিকে তিনি একটি নিয়ম-শৃঙ্খলায় সাজাইয়া দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতাগুচ্ছের অযত্ন-বিন্যাসের মধ্যেই যেমন তাঁহার কবি-মানসের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, তেমনই অক্ষয়কুমারের কাব্যের সময়-ক্রম ও বিন্যাস-নৈপুণ্যের মধ্যে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে তাহার চিত্তবিকাশের একটি ক্রমাভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথাপি, ভাব ও বস্তুর, স্বপ্ন ও সত্যের যে দ্বন্দ্বের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তাঁহার প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থে 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি' ও 'ভুলের' প্রথম সংস্করণে (১৮৮৩-১৮৮৭) স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভুলের' দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই, কিন্তু 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'র দ্বিতীয়

সংস্করণ * প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৯৩-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সংস্করণে কবি তাঁহার পূর্ব্বের কবিতাগুলির এত পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জনা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতনেরও সংযোজন করিয়াছেন যে এই দুইখানি কাব্য এই হিসাবে নূতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে পূর্ব্বলিখিত দ্বন্দ্বের অর্দ্ধস্ফুট মূর্ত্তি পূর্ণ-বিকশিত আকার ধারণ করিয়াছে। এখন কবি তাহার মনোময়ী মূর্ত্তিকে অন্তরের ছায়ালোক হইতে বাহিরের সুখ-দুঃখের পূর্ণ আলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার আত্মগত ভাবনার আনন্দে ও প্রীতির কল্পনায় বাস্তবের সকল বৈষম্য ও কঠোরতা অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই দুইটি পরিশোধিত গ্রন্থে আমরা তাঁহার দেহক্লিষ্ট বাস্তবদলিত প্রাণের স্পন্দন সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারি। কনকাঞ্জলিতে (পৃঃ ৪২) অক্ষয়কুমার নিজেই বলিয়াছেন—

এই তো প্রেমের বন্ধ—বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ, সশঙ্ক দুরাশা!

বাস্তবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াও তিনি কল্পনাপ্রবণতাকে এড়াইতে পারেন নাই—এ পর্য্যন্ত কোন কবি পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু এই কল্পনা-প্রবণতা এখন আর ছায়া-শরীরী নয়, কবি-হৃদয়ের বাস্তব-অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বৃন্দাবন-গাথার রাধা কাম্য-শ্রেয়সের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগিনী হইয়াও বলিয়াছেন—

বাঁধিতেছিলাম মন আপন ঘরে—
কেন গৃহ ছাড়িলাম বাঁশীর স্বরে! (কনকাঞ্জলি পৃঃ ৮৫)

তবুও বাঁশীর স্বর তাঁহাকে পাগল করিয়াছে—

নীরব নিশুতি, ফুটিছে তারকা, বাজে দূরে বাঁশী চলরে চল!
রমণী হইয়া প্রেমে না মরিয়া রমণী-জনমে কি আছে ফল!
(কনকাঞ্জলি পৃঃ ৯১)

বাস্তব-জীবনের মরুভূমে নিদাঘের দ্বিপ্রহরে আমাদের কবিকে কল্পনার মরীচিকা এখনও প্রলুব্ধ করিতেছে—

---

* 'কনকাঞ্জলি'র তৃতীয় সংস্করণ (সন ১৩২৪=১৯১৭ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখযোগ্য নয়। ইহাতে কবি তাঁহার পূর্ব্ব রচনাগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যে আকার দিয়াছেন তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক মাধুর্য্য ও শ্রী লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কোথা সে প্রভাত স্বপ্ন, কোথা সে সন্ধ্যার গান,
কোথা সে পূর্ণিমা-নিশি চেয়ে চেয়ে অবসান!
সুখ নাই, দুঃখ নাই,—কিশলয়ে কাঁপাকাঁপি,
কথা নাই, ব্যথা নাই,—ফুলে ফুলে চাপাচাপি।

(কনকাঞ্জলি পৃঃ ৫৫)

তবুও এই "সযতন স্বপন-কর্ষণে"র বিফলতায় কাতর হইয়া তিনি বলিতেছেন—

ক্ষুদ্র ওই রূপ-শিখা দাও দাও নিবাইয়া,
সম্মুখে উঠুক রবি হেসে!
ক্ষুদ্র তটিনীর কূলে ডুবায়ে রেখো না আর,
সম্মুখে সাগর যাক্ ভেসে। (কনকাঞ্জলি পৃঃ ৭৩)

কিন্তু এত শুধু দ্বন্দ্ব নয়, এ যেন বাস্তব-বাত্যা-বিক্ষুব্ধ হৃদয়-সমুদ্রের দুরন্ত ঝটিকা। কবির "অতনু-কম্পিত তনু" কল্পনা-বিলাসে অতৃপ্ত, চির-আলিঙ্গনের নিবিড় বন্ধনের জন্য কাতর, যাহার দুরন্ত পেষণে দেহের পাষাণ চূর্ণ হইয়া যাইবে—

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ বাহু দিয়া,
পাকে পাকে ভেঙে যাক্ এ মোর শরীর!
এ রুদ্ধ পঞ্জর হতে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া। (কনকাঞ্জলি পৃঃ ৪০)

কখনো বা তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র কৃষ্ণ-কঠিন পাষাণ-তটে আসিয়া আপন আবেগে চূর্ণ হইয়া যাইতেছে—

হৃদয় সমুদ্র মম, আকুলি উচ্ছসি'
আছাড়ি' পড়িছে আসি' তোমা-উপকূলে;
হৃদয়-পাষাণ-দ্বার দেবে না কি খুলে?
চিরজন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি'?
অনুদিন অনুক্ষণ দুরাশায় শ্বসি'
বৃথায় পশিতে চাই ওই হৃদি-মূলে,—
হা রমণী, লক্ষ্যহীন কি নয়ন তুলে'
হেরিছ মরণ-লুণ্ঠ স্থিরগর্ব্বে বসি'। (কনকাঞ্জলি পৃঃ ৪৫)

কখনো বা তাঁহার স্পর্শ-রসিক প্রাণে, স্মৃতির কুহকে পুরাতন স্পর্শের সুখ জাগিয়া উঠিতেছে—

হৃদয়ের হেথা হোথা সুখস্পর্শ কা'র
পথহারা জ্যোৎস্না সম কেঁদে কেঁদে ফিরে !

(কনকাঞ্জলি পৃঃ ২২)

আবার কখনো সারা বসন্তটি ধরিয়া অস্ফুট গোলাপগুলি সযতনে আহরণ করিয়া ভাবিতেছেন—সে কি তাহা চরণে দলিয়া যাইবে ? প্রাণের যে স্বরটি সারা যৌবন ধরিয়া সাধিয়াছেন, সে কি তাহা শুনিবে না ? সারাটি জীবন ধরিয়া যে প্রেম, কল্পনা, মত্ততা, আশা তিনি হৃদয়ে জমাইয়া রাখিয়াছেন, সে কি তাহা ঘৃণার ভাবে দেখিবে ? (কনকাঞ্জলি পৃঃ ২৯-৩০)। আবার যখন সে সম্মুখের পথ দিয়া চলিয়া গেল—

এই পথ দিয়ে গেছে এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ-ফুলে চরণ-অলক্ত-রেখা !
এই পথ দিয়ে গেছে চেয়ে চেয়ে চারিদিকে,
এখনো হরিণী চেয়ে পথপানে অনিমিখে !

এই পথ দিয়ে গেছে তুলে ফুল ছিঁড়ে শাখী,
নাড়া পেয়ে সাড়া দিয়ে এখনো উড়িছে পাখী !
এই পথ দিয়ে গেছে গেয়ে গেয়ে মৃদু গান,
এখানো কাঁপিছে বায়ে সেই গুন্-গুন্ তান !

(কনকাঞ্জলি পৃঃ ৩০-৩১)

কখনো বসন্তের বিলয়ে নিদাঘের দাহে বর্ষার নিবিড় ধারার জন্য কবি হাহাকার করিতেছেন—

দিয়েছিলে জ্যোৎস্না তুমি, নিয়ে আছি অন্ধকার ;
দিয়েছিলে ভালবাসা, নিয়ে আছি হাহাকার ;
নাহি বুকে ফুলমালা, আছে শুষ্ক ফুলডোর,
বসন্ত, কোথায় গেলি রাখিয়া নিদাঘ ঘোর !···

এস বর্ষা, এস তুমি, তুমি নিদাঘের শেষ,
লয়ে এস অন্ধ নিশি,—ঘুচাও এ তৃষা-ক্লেশ !
লয়ে এস স্তব্ধ দৃষ্টি, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল,
নিরন্তর ঝর ঝর—ধরা যেন রসাতল ! (কনকাঞ্জলি পৃঃ ৫৪-৫৫)

তথাপি এ দুঃখ তাঁহার বরণীয়। মিলনের চঞ্চল সুখের চেয়ে বিরহের অচঞ্চল পাবক-পরশ তাঁহার বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য

দহিয়া বিরহ-দাহে হোক্ আরো শুদ্ধ প্রাণ,
প্রেমময়ি, পার যাহে করিবারে অধিষ্ঠান।
কত যুগ দাও ব'লে—কিংবা জন্মপরে কত,
কত দুঃখে জ্বলে' জ্বলে' হব তব মনোমত!

(কনকাঞ্জলি পৃঃ ৬০)

'প্রদীপের' দ্বিতীয় সংস্করণে এই সুর আরো গভীর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ ভাবুকতার উপর অভূতপূর্ব্ব বাস্তব-অনুভূতি অমৃতের রেখা টানিয়া দিয়াছে। এই কাব্যের মধ্যে একটি নূতন বৃহত্তর জীবনের স্পন্দন জাগিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট স্বর্গসুখের জন্য হাহাকারও রহিয়াছে। যে ক্ষুদ্র নির্ঝর পাষাণের নিভৃত হৃদয়ে সুখস্বপ্নে বাস করিতেছিল, সে আজ জগতের মরুভূমে প্রখর রবিতাপে পাষাণের সেই পুরাতন সুখনীড়টির জন্য কাঁদিতেছে।* (প্রদীপ পৃঃ ১৪)

প্রদীপের প্রায় সমস্ত কবিতাই প্রেম-বিষয়ক। বাস্তবিক অক্ষয়কুমারকে নিছক প্রেমের কবি বলিলে তাঁহার কবি-মানসের স্বরূপটি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু তাঁহার প্রেমগীতি অপূর্ব্ব। ইহাতে শুধু কথার মাহাত্ম্য, ভাবের উচ্ছ্বাস, অথবা সূক্ষ্ম চিন্তার তুরীয়াবস্থা নাই। ইহা সুস্থ চিত্তের সবল উক্তি, সেই জন্য বিচিত্র গাঢ় ও বেগবান; বাস্তবজীবনের স্পর্শশূন্য বা কবি-হৃদয়ের আন্তরিকতা-বর্জ্জিত নয়। সত্যকে তথ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার যে একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, তাহাই অক্ষয়কুমারের উজ্জ্বল কবিতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

অক্ষয়কুমার গুরু বিহারীলালের কাছে শিখিয়াছিলেন—'নারী কত মহীয়সী' (কনকাঞ্জলি পৃঃ ১৫)। সেই আন্তরিক নারী-প্রীতি তাঁহার সমস্ত প্রেমগীতিকে সার্থক করিয়াছে। কবি দেবেন্দ্রনাথের মত অক্ষয়কুমার নারীকে

* 'রজনীর মৃত্যু' শীর্ষক কবিতাটিতেও এই করুণ সুরটি রহিয়াছে। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'তারকার আত্মহত্যা' নামক 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। এই কবিতাটি অক্ষয়কুমারের সর্ব্বপ্রথম রচনা। ইহা সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮৯ সালের (১৮৮২ খ্রীঃ অব্দের) অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাম্পত্য-লীলায় মোহিনীরূপে বা কল্যাণী-মূর্ত্তিতে উপস্থাপিত করেন নাই। নারীর যাহা নারীত্ব—যাহা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের—তাহাই তাঁহার ধারণাকে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে। তিনি যেমন বার্দ্ধক্যের সীমানায় মহামানবের বিরাট মূর্ত্তির বন্দনা করিয়াছেন *, তেমনই যৌবনের প্রারম্ভে শাশ্বত-নারীর মহীয়সী মূর্ত্তির স্তোত্রগান রচনা করিয়াছিলেন। যেমন বিধাতার দৃষ্টি প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত, যেমন দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা, তেমনি রমণীর সৌন্দর্য্যে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য বদ্ধ রহিয়াছে। নারী যদি শুধু নারী হয়, তবে তাহার দেহমনের লাবণ্য-ধারায় "স্বর্গচ্যুত, নরক-উত্থিত, নিয়তি-তাড়িত নর-মতি" তাহার জন্মগত অতৃপ্তি ও উদ্দামতা ভুলিয়া যায় (প্রদীপ পৃঃ ২০-২২)। কবি তাই বলিয়াছেন—তুমি আমি কত ভিন্ন, তবুও

এত ভিন্ন, এত দূরে ; তবু দু'জনায়
অনন্ত সম্বন্ধে বদ্ধ, কি রহস্য মরি !
লুটিছে বরষা-লীলা ক্ষুদ্র উর্ম্মি ধরি',
ফুটিছে বসন্ত-রুচি শীত-কুয়াসায় ॥ (প্রদীপ পৃঃ ২৩)

যুগযুগান্তর ধরিয়া এক লক্ষ্য লইয়া, একত্র সংসার করিয়া নর ও নারী বাস করিতেছে; তবুও দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ। আবার প্রভেদের মধ্যেও অভেদ রহিয়াছে। যেন "সাগরে অনল-লীলা, বিদ্যুতে অশনি"। এই অভেদে প্রভেদ আছে বলিয়াই এই দুইটি মহাশক্তির বলে ব্রহ্মাণ্ড-চক্র ঘুরিতেছে। এই দুই মহাশক্তির বিভিন্নতা দেখাইয়া নারীকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি, কঠোরে কোমল মূর্ত্তি,
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা ;
উপচয়ে দশহস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসার-বিহ্বলা !
তুমি স্বস্তি-শান্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী,
সৃজয়িত্রী, পালয়িত্রী, ভব-দুঃখ-হরা ;

* সাহিত্য, চৈত্র ১৩১৮। শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৩৬, ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

আত্মমধ্যা স্বয়ংস্থিতা, সুন্দরে অপরাজিতা,
মুগ্ধা, আশ্লেষরূপা, বিশ্লেষ-কাতরা!

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল,
শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত-জ্ঞান,
বিষ-কণ্ঠ, শূল-পাণি, প্রলয়-পাগল!
তুমি হেসে ব'সে বামে সাজাইয়া ফুলদামে
কুৎসিতে শিখালে শিবে, হইতে সুন্দর;
তোমারি প্রণয়-স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর!
(প্রদীপ পৃঃ ১০১-২)

কিন্তু ইহা সম্ভব হয় কিরূপে? কিরূপে দুর্দ্দমনীয় নর-শক্তির প্রকৃতিগত উচ্ছৃঙ্খলতা নারী-শক্তি বাঁধিতে পারে? যে প্রেম এই বন্ধনের রজ্জু, তাহার স্বরূপ কি? পুরুষের প্রেম তাহার জীবনের অংশমাত্র, কিন্তু তাহাকেই সে খুব বড় করিয়া প্রচার করিতে চায়। কিন্তু নারীর প্রেম সেরূপ নয়; ইহা তাহার সমগ্র সত্তা, ইহা ছাড়া তাহার অস্তিত্ব নাই। সেই জন্য তাহার নীরব ও নিঃশেষ আত্মদান, নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা, অভীপ্সিত শ্রেয়স ও প্রেয়সের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ পুরুষের আত্মম্ভরিতাকে খর্ব্ব, অভিভূত ও নমনশীল করিতে পারে। তাই সেই শাশ্বত-নারীকে কবি আহ্বান করিয়াছেন—

উৎপাটিয়া মর্ম্মস্থল সন্থরক্তে ঝল-ঝল,
এস আত্মবিনাশিনি, পরার্থ-জীবিতে,
সত্য-শিবে, সৌন্দর্য্য-সম্মিতে! (প্রদীপ পৃঃ ২৯)

এই আত্মবিনাশিনী পরার্থজীবিতা নারীকে পুরুষ যুগে যুগে দেবী বলিয়া পূজা করিয়াছে।

প্রদীপের 'আবাহন' শীর্ষক কবিতার (পৃঃ ২৪-২৯) দুইটি অংশে এই ধারণাটিকে বৃহত্তর সত্যের আভাসে দুইটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখানো হইয়াছে। বিহারীলালের মানব-প্রীতি তাঁহার 'সঙ্গীতশতকে' ও অন্যত্র বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—

মানুষ সৃষ্টির সার, দেবতার অবতার,
ব্রহ্মাণ্ডের শিরোমণি, প্রোজ্জ্বল ভূষণ! (সঙ্গীতশতক)

মন্ত্রশিষ্য অক্ষয়কুমার গুরুর এই ভাবটি লইয়া মানবের দুইটি চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথম চিত্রে মানব দেবতার অবতার; মানবের হৃদয়ই প্রেমের যোগ্য আসন। যুগযুগান্তর ধরিয়া এত যত্নশ্রম, এত পরাক্রম, এত শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম, এত আশা ও স্মৃতি, এত মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য, ইহা ত ক্ষুদ্র নয় তুচ্ছ নয়—

হে পীরিতি, সমূরতি কর অধিষ্ঠান,
লহ অর্ঘ্য, রাখ নর-মান!

কারণ

কিছু তুচ্ছ নাহি তার, সে যে দেব-অবতার,
কল্পনায় কুতূহলী, দর্শনে বিজ্ঞানে বলী,
অদৃষ্টের নিয়ামক, সৃষ্টি-সংস্কারী,
বিশ্ব-প্রভু, গদাপদ্মধারী।

অতএব প্রেম এই মানব-হৃদয়েই কৃতার্থ হইবে—

এস তবে, এস ভবে, সত্যই কৃতার্থ হ'বে!
এ বিকচ তনুমন, বিধাতার ধ্যেয় ধন,
দেবাসুর-রণক্ষেত্র, সর্ব্বতীর্থসার;
উপযুক্ত আসন তোমার!

কিন্তু আজ সেই মানব হইয়াছে সাক্ষাৎ অসুর। পরার্থজীবিত প্রেম তাহার হৃদয় হইতে চলিয়া গিয়াছে, সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থবিষ তাহার দেহমন জর্জ্জরিত করিয়াছে। এত গর্ব্ব, এত জয়, তবুও ত সে কোনদিন সুস্থ নয়; তাহার চক্ষে অশ্রু, কণ্ঠে গরল, হৃদয়ে অতৃপ্তির হাহাকার! আজও পশুধর্ম্মে ও লক্ষ্যহীন কর্ম্মে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে। আত্মস্থাপনার ছলে বিশ্বকে রসাতলে পাঠাইতেছে—

বৃথা তা'র ইতিহাস, ভবিষ্যৎ কাব্যভাষ;
বৃথা যুগ-বিবর্ত্তন, মিছা কুরুক্ষেত্র-রণ;
সভ্যতার এত শ্রম বৃথায়—বৃথায়!
ধিক নরে, নর-প্রতিভায়!

যে প্রীতি তাহার হৃদয় হইতে চলিয়া গিয়াছে সে আর ফিরিয়া না আসিলে সৃষ্টি রক্ষা হইবে না—

উঠ দেবি, রাখ সৃষ্টি, কর প্রেম-সুধা-বৃষ্টি ;
বিনা ও চরণ-স্বেদ এ ভাগ্য হবে না ভেদ,
অচল অটল সেই দুর্ভেদ্য আঁধার,
প্রকৃতির প্রথম বিকার।

মানব-হৃদয়ের প্রেম মানব-জীবনের পূর্ণতার জন্য। অসমতা, অক্ষমতা ও অপূর্ণতা চিরদিনই রহিয়াছে, সুতরাং মানবের প্রেম কখনও স্বার্থশূন্য হইতে পারে না। অক্ষয়কুমার তাঁহার অপূর্ব্ব 'প্রেম-গীতি'তে বলিয়াছেন—

শুন তবে, রমণি রে, বলি তোরে গর্ব্বভরে
এ প্রণয় স্বার্থশূন্য নয়!

কারণ—

চিন্তায় অভাব আছে, কার্য্যেতে অভাব আছে,
জগতে অভাব আছে মোর,
সুখেতে অভাব আছে, দুঃখেতে অভাব আছে,
স্বরগে অভাব আছে ঘোর ;
লইয়া অভাব এত, লইয়া এ মহাশূন্য
আসিয়াছি নিকটে তোমার ;
যতটুকু পার তুমি এ শূন্য পুরিয়া দাও,
দাও শুধু শক্তি দাঁড়াবার! (প্রদীপ পৃঃ ৩৪)

শঙ্খের 'আহ্বান' কবিতাটিতে (পৃঃ ৫৬) এই ভাবটি আরো সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, রাগ-বিরাগ, যে চঞ্চল মর্ম্ম ও ক্ষুধার্ত্ত অস্থিচর্ম্ম দিয়া মানব-জীবন গঠিত হইয়াছে, তাহার কিছুকেই উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শুধু দীপ্তিটুকু লইলেই হইবে না, তাপটুকুও সহ্য করিতে হইবে, অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে গরলের ভারও লইতে হইবে। এই উন্মুক্ত-আবরণ হৃদয়ের দানে ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, অহঙ্কার নাই, ছলনা নাই ; কল্প-কল্প ধরিয়া ধরণী এইরূপ আকাশের পানে চাহিয়া আছে, আকাশও আলোকে-আঁধারে গভীর সুখে ধরণীর বক্ষ জুড়িয়া রহিয়াছে। সেইরূপ

শিরে শূন্য, পদে ভূমি, মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা!
আছে দেহ, আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু, চাহি অমরতা!

আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ ;
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আজীবন ?

বাস্তব-পীড়িত কবির হৃদয়ে জীবনের শুধু সুখ নয়, দুঃখও সোনার ফসল ফলাইয়াছে।

'প্রদীপে'র 'শেষ' শীর্ষক শেষ কবিতায় কবির প্রেমিক হৃদয়ের সমস্ত সুখ-দুঃখে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সংশয়-বিশ্বাসে বিচিত্রিত হইয়া একটি করুণ কোমল সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেটি যেন ক্ষুব্ধ ঝটিকার পর নিস্তব্ধ অবসাদের খিন্নতা। কবিতাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া সমস্তটি উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না, কিন্তু ইহার মধ্যে যে অসীম অথচ সংযত ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অন্য উপায়ে বোঝান যাইবে না। ইহার শেষাংশে কবি তাঁহার 'প্রদীপ'টি উপহার দিয়াছেন—

আমি আঁধারের তরে দিলাম এ ক্ষুদ্র দীপ
যা' ছিল আমার,—
জ্বালিয়া এ প্রদীপটি খুলিয়া ও হৃদয়টি,
এই চাই দেখো একবার !
প্রভাতে মধ্যাহ্নে সাঝে সুখে কিংবা দুঃখে যাহা
দেখ নাই, পারিনি দেখাতে,
হয়ত অলক্ষ্যে তাহা আলোকে আঁধারে মিশে
ফুটিলে ফুটিতে পারে কোন এক রাতে,—
ক্ষণতরে জীবন চঞ্চল, ক্ষণতরে শূন্য ধরাতল
হয়ত সরিতে পারে সেই রেখাপাতে !

(প্রদীপ, পৃঃ ১১২-১১৩)

সংগ্রামের শেষে এই যে অবসাদের ভাব, ঝটিকার শেষে প্রকৃতির শ্রান্ত প্রসন্নতা—ইহাই অক্ষয়কুমারের পরবর্তী 'শঙ্খ' কাব্যের (সন ১৩১৭—১৯১০ খ্রীঃ অঃ) প্রধান সুর। এই ভাবটি 'সাহিত্যে' ১৯০৪ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত 'পান্থ' কবিতাতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার কবিতা চিন্তার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও

ইহা সুস্থ ও আত্মসমাহিত হইতে পারে নাই। তাই আমাদের হৃদয়-সর্ব্বস্ব কবি গাহিয়াছেন—

কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়,
ধরণী চাহিছে শুধু—হৃদয়, হৃদয়!

কিন্তু হৃদয়-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া তিনি যে শান্তি পাইয়াছেন, সে শুধু প্রয়াসের অবসাদ, শ্রান্তির কামনাহীন নির্ব্বেদ। বিহারীলাল এইরূপ দ্বন্দ্বের পরিশেষে যে গভীর তৃপ্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সমস্ত ধ্যান ও গীতির, তাঁহার অপূর্ব্ব mystic mood-এর চরম সার্থকতা! কিন্তু অক্ষয়কুমার চিরকালই হাহাকার করিয়াছেন, কখনও নিরবচ্ছিন্ন নির্বৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। এখন তিনি চোখের জল মুছিয়াছেন বটে, কিন্তু হৃদয়ের ব্যথা ঘোচে নাই। mystic mood-এর যে শান্ত সমাহিত তন্ময়তা ধ্যানরসিক বিহারীলালের ছিল, অসাধারণ সংযম থাকিলেও অক্ষয়কুমারের অশান্ত কবি-প্রকৃতির মধ্যে তাহা ছিল না।

বিহারীলালের যে গভীর ও একাগ্র যোগমগ্নতার আবেশ ছিল, সেই আবেশে তিনি জীবন-বাস্তবের সমস্ত সুখদুঃখ পার হইয়া যে অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সারদামঙ্গলের উপসংহারে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। 'তুমি' ও 'আমি' এই দ্বৈতের মধ্যেও তাঁহার অদ্বৈত আনন্দ—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ গে এ বসুমতী যার খুসী তার! (সারদামঙ্গল)

কিন্তু অক্ষয়কুমার বিহারীলালের অপেক্ষা অধিকতর আত্মবিশ্বাসী; তিনি আপনার আত্মার মধ্যেই সমস্ত আত্মসাৎ করিতে চাহেন। এই আত্মাভিমুখী অদ্বৈতসিদ্ধিতে তিনি একেশ্বর, অদ্বিতীয় ও অনন্যপ্রধান হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন—

এস প্রিয়া, প্রাণাধিকা, জীবন-হোমাগ্নি-শিখা,
দিবসের পাপ তাপ হোক্ হতমান।
ওই প্রেমে প্রেমানন্দে, ওই স্পর্শে বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক্ মনে—আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্যপ্রধান। (শঙ্খ পৃঃ ৫৫)

সুতরাং 'কনকাঞ্জলি' ও 'প্রদীপে'র মধ্যে যে কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্বের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, 'শঙ্খে'র মধ্যেও তাহা রহিয়াছে; কিন্তু ইহাতে

আর বিদ্রোহের ভাব নাই, যাতনার জ্বালা নাই, ইহা একটি বিষণ্ণমধুর আকার ধারণ করিয়াছে। উষার শুকতারাই সন্ধ্যার সন্ধ্যাতারা হইয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু সায়াহ্নের কোমল স্নিগ্ধতায় তাহার রূপ অপরূপ হইয়াছে। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

বিগত বরষা, আজ তুফানের শেষে
এনেছি এ হৃদি-শঙ্খ (থাক্ বালু, থাক্ পঙ্ক)
আগ্রহে কম্পিত-বক্ষে, বড় ভালবেসে। (শঙ্খ পৃঃ ১৪)

কবি এখন আর কল্পনার তমালছায়ায় বসিয়া জীবনের ছায়া ও রৌদ্রের খেলা দেখিতেছেন না, অথবা জীবন-মধ্যাহ্নের রৌদ্রতাপে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া হাহাকার করিতেছেন না; সংসারের তীরে তুচ্ছ শঙ্খসম দুইটি সতৃষ্ণ নয়ন তুলিয়া সুদূর সংসারপানে চাহিয়া আছেন—

তুচ্ছ শঙ্খসম এ হৃদয় পড়ে আছে সংসারের কূলে,
সুদূর সংসার পানে চাহি, সতৃষ্ণ নয়ন দুটি তুলে।
আসে যায়, কেহ নাহি চায়, সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি,
কে শুনিবে হৃদয়ে আমার ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি! (শঙ্খ পৃঃ ১৭)

মনে রাখিতে হইবে যে এই গ্রন্থ-প্রকাশের চারি বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কবির স্ত্রী-বিয়োগ হয়, এবং এই কয় বৎসর সেই শোকের গূঢ়দাহ তাঁহার শ্রান্ত-ক্লান্ত অন্তরে যে অসীম অবসাদ ও আকুলতা আনিয়াছিল, তাহাও তাঁহার 'শঙ্খে' প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই কবি বলিয়াছেন—

কোথা প্রেম—স্নিগ্ধ আবরণ,
শূন্য হৃদি ধূধূ করে পাড়ি'! (শঙ্খ পৃঃ ২৭)

তারপর কবি যখন বলিতেছেন—

জীবন-শ্মশান-কূলে বসে আছি বড় ভুলে,
আকাশের পানে চেয়ে অশ্রু দরদর!

সে চিত্রটি বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী! আরও করুণ তাহার জীবনের অসীম নিঃস্বতা*—

* যখন কবি স্বয়ং এই 'বিপত্নীক' শীর্ষক কবিতাটি 'শঙ্খ' প্রকাশের পূর্ব্বে আমাদের শুনাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলাম যে ইহা তাঁহার বিপত্নীক অবস্থার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সূত্রানুরোধে যখন ইহা শঙ্খে স্থান পাইয়াছে, তখন ইহাতে বাধ আসে না।

সে শয়ন-গৃহ এই, গৃহে সে আলোক নেই,
আলোকে সে খেলা নেই, খেলায় সে টান্ ;
পালঙ্কের আশে পাশে সে হাসি আর না ভাসে—
যবনিকা-অন্তরালে সে মুগ্ধ নয়ান !
কতদিন গেছে চ'লে,—নাহি আর গৃহতলে
লুণ্ঠিত অঞ্চল-চিহ্ন, চরণের দাগ ;
নাহি আর এ শয্যায় সে রূপ-আভাস হায়,
সে পবিত্র দেহ-গন্ধ, সে স্বপ্ন সজাগ !

যে প্রেম-কল্পনা ও নারী-প্রীতি তাঁহার 'প্রদীপের' অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কবিতার উপজীব্য, তাহা এখন তাঁহার বাস্তব-অনুভূতির সুবর্ণ-সূত্রে গ্রথিত বিচিত্র স্বপ্নকে আরও মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে। প্রেমকাতর কবি বিশ্বের শাশ্বত প্রেয়সীকে কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন—

তোমারি চরণে-মূলে আছি আমি বিশ্ব ভুলে,
আমারে না হেরে রাধা কাঁদে উভরায় ;
শকুন্তলা নিত্য আসি' হেরে মোর রূপরাশি,
রত্নাবলী লতা-ফাঁসী গলে দিতে চায় ;
মহাশ্বেতা আমাতরে চির-ব্রহ্মচর্য্য করে,
সাবিত্রী আমারে ধ'রে যমেরে তাড়ায়।

* * * *

মূর্চ্ছান্তে চমকি চাই, বায়ু বলে—নাই, নাই,
পতিনিন্দা-শোকে সতী ত্যজেছে ভূতল ;
স্কন্ধে লয়ে মৃতদেহ বুকে লয়ে প্রেম-স্নেহ,
শ্মশানে মশানে ছুটি উন্মত্ত পাগল !
কালের কুটিল দিঠে পড়ে অঙ্গ পীঠে পীঠে,
পতি-প্রেমে দেবী তুমি, পীঠে তীর্থস্থল !
বিরচি জগত মাঝ মমতার মমতাজ,
বুকভরা নিরাশার স্বপন-রচনা—
অশ্রু দিয়া শ্বাস দিয়া, মনঃপ্রাণ নিঙাড়িয়া
তোমারি প্রীত্যর্থে প্রিয়া, তোমারি কল্পনা !

সে তপস্যা ঘেরি ঘেরি, ঘুরে তব স্মৃতি-চেড়ী
মরণ মধুর করি,—জীবন ছলনা! (শঙ্খ পৃঃ ৩৫-৭)

বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠস্থিত স্বর্গ-অলিন্দের উপর ভর দিয়া 'এষা'র (পৃঃ ১৪৮ ৩য় সং) যে স্মরণযোগ্যা বিষাদিনী নারী কাতরনেত্রে ধরিত্রীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন, 'শঙ্খে'র শেষ কবিতায় তিনিই নন্দনের মন্দারকুঞ্জে মন্দাকিনীর তীরে বসিয়া সজল-নেত্রে ধরণীর পানে বার বার চাহিতেছেন—

কোথা তুমি—কোথা তুমি—জন্মজন্মান্তর মায়া—
স্বপ্নময়ী, স্মৃতিময়ী, গীতিময়ী সেই কায়া!
নন্দনে মন্দারকুঞ্জে মন্দাকিনী-তীরে বসি'
অন্যমনে দেখিছ কি নীলনভে পূর্ণশশী!
করে মৃণালের ডোর, কোলে পারিজাতরাশি,
বাতাসে বিরহ-গীতি ক্ষণে ক্ষণে আসে ভাসি! (শঙ্খ পৃঃ ১২৬)

তাঁহার কবি-হৃদয়ের সমস্ত সুখ-দুঃখ আজ সেই অলোক-সৌন্দর্য্যের মধ্যে অবসান লভিতে চাহে—

দাঁড়াও, অভেদ-আত্মা! পরলোক-বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে!
জগতের বাধা বিঘ্ন জগতে পড়িয়া থাক্,
নীরবে সৌন্দর্য্যমাঝে কবিত্ব ডুবিয়া যাক্!
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তাই।
তারকায় তারকায় হাহা ক'রে তোমা'তরে
ছুটিতে না হয় যেন আবার মরণ-পরে!
এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু—যন্ত্রণার অবসান!
ধর এ জীবনাহুতি—বিরহের শেষ গান! (শঙ্খ পৃঃ ১২৭)

যে বাস্তব-দুঃখের আবর্ত্ত 'শঙ্খে'র কবিকে ঘূর্ণীপাকে ঘুরাইয়া ক্লিষ্ট ক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়াছে, সেই বাস্তব-দুঃখের নিষ্ঠুর পেষণে তাঁহার অন্তরে যে ক্রন্দন-রোল ও আর্ত্তনাদ-ধ্বনি উঠিয়াছে, তাহাকেই কবি তাঁহার 'এষা'-কাব্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার 'কনকাঞ্জলি'র তৃতীয় সংস্করণে (১৯১৭) তিনি লিখিয়াছেন—

আমার এ কাব্যে আজ, আপনা হারায়ে
দেখি মোর সর্ব্বস্ব জড়ায়ে,……
কাঁদিবে কি ছত্রগুলি বিরহ-ব্যথায়—
চিত্ত মোর পাতায় পাতায় !

কিন্তু তাঁহার শোকক্লিষ্ট হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি হিসাবে সুন্দর হইলেও কবিত্ব হিসাবে এই কাব্যখানিকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যায় না। এই কথা বলিলে অক্ষয়কুমারের প্রতিভার অবমাননা করা হয় না কারণ এই রচনায় অক্ষয়কুমারের কাব্যের চেয়ে কবি অক্ষয়কুমার বড়। Browning-এর ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রয়োগ করিলে বলা যায় যে, he has gained the man's sorrow, but lost the artist's joy ! শোকের আঘাত তাঁহাকে দৃষ্টিহীন করে নাই, দিব্যদৃষ্টি দিয়াছে ; তাঁহার বিরহ-বিষাদ ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়া বিশ্বজনীন বিষাদে পরিণত হইয়াছে। তথাপি, তাঁহার প্রকৃতিগত কল্পনাপ্রবণতা ক্ষুন্ন না করিলেও শোকের প্রচণ্ড উন্মত্ততা তাঁহাকে অবাস্তব কল্পনা হইতে বাস্তব বেদনার নিবিড় চেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। অসাধারণ সংযমসত্ত্বেও তাঁহার অন্তরের মানুষটি আপনার সত্তা হারাইয়া পরিপূর্ণ আর্টিষ্টে পরিণত হয় নাই। এই বাস্তব-চেতনা ও মানবত্বটুকুই 'এষা'র বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহার কবিত্ব-কল্পনা অনেক পরিমাণে খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রাণের প্রাবল্য আছে, কিন্তু মনের উৎকর্ষ নাই। এই রচনা সত্যোপেত, বস্তুতন্ত্র ও শক্তিশালী ; কিন্তু যে কবিত্ব, সত্য ও সবিশেষ বস্তুকে নির্ব্বিশেষ রসপদবীতে লইয়া যায়, তাহা ইহার মধ্যে যথেষ্ট নয়। তাই এই কাব্যের মধ্যে শোকের তীক্ষ্ণতা আছে, আত্মজিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু যে গভীর সান্ত্বনা ও তৃপ্তি বিহারীলাল তাঁহার অনুভূতির তন্ময়তা ও একাগ্রতা হইতে পাইয়াছিলেন, অক্ষয়কুমারের 'এষা'য় সেই সুদুর্লভ অনুভূতির নিগূঢ় আভাস নাই। বোধ হয় অক্ষয়কুমার নিজেই সে কথা বুঝিয়াছিলেন, তাই এক স্থলে বলিয়াছেন—

হে কবিত্ব, এস ঘুরে এ বার্দ্ধক্য ভেঙে চুরে
শত গানে, শত সুরে, শত কল্পনায় !
ঘুচে যাক্ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঘুচে যাক্ ভাল-মন্দ,
ঘুচে যাক্ জন্ম মৃত্যু প্রেম-মহিমায় !

যায়, দিন যায় !
সে ফুল ফোটে না আর যে ফুল শুকায়। (পৃঃ ১১৫)

ইহা বলিলে ভুল করা হইবে যে, 'এষা'র মধ্যে গভীর তত্ত্বদর্শিতার প্রমাণ বা পরিচয় আছে। খুব বড় কথা, খুব সূক্ষ্ম বিচার, খুব গভীর তত্ত্বচিন্তা প্রকৃত কাব্যে বিশেষ কাজে লাগে না, যতক্ষণ না সেগুলি কবির মানস-ক্ষেত্রে সুকুমার ও সচেতন অনুভূতির বিচিত্র আলোকে রঙীন হইয়া উঠে। অক্ষয়কুমার নিজেও কোন উচ্চ চিন্তার দাবী করেন নাই। 'এষা'র উপকরণ সামান্য, ইহার দৃশ্যগুলি নিত্যদৃষ্ট ও পরিচিত, ইহার উপজীব্য দুঃখটিও অনন্যসাধারণ নয়। কিন্তু এই সামান্য, পরিচিত ও পুরাতন কথাগুলিকে নিজস্ব করিয়া, যেখানে তিনি শোকের বাস্তব-চিত্রকে অসামান্য ও বিশ্বজনীন করিয়া অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার চিত্রগুলি অপূর্ব্ব রসাভিষিক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার কাব্যকে তত্ত্বচিন্তার দিক হইতে না দেখিয়া কাব্য হিসাবে দেখিলেই ইহার সহিত প্রকৃত পরিচয় হইবে। কবি স্বয়ং তাঁহার ব্যক্তিত্বকে দরিদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র এক বঙ্গ-নারী হিসাবেই আঁকিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা !

তিনি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও যথার্থ

ছিন্ন-কণ্ঠ পিক আমি, মরণ-আতুর !

এই আত্মসমালোচনার আলোকে 'এষা'কে বাস্তব-তাড়িত কবির আত্মনিবেদন হিসাবে একটি human document বলিয়া বুঝিলেই বোধ হয় ইহাকে ঠিক বুঝা যাইবে।

অক্ষয়কুমারের পূর্ব্বরচিত গ্রন্থের উল্লিখিত ভাব ও বস্তুর দ্বন্দ্ব, 'এষা' কাব্যে নাই বলিলেও চলে; বাস্তব দুঃখের প্রচণ্ড আঘাত তাঁহাকে সম্পূর্ণ সচেতন করিয়া তুলিয়াছে—

যেতেছিল জীবন বহিয়া, নিজ ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ নিয়া
সরল বিশ্বাসে;
আচম্বিতে সিন্ধু-শৈলে ঠেকি, মরণে প্রত্যক্ষ আজ দেখি !
জাগি সর্ব্বনাশে। (পৃঃ ৫৫)

---

* এষার তৃতীয় সংস্করণ সহজে পাওয়া যায় বলিয়া সেই সংস্করণের পত্রাঙ্ক এখানে দেওয়া হইল। প্রথম সংস্করণের তারিখ ১৯১২ (= সন ১৩১৯)। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২০।

কবি আজ বস্তুতন্ত্র, প্রত্যক্ষবাদী ও যুক্তিপ্রধান। মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া হঠাৎ যেন তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে—

মরণে কি মরে প্রেম ? অনলে কি পোড়ে প্রাণ?
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্মদান ?
জীবন-জড়ান সত্য—সকলি কি মিথ্যা আজ ?
গৃহ ছাড়ি গৃহলক্ষ্মী শুইয়া শ্মশান-মাঝ !

সহসা নিদ্রার মাঝে এ কি জাগরণ মম !
এই ছিলে আর নাই, চলে গেছ স্বপ্নসম।
প্রতিপল-পরিচিতা, তোমারে বিচ্ছিন্ন করি'
কেমনে এ শূন্য-মনে এ শূন্য জীবন ধরি।

তারপর শ্মশানে বসিয়া দেখিতেছেন—

ধূধূ ধূধূ জ্বলে চিতা, ওঠে শূন্যে ধূমভার ;
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—শুধু মোহ, কে কাহার !
অশ্রুহীন দগ্ধ আঁখি আসে যেন বাহিরিয়া,
ঘুরে বুকে দীর্ঘশ্বাস সমস্ত হৃদয় নিয়া।

চেয়ে আছি—চেয়ে আছি, হৃদয়ে পড়িছে ছেদ,—
পশ্চাতে আলোক ছায়া, স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিভেদ !
সম্মুখে উঠিছে জাগি' কি কঠোর দীর্ঘ দিন—
ভ্রমিতেছি শোক-বৃদ্ধ দীন হীন উদাসীন !

মৃত্যু জীবনকে কত নিঃস্ব করিয়া দিতে পারে, তাহা তিনি শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার প্রিয়তমার হাতে-গড়া সোনার সংসারের মধ্যে ক্ষুদ্র গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি কাজে, প্রতি চিন্তায় অনুভব করিতেছেন। এইখানেই তাঁহার বাস্তব-অনুভূতির অতি সুন্দর ব্যঞ্জনা হইয়াছে। তাই কোথাও শ্রাদ্ধবাসরের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনার মধ্যে তাঁহার প্রাণের নিগূঢ় বেদনা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। (পৃঃ ৬৯-৭১) কখনও বা সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার দুরন্ত শিশু পুত্রটি তাঁহার পড়ার ব্যাঘাত করিতেছে, অবশেষে শাসিত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন—

নিঃশব্দে চুমিয়া দিনু মুছায়ে নয়ান।
ম্লান জ্যোৎস্না মুখে লোটে, ঈষৎ-বিভিন্ন ঠোঁটে
এখনো কাঁপিছে যেন ক্ষুব্ধ অভিমান!
ভিজা-ভিজা আঁখিপাতা, নেতিয়ে পড়েছে মাথা,
শ্বসিছে নিঃশ্বাসে কত অব্যক্ত বেদনা;
তুলিলাম বুকে করি', নয়নে রয়েছে ভরি'
তা'র মৃত জননীর বিস্মৃত প্রার্থনা!

অথবা, যখন শারদীয়া পূজার সন্ধিক্ষণে প্রতিমাকে ভক্তি ও সম্ভ্রমে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতেছেন, তখন মনে হইল

সে যেন গভীর শ্বাসে ছায়াসম বসি পাশে,
ম্লানমুখ উপবাসে
গলবস্ত্রে আমা'মনে যাচে শ্রীচরণ!

তাই কাতরকণ্ঠে সেই মৃত আত্মার উদ্দেশে বলিয়াছেন—

কত যুগ-যুগ পরে এখনো কি মনে পড়ে
তোমার সে হাতে-গড়া সোনার সংসার,
কবিত্ব-কল্পনা-ভরা জীবন-মরণ-হরা
ত্রিভুবন-আলো-করা প্রীতি দু'জনার।

তাহার সমস্ত অন্বেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেও এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির করুণ বেদনা জাগিয়াছে; ইহারই নিকষে তিনি জীবনের সত্যকে যাচাই করিতে চাহেন। বিজ্ঞানের, দর্শনের, ধর্ম্মগ্রন্থের সান্ত্বনা বাস্তব-দুঃখ মানিতে চাহে না। জীবন মৃত্যুভয়ে সদা ভীত, মৃত্যুনামে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু মানুষের এত প্রেম, এত আত্মদান সমস্তই কি নিষ্ফল?

কেন বুদ্ধ ত্যজিল আবাস, কেন নিল নিমাই সন্ন্যাস,
মৃত্যু যদি শেষ?

তাই সকল সান্ত্বনার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা কবির হৃদয়ে অনির্ব্বাণ দীপ শিখার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—তাহা মানব-হৃদয়ের মরণজয়ী শাশ্বত প্রীতি। সেইজন্য

মরণে ভাবি না আর ভয়ঙ্কর অতি;
তুমি যাহে দেহ পদ সে যে ফুল্ল কোকনদ,
সে নহে শ্মশান-চুল্লী ভীষণ-মূরতি।

কিন্তু সেই অনলদগ্ধা প্রতিপল-পরিচিতার চিত্র নয়ন ও মন হইতে মুছিবার নয়—

এখনো কাঁপিছে তরু,—মনে নাহি পড়ে ঠিক
এসেছিল, বসেছিল, ডেকেছিল হেথা পিক্!
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার!

এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয় হয়—
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ তৃণ-গুল্ম-ফুলময়!
এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন কথা—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা!

এ রুদ্ধ কুটীতে মোর এসেছিল কোন্ জনা?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা!
মুরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া ওঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন!

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে পড়ে,—
পুরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে;
কাতর নয়নে চেয়ে, কোথা গেল নাহি জানি—
মরুর উপর দিয়া নবনীল মেঘখানি!

এই সার্ব্বজনীন অতর্ক-প্রতিষ্ঠ সত্যকে কবি তাঁহার দুঃখপ্রবণ প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে পাইয়াছেন—ইহাই তাঁহার 'এষা'র প্রাণবস্তু।

কাব্য-জীবনের প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত বিহারীলালের যথেষ্ট প্রভাব থাকিলেও, অক্ষয়কুমারের ভাব, ভঙ্গী ও ভাষা তাঁহার নিজস্ব। তিনি গুরুর নিকট শিখিয়াছিলেন—"ভাষা কত গরীয়সী"; এবং এই কথা মনে রাখিয়া, আজীবন গরীয়সী-ভাষা-মন্ত্রের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গুরুর মত, তিনি নিজের প্রাণের কথা, নিজের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা নিজস্ব সুরেই গাহিয়াছেন; তাঁহার অনুভূতি যেরূপ নির্ব্যাজ ও সহজ, ভাষাও সেরূপ সরল ও স্বচ্ছ। কিন্তু কেবল সরল ও স্বচ্ছ নয়—গরীয়সী। তাঁহার ভাষায় নিরর্থক বাক্‌চাতুরী নাই, ভাবানুযায়ী শব্দ-চয়নের নৈপুণ্য ও সাবধানতা

আছে; উচ্ছ্বাস বা গীতিমাধুরীর উন্মাদনা নাই, কিন্তু ইহা সংযম ও শক্তি-স্বাতন্ত্র্যে যেন জমাট বাঁধিয়াছে। এই ভাষায় শিল্পকলার চটুল চাকচিক্য নাই; কিন্তু স্বচ্ছন্দ গতি, অনায়াস-সৌন্দর্য্য, ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও শব্দ-গৌরবের সার্থকতায় ইহা সংহত ও শক্তিশালী। অক্ষয়কুমারের প্রকাশ-প্রাচুর্য্য ছিল না, কিন্তু যেটুকু তিনি লিখিয়াছেন সেইটুকু নিখুঁত করিয়া লিখিবার জন্য যথেষ্ট সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার কবি-কল্পনায় উৎসর্পিণী বিশালতা নাই; কিন্তু আন্তরিকতা আছে, একটি স্বতন্ত্র জীবন-শক্তির পরিচয় আছে। তাঁহার ভাব ও ভাষা প্রাণের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল বলিয়াই আমাদের প্রাণস্পর্শ করিতে পারে। তাই তাঁহার কবিতা যেন তাঁহার উর্জ্জস্বল কবিচিত্তের প্রতিবিম্ব। তিনি জীবনের স্পন্দন সত্যভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ভাষা জীবন্ত ও প্রাণময়, তাঁহার ভঙ্গীও পুরুষোচিত প্রতিভার পরিচায়ক। সেই জন্য, শব্দকুহেলিকা বা কষ্টকল্পনার আবর্জ্জনায় তাঁহার অধ্যাত্মগভীর, অথচ স্নিগ্ধ-সরল, ভাবগুলি ঢাকা পড়ে নাই। তাঁহার কবিতায় অনন্ত গীতিমাধুর্য্য নাই, কিন্তু ইহাতে যে একটি করুণ ও কোমল, অথচ গম্ভীর ও উদাত্ত সুর আছে, তাহা তাঁহার নিজস্ব।

অক্ষয়কুমার শব্দমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই শব্দের অসদ্ব্যবহার তাঁহার অপরিচিত। সকল শ্রেষ্ঠ কবির মত, শব্দ-নির্ব্বাচনে তিনি প্রকৃত কবি-শিল্পীর পরিচয় দিয়াছেন। সরু কাজ, নক্সা-কাটা বা কৃত্রিম শিল্পের পরাকাষ্ঠায় কবিতা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হইতে পারে বটে, কিন্তু যে পরিমাণে রচনার সূক্ষ্মতা, সেই পরিমাণে ইহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিরও অপচয় হয়। সূক্ষ্ম শিল্পের সৌন্দর্য্য অক্ষয়কুমারের অবিদিত ছিল না; কিন্তু তাঁহার জাগ্রত ও বলিষ্ঠ প্রতিভা ইহাকে কখনও বরণ করিতে পারে নাই। অক্ষয়-কুমারের কবিচিত্ত অনিয়ম অপেক্ষা নিয়মের, উচ্ছ্বাসের অবাধ প্রাচুর্য্য অপেক্ষা সংযমের স্বল্পভাষী কঠিনতার পক্ষপাতী ছিল। এই হিসাবে তাঁহার কবিতাগুলিকে বাঙ্গালা সাহিত্যে classic artএর উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যাইতে পারে। শুধু ভাষার সংযম নয়, ভাবের সংযমও তাঁহার অসাধারণ; তাই ইহার মধ্যে কোথাও ornateness বা finical nicetyর দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। আত্মপরিমার্জ্জনা বা আত্মসংহতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সংযমের ফল। 'কনকাঞ্জলি'র দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা ভাষার এই তপস্যাকাল, সুতরাং সংহতি ও সাধনাই শ্রেয় পথ"। এই

সংহতি ও সাধনার গুণে তাঁহার কবিতায় শিথিলতা বা বাহুল্য-দোষ বিরল। গাঢ়তায় ও গৌরবে ইহা শাণোল্লিখিত হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বল ও কঠিন। প্রাণবস্তু খাঁটি romantic হইলেও, ইহার গঠন ও প্রকাশের সৌন্দর্য্য classical। কারণ অক্ষয়কুমারের কাব্যের বিশেষত্ব—অসংযত উচ্ছ্বাস নয়, ভাবুকতা; বাস্তবদায়িত্বহীন প্রগল্‌ভতা নয়, আন্তরিকতা। Lyric আবেগ যথেষ্ট থাকিলেও, যে deep sincerity বা আন্তরিকতা গীতি-কবিতার প্রাণ, তাহাই অক্ষয়কুমারের কবিতাকে প্রাণময় করিয়াছে। তিনি বেশী লিখেন নাই, কিন্তু যেটুকু লিখিয়াছেন, তাহা এই হিসাবে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আজকালকার সাহিত্যে যেরূপ pseudo-romantic উচ্ছৃঙ্খলতা ও শৈথিল্যের অবাধ প্রবাহ চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে অক্ষয়কুমারের সংযত-নিবিড় ভাব ও শিল্পের আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

[অক্ষয়কুমারের কাব্য-জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির তারিখ আমরা এইখানে লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া, অক্ষয়কুমার 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় কতকগুলি গাথা-ধরণের কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। 'এষা' ভিন্ন, অক্ষয়কুমারের অন্য কাব্যগুলি পুনর্মুদ্রণের অভাবে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, সেইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃতাংশের বাহুল্য দৃষ্ট হইবে।

১২৬৭ (১৮৬০)—জন্ম, কলিকাতা (আদি নিবাস—চন্দননগর)
১২৮৯ (১৮৮২)—'রজনীর মৃত্যু' (বঙ্গদর্শন, পুরাতন পর্য্যায়)
১২৯০ (১৮৮৪)—'প্রদীপ'
১২৯২ (১৮৮৫)—'কনকাঞ্জলি'
১২৯৪ (১৮৮৭)—'ভুল'
১৩০০ (১৮৯৩)—'প্রদীপে'র দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩০১ (১৮৯৪)—বিহারীলালের মৃত্যু
১৩০৪ (১৮৯৭)—'কনকাঞ্জলি'র দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩১১ (১৯০৪)—'পান্থ' প্রথম পর্য্যায় (সাহিত্য)
১৩১৩ (১৯০৬)—স্ত্রী-বিয়োগ
১৩১৭ (১৯১০)—'শঙ্খ'
১৩১৮ (১৯১১)—'মানব-বন্দনা' (সাহিত্য)
—'পান্থ' দ্বিতীয় পর্য্যায় (সাহিত্য)

১৩১৯ (১৯১২)—'এষা'

—'প্রদীপে'র তৃতীয় সংস্করণ

১৩২০ (১৯১৩)—'শঙ্খ' ও 'এষা'র দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩২১ (১৯১৪)—'পান্থ' তৃতীয় পর্য্যায় (সাহিত্য)

১৩২৪ (১৯১৭)—'কনকাঞ্জলি'র তৃতীয় সংস্করণ

১৩২৬ ৪ঠা আষাঢ় (১৯১৯, ১৯ই জুন)—মৃত্যু]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে (২২এ অগ্রহায়ণ ১২৬০ সনে) নৈহাটীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে হরপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা প্রায় একশত বৎসর যাবৎ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ছিলেন। আদি বাসস্থান যশোহর হইতে তাঁহার প্রপিতামহ মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নৈহাটীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। হরপ্রসাদের পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন ও পিতামহ শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার নব্যন্যায়ে পারদর্শী ছিলেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে হরপ্রসাদ স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে শাস্ত্রচর্চ্চা ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই ছিল এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের উচ্চ আদর্শ।

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত বালক হরপ্রসাদ যখন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী হন, তখন তাঁহার নাম ছিল শরৎনাথ। হরের প্রসাদে কোনও সঙ্কটাপন্ন রোগ হইতে মুক্তিলাভের পর তাঁহার নামের পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আর্য্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রকৃত বিবাহ ও প্রণয়' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার শ্রীশরৎ নামই স্বাক্ষরিত দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বি এ ও পর বৎসর এম এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, শাস্ত্রী এই উপাধি-ভূষিত হইয়া, তিনি ১৮৭৮ সালে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে কিছুদিন হেডপণ্ডিতী করেন। সেই বৎসর সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইহার পর, ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরের মধ্যে কলিকাতা নগরে তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রকৃত সূত্রপাত হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল এই কর্ম্মজীবনের ইতিহাস সমগ্রভাবে জ্ঞানচর্চ্চা ও সাহিত্যসেবায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং ১৮৮৬ সালে বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত) নিযুক্ত হন। এই দুই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনার যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন কোন বিশিষ্ট পুস্তকে না থাকিলেও তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধে ও পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই সময় সায়ণের ভাষ্য অবলম্বনে রমেশচন্দ্র দত্ত সমগ্র ঋগ্‌বেদের বাংলা অনুবাদ সম্পাদন করিতেছিলেন। এই দুরূহ কার্য্যে তরুণবয়স্ক হরপ্রসাদ যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৮৫ সালে মুদ্রিত উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন:

"এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য। তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রী উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।"

রমেশচন্দ্র দত্তের এই স্বীকারোক্তি উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহাতে যে কেবল হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের নির্দ্দেশ আছে তাহা নয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তাঁহার সাহচর্য্যের কথাও রহিয়াছে,—যে সুপ্রসিদ্ধ মনীষীর প্রভাব প্রায় কলেজ-ত্যাগের পর হইতেই হরপ্রসাদের বিদ্বজ্জীবনে বিশেষভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। নেপালী বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল যে পুস্তক লিখিতেছিলেন, ১৮৭৮ সালে অসুস্থতার জন্য তাহা সম্পূর্ণ করিতে না পারিয়া তিনি হরপ্রসাদের সাহায্য অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন,—উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় (১৮৮২) তাহার উল্লেখ আছে। প্রবীণ পারদর্শীর সহিত নবীন উৎসাহীর এই প্রথম সংযোগ কিরূপ ফলবান্ হইয়াছিল, তাহা হরপ্রসাদের পুরাতত্ত্ব-চর্চ্চায় উৎসর্গীকৃত পরবর্ত্তী জীবনের গতি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়।

রাজেন্দ্রলালের আনুকূল্যে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও ভাষাতত্ত্ব-সমিতির সম্পাদক মনোনীত হইয়া হরপ্রসাদের কর্ম্মজীবনের আর একটি প্রশস্ততর দিক উন্মুক্ত হইয়াছিল। উক্ত সোসাইটির Bibliotheca Indica শীর্ষক গ্রন্থমালা প্রকাশের ভার ও পরে ১৮৯১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইলে সংস্কৃত পুঁথি-সংগ্রহ ও পুঁথি-বিবরণী প্রস্তুত কার্য্যের সমগ্র পরিচালনার দায়িত্ব, তিনি প্রায় আজীবন গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিরলস ও বহুদর্শী পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে শুধু বাংলা দেশ নয়, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থান ও বিদ্যাকেন্দ্র

পরিভ্রমণ এবং একাধিকবার নেপালের মত দুর্গম প্রদেশেও গমন করিয়াছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থবার নেপাল-যাত্রার সময় এই সংযমী, কৃশকায় অক্লান্তকর্ম্মী পণ্ডিতের বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য, সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু প্রাচীন ও অজ্ঞাত পুঁথি হরপ্রসাদ নেপাল-রাজদরবারের সহায়তায় প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহার মূল্য এখন সমস্ত পণ্ডিত-সমাজ স্বীকার করিয়াছেন।

এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইবে, তাঁহার ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমবেত চেষ্টায় সোসাইটির গ্রন্থাগারে এখন ১৪,৬৮৬ সংখ্যক পুঁথি রক্ষিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে মাত্র ৩১৫৬টি পুঁথি তাঁহার পূর্ব্বগামী রাজেন্দ্রলালের সংগৃহীত। কিন্তু কেবল সংগ্রহ করিয়া হরপ্রসাদ ক্ষান্ত ছিলেন না; এই বিপুল সংগ্রহের তালিকা ও প্রত্যেক পুঁথির বিবরণী তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়া সোসাইটি কর্ত্তৃক ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। শুধু সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিলী, রাজস্থানী, নেওয়ারী ও বাংলা পুঁথিও এই সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যাহা দেবনাগরী, নেওয়ারী, বাংলা, ওড়িয়া, কাশ্মীরী প্রভৃতি লিপিতে খ্রীষ্টীয় নবম শতক হইতে বিভিন্ন শতকে অনুলিখিত। হরপ্রসাদের বিরাট বিবরণীর বিভিন্ন খণ্ডের বিষয়-নির্দ্দেশ হইতে বোঝা যাইবে যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া, প্রাচীন কালের বৈদিক, সংস্কৃত, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগ এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে বিবরণীর ১ম খণ্ড—বৌদ্ধ সাহিত্য; ২য়—বৈদিক; ৩য়—স্মৃতি; ৪র্থ—ইতিবৃত্ত ও ভূগোল; ৫ম—পুরাণ ও ইতিহাস, ৬ষ্ঠ—ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দ; ৭ম—কাব্য; ৮ম—দর্শন; ৯ম—তন্ত্র; ১০ম—জ্যোতিষ; ১২শ—দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য; বাকি অপ্রকাশিত রহিয়াছে: ১১শ—জৈন সাহিত্য; ১৩শ—বৈষ্ণব; ১৪শ-১৫শ—বিবিধ বিষয়। কেবল সংখ্যায় ও বিষয়-বৈচিত্র্যে নয়, বহু অজ্ঞাত ও দুর্লভ পুস্তকের আবিষ্কারেও হরপ্রসাদের এই সংগ্রহ আজ পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ সংগ্রহের সমকক্ষ; এবং ইহাই হরপ্রসাদের পণ্ডিতোচিত জীবনের একটি বিরাট ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি।*

* হরপ্রসাদ পূর্ব্ববঙ্গের দিকে বেশি মনোযোগ দেন নাই। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে ও স্বর্গত বন্ধু নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সহযোগিতায়,

একটি জীবনের পক্ষে এই বৃহৎ প্রচেষ্টাই পর্য্যাপ্ত; কিন্তু হরপ্রসাদ ইহা যথেষ্ট মনে করেন নাই। তিনি কেবল প্রাচ্যবিদ্যার সংগ্রাহক বা ভাণ্ডারী ছিলেন না, এই বিদ্যার আহরণে ও সদ্‌ব্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন। এই পুঁথিগুলি অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকগুলি নূতন গ্রন্থ সম্পাদন এবং বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রয়োদশ; প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় তিনশত। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কোন দিকই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল-ব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহুদর্শনের পরিণত ফল এই পুস্তক ও প্রবন্ধ-গুলির বহু সহস্র পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান আসক্তি ছিল দুইটি বিষয়ে—মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনা এবং নানাদিক দিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলীর গুণগ্রাহিতা। ইংরেজী ও বাংলায় কালিদাস সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন সময়ে পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাহার মধ্যে পুরাতন পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে তিনটি ও চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত নারায়ণে চব্বিশটি বাহির হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সুপরিচিত পুস্তক ও প্রবন্ধসমূহের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। প্রাচীন লিপি ও শিলালেখ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় Epigraphia Indica প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ পত্রিকায় পাওয়া যাইবে।

কিন্তু হরপ্রসাদের বিক্ষিপ্ত রচনাবলি তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় দেয় না। লেখক ছাত্রহিসাবে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিবার সুযোগ পায় নাই, কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিষ্য হিসাবে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি উপলক্ষ্যে তিনি ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন লেখকের পরীক্ষক ও পর্য্যবেক্ষক। এইরূপ যাঁহারা হরপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহার সহজ পাণ্ডিত্যের পরিধি কত বিস্তৃত ছিল, এবং সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের যে কোন প্রসঙ্গে তাঁহার বাক্যালাপে কত নূতন তথ্য বা নূতন করিয়া ভাবিবার জিনিস পাওয়া যাইত। আমাদের দেশে প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত তিনি একাই ছিলেন সব্যসাচী। বাহিরে স্বল্পবাক্ ও মৃদুভাষী হইলেও

প্রধানতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রায় বাইশ হাজার পুঁথি উক্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান পাকিস্থানী আবহাওয়ায় এই প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির সংগ্রহের শেষ পর্য্যন্ত কি দশা হইবে, কে জানে।

অন্তরঙ্গদের নিকট তিনি রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা বলিতেন না। তাঁহার কর্ম্মশক্তি ও মনস্বিতা যেরূপ অসাধারণ ছিল, সেকালের রসিকতায়, ব্যঙ্গবিদ্রূপে, সদালাপেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার তাঁহার ছিল; কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত পরিবারের নিয়মনিষ্ঠ সন্তান হইলেও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। চিরাগত শিক্ষা ও পরিবেষ্টনীর মধ্যেও এই স্বতন্ত্র ও সচেতন উদারতা তিনি কোথা হইতে পাইলেন? এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদের বহুদর্শী মননশীলতার তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সহিত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য:

"আমার মনে এই দুইজনের চরিত্রচিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষলাভ করেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেননি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচার-বুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিলেন। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না।"

একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চ্চায় রাজেন্দ্রলালের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা ছিল, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যানুরাগে গতযুগের আর একটি শ্রেষ্ঠ মনীষী হরপ্রসাদের মনের উপর তরুণ বয়স হইতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি সেই যুগের সাহিত্যধুরন্ধর বঙ্কিমচন্দ্র। কলেজে পঠদ্দশায় হরপ্রসাদ ভারত-মহিলা শীর্ষক একটি বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়া হোলকার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রবন্ধটি তিনি প্রথমে আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু না পারিয়া রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় উহা বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের জন্য গৃহীত ও প্রকাশিত (সন ১২৮২—খ্রীঃ ১৮৭৬)

করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের নিকটেই কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন; এই ঘটনা হইতেই জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তরুণ সাহিত্যযশঃপ্রার্থী হরপ্রসাদের পরিচয়ের সূত্রপাত; এবং নিত্য যাতায়াত ও আলাপ-আলোচনায় উভয়ের সম্পর্ক ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। ১২৮২ (=খ্রীঃ ১৮৭৬) হইতে ১২৯০ (=খ্রীঃ ১৮৮৩) সাল পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর হরপ্রসাদ বঙ্গদর্শনের স্বল্পসংখ্যক বিশিষ্ট লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য দুইটি সাহিত্যিক প্রচেষ্টা 'বাল্মীকির জয়' (১২৮৭; পুস্তকাকারে ১২৮৮) ও 'কাঞ্চনমালা' (১২৮৯; পুস্তকাকারে ১৯১৬ খ্রীঃ) বঙ্গদর্শনেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া মেঘদূতের ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন বিষয়ে যে পঁচিশটি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে 'বর্ত্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' (১২৮৭) ও 'বাংলা ভাষা' (১২৮৮) শীর্ষক দুইটি রচনার এখনও যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে নারায়ণ পত্রিকায় (১৩২২, ১৩২৫) বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে হরপ্রসাদ যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন এবং ১৩২৯ (=খ্রীঃ ১৯২২) সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি উন্মোচন-সময়ে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন (মাসিক বসুমতী ১৩২৯), তাহাতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট শিষ্য হিসাবে তাঁহার ঋণ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন।

বাস্তবিক, হরপ্রসাদের প্রথম রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও রচনাভঙ্গির প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে বেশি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার স্থান নাই, কিন্তু তাঁহার অধুনা-উপেক্ষিত 'বাল্মীকির জয়' ও 'কাঞ্চনমালা' হইতে বোঝা যাইবে যে, তিনি তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই:

"গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায়, তখন কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া গিয়া গান বাহির হয়, তখন আরও মধুর হয়, যে গীত বুঝে সে আরও মুগ্ধ, যে গীতের ভাব বুঝে, সে আরও মুগ্ধ হয়। গীতে যদি শুধু কান না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে, তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋভুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাইতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন,

বুঝিতেছেন, ভাব গ্রহণ করিতেছেন। কাণ, মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। বাহির ইন্দ্রিয় কাণে প্রবেশ করিয়াছে। মন ও প্রাণ কাণে উঠিয়াছে। জ্ঞান চৈতন্য হত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে মুগ্ধ, সুরে মুগ্ধ, আর সুরের ভাবে আরও মুগ্ধ।" (বাল্মীকির জয়)

"দুইটি ফুল সমান ফুটিয়াছে, সমান হাসিতেছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। পাশাপাশি ফুটিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া গন্ধ ছড়াইতেছে, আর হাসিভরে একবার এ ওর গায়ে পড়িতেছে, একবার ও এর গায়ে পড়িতেছে। একবার এ উহাকে পাপড়ী দিয়া মারিতেছে, ও আবার তাহার শোধ দিতেছে। বাতাস ইহাকে উহার গায়ে ফেলিয়া দিতেছে। বাতাস থামিলে ও আবার ইহার গায়ে পড়িয়া সরিয়া যাইতেছে। কেমন সুন্দর! এরূপ সমবিকসিত, সমপ্রস্ফুটিত, সমগন্ধামোদিত সমান কুসুমদ্বয়ের মিলন কেমন সুন্দর।"

(কাঞ্চনমালা)

যদিও এই রচনা অপরিপক্ব নয়, তবুও মনে হয় নবীন লেখক তখনও সাহিত্যশিল্পাগারে শিক্ষার্থী, নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গি তখনও হয়ত খুঁজিয়া পান নাই। তথাপি প্রথম হইতেই এই ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রসাদগুণ, যাহা লক্ষ্য করিয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাধারণীতে (১৮৮১) লিখিয়াছিলেন:

"ইহার লেখা এরূপ পরিষ্কার—পরিষ্কার কেন স্বচ্ছ—যে ভাষার আবরণ আছে বলিয়াই বোধ হয় না। আর, একটি কথা সাধু বা সংস্কৃত অন্যটি অসাধু বা প্রাকৃত—অতএব এ দুইটির একত্র সংস্থান করা অকর্ত্তব্য, এরূপ কল্পারের জাতিভেদ হরপ্রসাদে নাই। যে যেমন কাজ করিতে পারে, শাস্ত্রী তাহার বর্ণবিভেদ না করিয়া তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন।"

ইহাই যে তাঁহার ভাষার পদ্ধতি ছিল, তাহা হরপ্রসাদ স্বয়ং বঙ্গদর্শনে 'বাঙ্গলা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। বহুবর্ষ পরে নারায়ণে প্রকাশিত (১৩২৫-২৬—খ্রীঃ ১৮১৮-১৯) 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে হরপ্রসাদ যে ঝরঝরে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কোনো ব্রাহ্মণপণ্ডিত কেন যে কোনো সাহিত্যিকের আদর্শ স্থানীয়। একটি স্বল্প উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে:

"ভোর না হইতে হইতেই তারাপুকুরের মাছ ধরার সরঞ্জাম সব প্রস্তুত। পুকুরটি যতখানি চওড়া, ততখানি লম্বা। একখানি জাল, জালের সূতাগুলি বহুকাল ধরিয়া গাবানতে এমন শক্ত হইয়াছে যে, মাছের সাধ্য কি উহা

ছিঁড়িয়া পালায়। জালের তলার দিকে ইট ও পাথর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরে গোছা গোছা শোলার ফাত্না ভাসিতেছে। দুই পাড়ের ধারে দুই নৌকায় জেলেরা দড়ি ধরিয়া বসিয়াছে।······নৌকা চলিল, শোলার ফাত্না চলিল, জালের দড়ি চলিল, পাড়ের উপর অগণ্য মানুষ চলিতে লাগিল। ······ক্রমে জাল তারাপুকুরের মাঝামাঝি পৌছিল। তখন সূর্য্যদেবের রাঙ্গা কিরণ আসিয়া তারাপুকুরের জল সোনার রঙ করিয়া দিল। কিন্তু এ কি? জাল যে আর টানা যায় না। জালের তলায় এত মাছ পড়িয়াছে যে দুই নৌকায় জেলেরাই জাল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া লাফাইয়া জালের পিছনে গিয়া পড়িল। তাহারা যখন লাফায়, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন রূপার মাছ-বৃষ্টি হইতেছে। মাছগুলো রূপার মত সাদা, মাজা রূপার মত চক্‌চকে, একটার পর আর একটা পড়িতেছে। চক্‌চকে রূপার রঙের উপর সূর্য্যের সোনালি রঙ পড়িয়া গিয়াছে। সে রঙের মেশামেশিতে এক অপূর্ব্ব শোভা।"

এই ভাষা ও ভঙ্গি ছিল হরপ্রসাদের নিজস্ব, এবং ইহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না।'

পণ্ডিতী ভাষা ছাড়িয়া সহজ ভাষায় বিদ্যাসাগরও লিখিয়াছিলেন; এ আদর্শ হরপ্রসাদের সম্মুখে ছিল। তবুও বিদ্যাসাগরের ভাষা অনেক পরিমাণে সংস্কৃতঘেঁষা ছিল,—হরপ্রসাদের ভাষা তাহার চেয়েও লঘু, স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর। ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল, কারণ পণ্ডিতী আবহাওয়ার মধ্যেও সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস ছিলেন হরপ্রসাদের প্রিয় কবি এবং বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁহার কাম্য আদর্শ। তাই শাস্ত্র-জিজ্ঞাসা কোনো দিন তাঁহার রস-পিপাসাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল অসাধারণ; এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সহজ ভাষা বোধ হয় অজ্ঞাতে তাঁহার সাহিত্যিক মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

তরুণ বয়স হইতেই শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নয়, গবেষক হিসাবেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি হরপ্রসাদের ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। ১৮৮৬ সালে যখন তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, তখন হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক বহু মুদ্রিত বাংলা পুস্তক পরীক্ষা করিবার

সুযোগ পান। ইহার ফলে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে—তখনও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয় নাই—কম্বুলেটোলা রিডিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে তিনি একটি ইংরেজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে (Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education) ১১৪ জন বৈষ্ণবকবির প্রথম সন্ধান শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের গোচরে আনিয়াছিলেন। তখনকার দিনে রামগতি ন্যায়রত্নের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' অথবা ওই জাতীয় দু'একখানি বাংলা সাহিত্যের অসম্পূর্ণ বিবরণ হইতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন কবির কথা জানা ছিল, প্রাচীন সাহিত্যের আর কিছু বিশেষ জানা ছিল না; এবং মনোভাব এরূপ ছিল যেন প্রাচীন সাহিত্যে জানিবার বিশেষ কিছু নাই। হরপ্রসাদের বক্তৃতা একটি নূতন জগতের সন্ধান দিল। এই মনোভাবের বিবরণ দিয়া বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া হরপ্রসাদ স্বয়ং লিখিয়াছেন :

"১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া আমি অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। সেকালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে, শুধু গানের বহি আর সংকীর্ত্তনের বহি নয়, অনেক জীবনচরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাংলা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরীর বাৎসরিক উৎসবে একটি প্রবন্ধ পড়ি। এই প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাঁহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ। বাঙ্গালায় এত বহি আছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাপা বহি, কলিকাতাতেই কিনিতে পাওয়া যাইত।"

যখন ছাপার বই হইতে এত খবর পাওয়া গেল, তখন আসিল হাতের লেখা পুঁথি খোঁজার পালা। এই সময় এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি-খোঁজার ভার হরপ্রসাদের উপর পড়িল; শুধু সংস্কৃত পুঁথি নয় বাংলা পুঁথিরও অনুসন্ধান চলিল। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি বহু প্রাচীন বাংলা পুঁথি হরপ্রসাদের চেষ্টায় সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইল। এইরূপে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপিত হইল। দীনেশচন্দ্রও তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, পুঁথিসংগ্রহে ও গ্রন্থরচনায় হরপ্রসাদের সাহায্য ও ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের যুগান্তকারী আবিষ্কার হইল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদিগের সাতচল্লিশটি চর্য্যাপদ (ব সা প, সন ১৩২৩—খ্রীঃ ১৯১৬), যাহা শুধু বাংলা ভাষার নয়, আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। অপভ্রংশের কিছু ছাপ ও ছাঁদ থাকাতে কেহ কেহ ইহার ভাষাকে বাংলা বলিয়া স্বীকার করেন নাই, অথবা বাংলা ভিন্ন অন্য কোন আধুনিক আর্য্যভাষা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এখন প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রধানতঃ ও মূলতঃ বাংলা ভাষার আদিম রূপ।

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে হরপ্রসাদের আর একটি উদ্যমের কথা এখানে বলা প্রয়োজন। ১৮৮০ সাল হইতে বঙ্গদর্শনে ('কালেজী শিক্ষা', ভাদ্র ১২৮৭) হরপ্রসাদ বাংলা ভাষাকে আমাদের শিক্ষার বাহন করিবার জন্য আন্দোলন শুরু করেন; কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। ১৮৯১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বাংলা ভাষা প্রচলন করিবার প্রথম উদ্যোগ করেন বঙ্কিমচন্দ্র; হরপ্রসাদ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে সমর্থন করেন। আশুতোষের প্রস্তাব সিনেটে গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত তদনুযায়ী কিছুই করা হয় নাই। তথাপি ইহা স্মরণযোগ্য, আশুতোষের বহু পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদ এ বিষয়ে তাঁহার অগ্রণী মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ভাষাবিদ্, বহুশাস্ত্রদর্শী ও পুরাতত্ত্বজ্ঞ হিসাবে হরপ্রসাদের খ্যাতি বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়িল; রাজসরকার এবং স্বদেশের ও বিদেশের নানা গুণগ্রাহী বিদ্বৎ-সভা তাঁহাকে সম্মানিত করিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৮ হইতে আজীবন এই পদ অধিকার); Buddhist Text and Research Society-র সম্পাদক (১৮৯৫); প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের প্রধান

অধ্যাপক (১৮৯৫); সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৯০০; অবসরগ্রহণ ১৯০৮); রাজকীয় মহামহোপাধ্যায় (১৮৯৮) ও C. I. E. (১৯১১) উপাধি; বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি (১৯০৬) ও পরে অস্থায়ী সভাপতি (১৯১৯-২১); বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য (১৯০৯) ও সভাপতি (১৯১৩ হইতে বার বৎসর); বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের মূল সভাপতি (১৯১৪); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ (১৯২১-২৪) এবং সম্মানসূচক ডি লিট্ উপাধি (১৯২৭); বিলাতের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য (১৯২১); সংস্কৃত কলেজে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা (১৯২৪); লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের প্রধান সভাপতি (১৯২৮); বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কর্ত্তৃক বর্দ্ধাপন (১৯২২) ও পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষ উপলক্ষ্যে বহুবিদ্বজ্জনলিখিত সংবর্দ্ধন-লেখা-মালা উপহার (১৯৩১); প্রভৃতি বহু অযাচিত পদ ও সম্মান তিনি তাঁহার প্রতিভার যোগ্যতাবলে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর (১৩৩৮, ১লা অগ্রহায়ণ) তিনি পরলোকগমন করেন।

জীবনে সার্থকতা ও যশ অর্জ্জন করিলেও, জীবনত্যাগের পর এই অসামান্য মনস্বী পুরুষ দেশের লোকের নিকট সমুচিত সম্মান লাভ করেন নাই। সংস্কৃত কলেজে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার একটি কারণ ইহা হইতে পারে, তাঁহার অধিকাংশ স্থায়ী রচনা বিদ্বৎ-সমাজের জন্য লিখিত ও জনসাধারণের অজ্ঞাত। এগুলি আবার পুস্তিকার আয়তনে প্রকাশিত, যাহা এখন দুষ্প্রাপ্য, অথবা প্রবন্ধের আকারে বহু সাময়িকপত্রের সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় ছড়াইয়া রহিয়াছে, পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই। কয়েকটি সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ সম্পাদন ও দুচারিটি বাংলা সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ভিন্ন, হরপ্রসাদ কোনো বিস্তৃত বা বিশিষ্ট পুস্তক রাখিয়া যান নাই, যাহার মধ্যে তাঁহার জ্ঞান, কল্পনা বা রসজ্ঞতার সমগ্র পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে; প্রবন্ধাবলীর স্বল্প পাত্রেই তাঁহার শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে। হয়ত তাঁহার প্রতিভার এরূপ বিস্তৃত সৃজনী শক্তি ছিল না, অথবা এরূপ গ্রন্থ লিখিবার সুযোগ বা প্রেরণা হয়ত তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে আসে নাই। অধ্যাপকের কাজও

তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে বা একাগ্রচিত্তে করিবার অবসর পান নাই। সেইজন্ত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত তিনি অনুপ্রেরিত শিষ্যগোষ্ঠী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

কিন্তু বিদ্বৎসমাজের জন্য লিখিত হইলেও তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধ দুরূহ বা জটিল নয়, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় প্রাঞ্জল, সুপাঠ্য ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য; কারণ তিনি যাহা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়াছেন তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। ইহার অধিকাংশ এখনও পুনর্মুদ্রণের অপেক্ষা রাখে; এবং এগুলি একত্র পুনর্মুদ্রিত করিলে তাঁহার স্মৃতির যথার্থ সম্মান রক্ষা করা হইবে।* আজকাল অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক রচনাগুলিকে তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। তাঁহাদের মতে, হরপ্রসাদের লেখার স্থায়ী মূল্য বেশি নয়; রাজেন্দ্রলালের রচনার দোষগুণ উভয়ই নাকি তাঁহার মন্ত্র-শিষ্যের লেখায় বর্ত্তাইয়াছিল। জ্ঞানের অনুশীলনে অপরীক্ষ্যকারিতা পরিণামে ফলপ্রদ হয় না। অধিকতর সন্ধানের ধৈর্য্য না রাখিয়া কেবল দুএকটি চমকপ্রদ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক সৌধ নির্ম্মাণ করিলে কালের পরীক্ষায় তাহার ভিত্তি আর দৃঢ়মূল থাকে না। হরপ্রসাদ ইতিহাসকে গল্পের মত চিত্তাকর্ষক করিতে পারিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কল্পনা অনেক সময় গল্পকেও ইতিহাসে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এ অভিযোগ সত্য হউক বা না হউক, ক্রমবর্দ্ধনশীল অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার অনেক রচনার মূল্য হয়ত কালক্রমে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নিরবধি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী গবেষকের ইহাই নিয়তি। কিন্তু এই অনিশ্চয়ের মাপকাঠিতে তাঁহার সমগ্র চেষ্টার গুণাপকর্ষণ করা উচিত হইবে না। পথিকৃৎ হিসাবে এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত পণ্ডিতসমাজে এই জ্ঞান-তপস্বীর মর্য্যাদা কোনো কালে ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। তিনি সাধারণ পণ্ডিত বা সাধারণ অধ্যাপক ছিলেন না। পশ্চিম ভারতে যেমন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতে তেমনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচ্যবিদ্যার আধুনিক গবেষণার মূলপত্তন করিয়াছিলেন। এই গবেষণার জন্য তিনি যে বহু সহস্র প্রাচীন

* আর কেহ ইহা না করিলেও, পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া বিরাজ করিবে। পথ-নির্দ্দেশকের ভাগ্যে বিস্মৃতি কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পথ পরবর্ত্তী পথিকের জন্য চিরদিন সুগম্য হইয়া থাকিবে। তাঁহার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলিয়াছিলেন: He, of all people, has been the real father of Oriental Research in North India. —একথা শ্রদ্ধাঞ্জলির নিরর্থক অত্যুক্তিমাত্র নয়। কিন্তু পশ্চিম ভারতে হরপ্রসাদের মত প্রাচ্য গবেষণায় যিনি অগ্রণী ছিলেন, সেই ভাণ্ডারকরের স্মৃতিরক্ষার কল্পে ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা-সংশোধক-মণ্ডলী স্থাপিত হইয়া আজ ত্রিশ বৎসর তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে গবেষণার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে এবং তাঁহার বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছে; বাংলা দেশে হরপ্রসাদের নাম আজ তাঁহার লোকান্তরগমনের বাইশ বৎসর পরে অবজ্ঞাত না হউক বিস্মৃতপ্রায়। তবে বাংলা দেশের কথাই আলাদা!

হরপ্রসাদের প্রতিভার আর একটি দিক ছিল, যাহাও যথোচিত সমাদর লাভ করে নাই। সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক হিসাবে, বিশেষতঃ বাংলা গদ্য-লেখক হিসাবে, স্বল্প হইলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে—একথা আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। হয়ত বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্ত্তির পরিমাণ তেমন অধিক ছিল না, সেইজন্য দেশের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু যাঁহারা সাহিত্যসেবারসজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, আর কোন রচনা না হউক, হরপ্রসাদের 'বাল্মীকির জয়' ও 'বেণের মেয়ে' এককালে যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা নিরর্থক নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাকে তাঁহার জীবদ্দশায় যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বাংলা রচনাবলীর পুনর্ম্মুদ্রণের আজ পর্য্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করে নাই।